তাঁর এই সৃষ্টিকর্মকে উপন্যাস-রূপে আখ্যাত করতে রাজি নন বুদ্ধদেব গুহ। এ-গ্রন্থের স্বল্পায়ত একটি ভূমিকায় লিখেছেন তিনি : "'অবরোহী' উপন্যাস নয়, যদিও 'দেশ'-এ প্রকাশিত হবার সময় বিজ্ঞাপিত হয়েছিল উপন্যাস হিসেবেই। প্রথম দিকে এর রীতি হয়তো উপন্যাসেরই মতো ছিল। কিন্তু কয়েক কিস্তি পরেই সেই রীতিকে বদলে দিই।" জানিয়েছেন, যত-না নন্দিত তার চেয়ে বেশি 'নিন্দিত' এই রচনা শেষাবধি সম্ভবত 'কোলাজধর্মী' এক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

সত্যি কি তাই ?

এ-তর্কের মীমাংসা করুন পাঠক-সমালোচকরা। কিন্তু একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে, প্রচলিত ধারায় এক ব্যতিক্রমী সংযোজন 'অবরোহী'। পাঠকের বহুলালিত সংস্কার ও উপন্যাসের বহুপ্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞার্থকেই চ্যালেঞ্জ করে, এমন এক রচনা। আর সেই কারণেই সম্ভবত এই সৃষ্টিকর্মের আত্মা এমন সাহিত্যাশ্রয়ী।

ঝুমরি-তিলাইয়া স্টেশনে দীর্ঘকাল পরে দেখা হল অর্যমার সঙ্গে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রী যোজনগন্ধার। কম্প্যুটার-বিশারদ, স্বনির্ভর, যোজনগন্ধা এখন থাকে দিল্লিতে। আর প্রখর আত্মমর্যাদাশালী, সূক্ষ্ম রুচিশীল, লেখক অর্যমা রায় প্রবল অভিমানে কলকাতা ছেড়ে দশ বছর যাবৎ হাজারিবাগবাসী। লেখকদের মধ্যে ঈর্ষা-নিন্দা-মাৎসর্য দেখে, দলবদ্ধ চক্রান্তের শিকার হয়ে, বীতশ্রদ্ধ অর্যমা বেছে নিয়েছে অবরোহণের তথা মুক্তির পথ।

যোজনগন্ধার সঙ্গে অর্যমার গড়ে উঠল পত্রবিনিময়ের এক নতুন সম্পর্ক। ঠিক প্রেমপত্র নয়, অন্য স্বাদের সেতুবন্ধন।

একজন সৎ লেখকের সঙ্গে মনস্ক, গভীর, বুদ্ধিমতী এক পাঠিকার এই পত্রাবলির মধ্যে সাহিত্যিকের দায়িত্ব ও সাহিত্যের আদর্শ, আদর্শ পাঠক, সমকাল ও ভাবীকালের সাহিত্যের চেহারা, লেখকের জীবনযাপনের ধরন, ঈশ্বরবোধ—এমন বহু বিষয়ের উষ্ণ ও অন্তরঙ্গ আলোচনা। এই আলোচনার মধ্যে বহু নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকসম্পাত।

সাহিত্যের আগ্রহী পাঠককে পড়তেই হবে এই বই। একবার এবং বারবার।

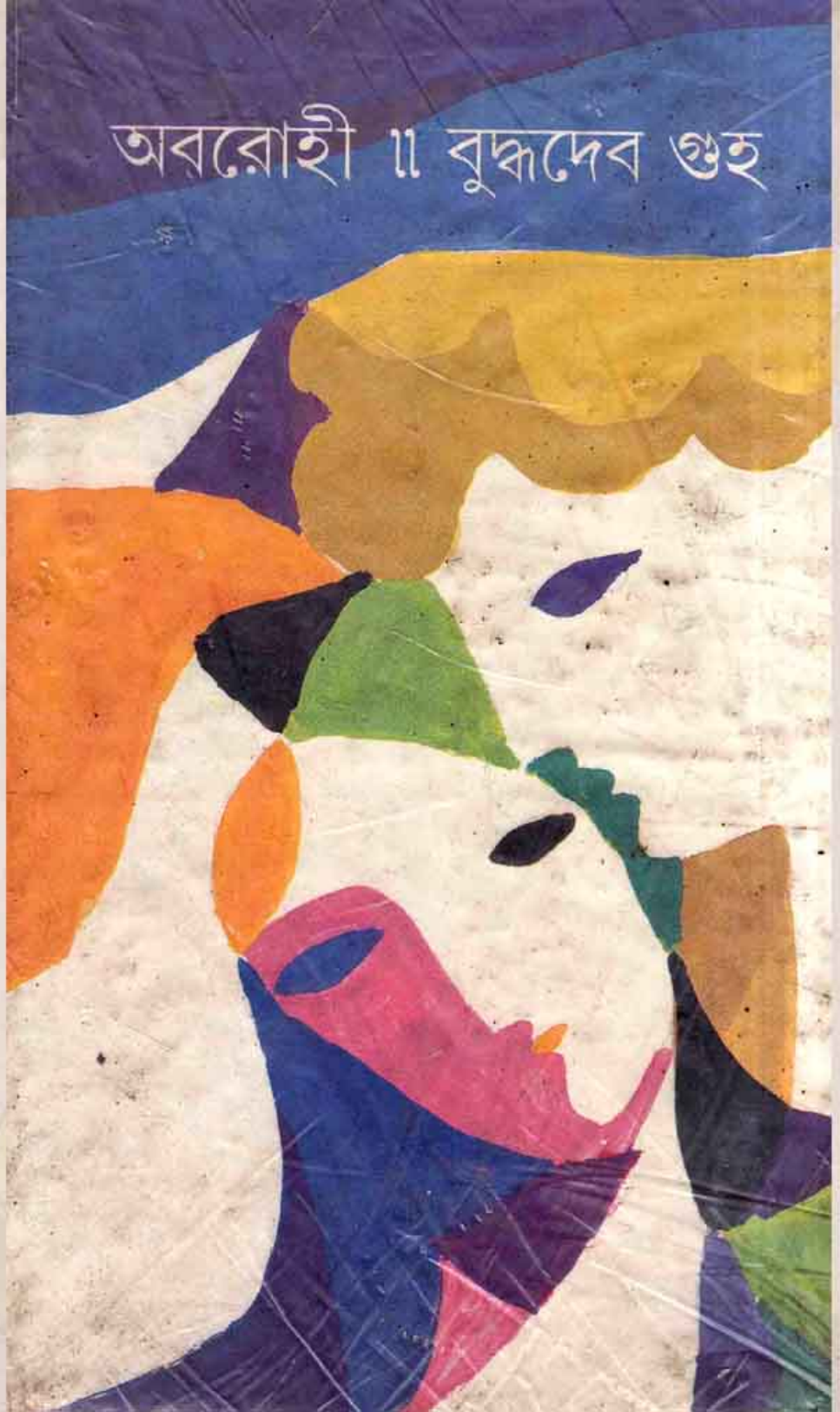

বুদ্ধদেব গুহ পেশাগত দিক থেকে পূর্বভারতের একজন ব্যস্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অথচ একইসঙ্গে এই সময়ের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম। দশ বছর বয়সে শিকার শুরু করেছিলেন। কিন্তু এখন একেবারেই করেন না। এবং শিকারী বলে পরিচিত কখনও হতে চান না। তবে বন-জঙ্গল খুব ভালবাসেন এবং প্রায় বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। কিছুকাল আগেই আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে ঘুরে এসেছেন।

বহু বিচিত্র ও ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতাময় তাঁর জীবন। ইংল্যান্ড, ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশ, কানাডা, ইউ এস এ, হাওয়াই, জাপান ও থাইল্যান্ড এবং পূর্ব আফ্রিকা তাঁর দেখা। পূর্বভারতের বন-জঙ্গল, পশুপাখি ও বনের মানুষদের সঙ্গেও তাঁর সুদীর্ঘকালের নিবিড় ও অন্তরঙ্গ পরিচয়। সাহিত্য-রচনায় মস্তিষ্কের তুলনায় হৃদয়ের ভূমিকা বড়ো—এই মতে বিশ্বাসী তিনি। 'জঙ্গলমহল'—তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। তারপর বহু উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ। অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বিতর্কিত উপন্যাস 'মাধুকরী' দীর্ঘকাল ধরে অন্যতম বেস্ট সেলার। ছোটদের জন্য প্রথম বই—'ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে'। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন, ১৯৭৭ সালে। প্রখ্যাতা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ঋতু গুহ তাঁর স্ত্রী। সুকণ্ঠ বুদ্ধদেব গুহ নিজেও একদা রবীন্দ্রসংগীত শিখতেন। পুরাতনী টপ্পা গানেও তিনি অতি পারঙ্গম। টি-ভি এবং চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে তাঁর একাধিক গল্প-উপন্যাস।

প্রচ্ছদ □ কৃষ্ণেন্দু চাকী

অসমসাহসী,
অগ্নিকন্যা
তসলিমা নাসরিনকে,
রূপ ও গুণমুগ্ধ,
—বুদ্ধদেবদা

boiRboi.net

"অবশেষে একদিন খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্নরৌদ্রে টেনে বের করল। তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠল, আমার কোণের আশ্রয় একেবারেই ভেঙে গেল। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশি আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি। এও আমার খ্যাতি পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। এ কথা বলার সুযোগ পেয়েছি যে, প্রতিকূল পরীক্ষায় ভাগ্য আমাকে লাঞ্ছিত করেছে, কিন্তু পরাভবের অগৌরবে লজ্জিত করেনি।"

—রবীন্দ্রনাথ

boiRboi.net

কোডারমা স্টেশনের চৌহদ্দি ছেড়ে রহিমের পক্ষিরাজ বেরিয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। এখন চলছে ঝুমরী-তিলাইয়ার দিকে।

কোডারমা স্টেশনের রেললাইন পেরিয়ে উলটো দিকে গেলেই ডোমচাঁচ। শিবসাগর মাইল দশেক। ক্রিশ্চিয়ান মাইকা কোম্পানির কারখানা এবং বাংলোগুলো সবই শিবসাগরে। ডোমচাঁচ আর শিবসাগরের মাঝ থেকেই উড়ালপথটি চলে গেছে মেঘাতারি, দেবুর হয়ে রজৌলি ঘাটের ভিতর দিয়ে, গভীর জঙ্গল আর ঘন-ঘন আঁকাবাঁকা পথ-আঁকা ঘাটে। দু'পাশে উঁচু পাহাড় নানা আকৃতির। হরাইজন্টাল, ভার্টিকাল সব রক-ফেস। ব্যাসাল্ট, কোয়ার্টজাইট এবং কোথাও-কোথাও ল্যাটারাইটও জঙ্গলের লাল সবুজ আর পাটকিলের আড়ালে আড়ালে মৌনী ঋষির মতো স্থির নিষ্কম্প হয়ে আছে বিভিন্ন ভঙ্গিমাতে। এই ঘাটেই রয়েছে পৃথিবীর গভীরতম অভ্রখনি, খলকতুম্বি। রজৌলির ঘাট পেরিয়ে আঁকাবাঁকা চমৎকার মসৃণ পথ মাড়িয়ে, বাঁয়ে পড়ে সিঙ্গারের উপত্যকা। মেঘের মতো পাহাড়গুলোর পাদদেশে ঘন, নিশ্ছিদ্র জঙ্গল। তাও পেরিয়ে গিয়ে নওয়াদা। নওয়াদা পেরিয়ে গিরিক হয়ে জৈনদের মন্দির পাওয়াপুরি। জলের মধ্যে মন্দির। আরও একটু এগোলে বিহার শরীফ ; কাছাকাছি, রাজগীর, নালন্দা।

রহিম বলল, চায়ে পিনা হ্যায় ক্যা সাব ? পান ?

সামনের বাঁদিকের সিটে বসে অর্যমা রায় অন্যমনস্কভাবে অস্ফুটে বলল, মাথা নেড়ে ; নাঃ।

শব্দটা গলার মধ্যেই মরে গেল। শুধু চা খাবে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরেই নয়, তবে জীবনের নানা দিক সম্বন্ধেও তার ভেতর থেকে উঠে আসা অনেকগুলি প্রশ্নর উত্তরেই যেন অস্ফুটে আধো-উচ্চারিত হল এই নাঃ।

রহিম আড়চোখে একবার চাইল অর্যমার দিকে।

ওরা সকলেই অর্যমাকে ডাকে অমর্যা বলে। কেউ-কেউ মানে না-বুঝতে পেরে অমর্যাদা বলেও ডাকে। শব্দটার মানে সম্ভবত ওরা কেউই জানে না। কিন্তু সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারেনি কেউ। (শিক্ষিত, দেশি-প্রবাসী মানুষদের অনেকেরই নিরর্থক এবং অশিক্ষার দ্যোতক নাম থাকে)। রহিম ড্রাইভারদের দোষও নেই কোনো।

রহিম বুঝল যে, কোডারমা স্টেশনের অমর্যার বন্ধুকে ট্রেনে তুলতে গিয়েই বোধ হয় কোনও গড়বড়-সড়বর হয়েছে। হয়তো মনোমালিন্যই হয়েছে কোনওরকম। তবে অমর্যাবাবুকে কোনও মানুষের সঙ্গেই ঝগড়া যাকে বলে, তা কখনওই করতে দেখেনি রহিম

গত দশ বছরে।

এত ভাড়া-গাড়ি হাজারীবাগ শহরে থাকতে কেন যে অমর্যা রায় রহিমের এই লজঝড় গাড়িটাই ভাড়া নেয় তা জানে না রহিম। তবে বোঝে, মনে মনে যে, রহিমকে সাহায্য করার জন্যই নেয়। অমর্যা দিলেরি-ইনসান।

আজ একটু অবাকই হল রহিম। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস ওর নেই। এমনিতে মানুষটা মনমৌজী, জিন্দা-দিল্-এর। এরকম তাহ্জিব এবং তমদ্দুনের মানুষ ওর জীবনে কমই দেখেছে রহিম। কিন্তু অমর্যা রায় গম্ভীর হয়ে গেলে তার উপর যেন বেশক্ জিন্ ভর করে। বড়া মসজিদের পাশ থেকে তখন মৈজুদ্দিন হাকিম সাহাবকে ডেকে নিয়ে আসবে কিনা তা ভাবতে হয় রহিমের মতো অনেককেই অমর্যাবাবুর ইলাজ-এর জন্য।

ঝুমরী-তিলাইয়া ছাড়িয়ে একসময়ে বড়্হির মোড়ে এসে পৌঁছল রহিমের পুরোনো ফোর্ড। কোডারমা স্টেশনে কাউকে তুলতে বা আনতে এলেই কখনও কখনও ঝুমরী-তিলাইয়া পেরোবার সময়েই অমর্যাবাবু বলেন, তিলাইয়াতে চলো।

তিলাইয়া হ্রদের উপরে চমৎকার ছোট ছোট বাংলোগুলো। অমর্যাবাবুকে ডি.ভি.সি.-র বাঙালীবাবুরা সকলেই চেনেন। রাইটার আদমী হচ্ছেন। পইসাওয়ালা রহিস আদমীকে চেনে মহল্লার লোকে আর সাচমুচ পড়ে-লিখে ইনসান-এর ইজ্জত সারি-দুনিয়াতে। উনি যদি যান তো ক্যান্টিনে বা ডাইনিং-রুমে না-বসে, বাংলোরই বারান্দায় বসেন অমর্যাবাবু। মানুষটা হল্লাগুল্লা বিশেষ পছন্দ করেন না। প্যায়েরভি, চামচাগিরি যাঁরা করেন তাঁদের তিনি এড়িয়ে চলেন। রহিমরা এ কথা ভাল করেই জানে।

গাড়ির গতি কমিয়ে এনে রহিম জিজ্ঞেস করল বড়্হির মোড়ে পৌঁছে ; আভ্ভি ?

হাজারীবাগ।

সংক্ষিপ্ত এবং সামান্য বিরক্ত গলাতে উত্তর দিল অর্যমা। বিরক্তিটা যে কার উপরে তা বুঝতে পারল না রহিম। সম্ভবত নিজেরই উপরে।

গ্রান্ড-ট্রাঙ্ক রোড পেরিয়ে ঢুকে পড়ল হাজারীবাগের পথে।

মে মাসের প্রথম লাল ধুলো উড়ছে চারদিকে। পলাশ, শিমুল, অশোক আর লাল ফুলদাওয়াই এবং ঝিকে-বেগনি জিরহুল-এর শোভা এখন আর নেই। চারিদিক রুক্ষ, ঊষর, শ্যামলিমাহীন। হাঁ করে বড় বড় নিশ্বাস নেয় পাখিরা এখন। মাটির পাখি ; গাছের পাখি। বাঁ হাতে গামছা ধরে ট্রাকের ড্রাইভার ঘাম মুছতে-মুছতে যায় জাহাজের মতো মার্সিডিস ট্রাকের উঁচু আসনে বসে। কাঁড়া-ভহিষ, গাই-বয়েল সবই রোগা হয়ে গেছে খাদ্য-পানীয়র অভাবে। হা-জল, হা-জল করছে সব মানুষই, যাদের একটু ক্ষেতিজমিন আছে। এখন শুধুই বর্ষার প্রতীক্ষায়। বড় কষ্টে যায় এই মাসটা ; এবং জুনটাও। জুন মাসের শেষেও কষ্ট থাকে। বড় রুখু-সুখু ; সুনসান প্রকৃতি এখন। বাইরে ঘূর্ণি, ভিতরেও ঘূর্ণি। রহিমের হুডখোলা, প্রায় প্রাগৈতিহাসিক গাড়িটা নিয়ে ভাড়া খাটা বছরের সব সময়েই সমান অসুবিধের হলেও কষ্টটা এই গ্রীষ্মতেই সবচেয়ে বেশি।

হাজারীবাগ শহরের এবং জেলারও এইটিই দোষ। এখানে সব কিছুরই বাড়াবাড়ি। শীতে যেমন শীত, গরমেও তেমনি গরম। কিন্তু এই মুহূর্তে গ্রীষ্মের ঊষরতা অথবা রৌদ্র-দগ্ধ হাওয়া, বিকেলের ঝিমিয়ে-আসা "লু" এসব কোনো কিছুই পীড়িত করছিল না অর্যমা রায়কে। কোডারমা স্টেশানে চকিত-দেখা একজনের মুখ এবং তার মুখনিঃসৃত কাঁটাকরো কথার মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো বছর এক ঝলকে ফিরে এসে তার বর্তমানের মেকশিফ্ট্ জগৎকে এই জ্যৈষ্ঠর ঝোড়ো হাওয়া দলনে যেমন হয়, তেমনই লণ্ডভণ্ড করে

দিয়ে গেছে। যা কিছুই ভাববে-ভাববে, করবে-করবে করছিল এত বছর তা বোধ হয় আবার সব নতুন করে ভাবতে-করতে হবে।

এলাহাবাদের বিখ্যাত প্রকাশক বিট্টু গুপ্তাকে নিয়ে ডিলাক্স-এর এয়ারকন্ডিশনড় চেয়ার-কারের দরজা দিয়ে উঠে কামরাতে ঢুকে তাকে বসিয়েই যখন নামতে যাবে, ঠিক তখনই দেখা হয়ে গেল একেবারে আকস্মিকভাবেই তার সঙ্গে। প্রায় কুড়ি বছর পরে। কিংবা তার বেশিও হতে পারে। এই দেখা হওয়ার জন্যে তার মনের গভীরে এক গোপন এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে ছিল সে কথাটা বিদ্যুৎচমকের মতো চকিতে ও বুঝতে পেল তখনই। কখনো কখনো আনন্দও বিধ্বস্ত করে মানুষকে। অর্যমাও বিধ্বস্ত হয়েছিল। কিন্তু ভাবছিল, বড় দেরি হয়ে গেল। এই দিনেরই মতো, তার জীবনের বেলাও পড়ে এসেছে। অর্যমা ঠিকানা চাওয়াতে তাড়াতাড়িতে গুপ্তা সাহেবের কাছ থেকে একটি কার্ড চেয়ে তারই পেছনে ঠিকানাটা লিখে প্রায় ছুঁড়েই দিয়েছিল তার দিকে।

গাড়ি ছেড়ে যাবে, এই ভয়েই নেমে পড়তে হল গুপ্তাকে উঠিয়েই। এখন ভাবছে আর কয়েক মুহূর্ত থেকে তার ঠিকানাটাও নিয়ে নিলে তো এখন এমন মন-উচাটন হত না। কোডারমা স্টেশনে কোনো দ্রুতগামী গাড়িই বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। মাত্র কয়েক মুহূর্তই দাঁড়িয়ে ছিল অর্যমা, সেই রেলযাত্রিণীর জানলার সামনে।

যোজনগন্ধা !

কত্ত বছর পরে মনে-মনে উচ্চারণ করল নামটি।

যে ফ্রক-পরা কিশোরী সুশ্রী ছাত্রীটিকে অর্যমা একদিন পড়াত, কলকাতার ভবানীপুরের এক প্রায়ান্ধকার একতলা ভাড়া বাড়ির বাইরের ঘরে, সে যে আজ এমন একজন তন্বী, সুন্দরী, সুগন্ধী, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্না, নারী হয়ে তাকে দেখা দেবে, বিস্মৃতির তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে এসে ; একথা তো স্বপ্নেও জানা ছিল না !

যে সময়ে যোজনগন্ধা অর্যমার ছাত্রী ছিল, সেই সময়ে ওদের অবস্থা অত্যন্তই সাধারণ ছিল। আর অর্যমার অবস্থা তখন ওদের চেয়েও খারাপ ছিল। এখনও "বড়লোক" বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু নয়।

ডান হাতের আঙুলগুলি নেড়ে-নেড়ে কী যেন বলছিল যোজনগন্ধা, কামরার ভেতর থেকে। অর্যমাও অনেক কিছুই বলতে চেয়েছিল বাতানুকুল কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যেই সিগন্যাল হলুদ হল। কথা শোনা গেল না আর। ওর চুড়ির রিনঠিন্ শব্দ বাজল জানলার ফিকে সবুজ দু'পরত কাচে। শুনতে পেল, না কি শুনতে পেল বলে মনে হল, তা ঠিক বুঝল না। কাচের বাইরে লেগে-থাকা ধুলো লাগল অর্যমার গালে। একজন সৌম্যদর্শন অল্পবয়সী পুরুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন যোজনগন্ধার ঠিক পাশে। হয়তো স্বামীই হবেন। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই হবেন। যোজনগন্ধারই বয়সী। অর্যমার চেয়ে অনেকই ছোট।

ভাবল, অর্যমা।

সেই মুহূর্তেই জীবনে প্রথমবার জানতে পেল ও, পতঙ্গদের বা বৃষ্টির ফোঁটাদের দুঃখের স্বরূপ। কাচের আড়ালে থাকার কষ্ট। ঠোঁট নড়ে, হাতের আঙুল অস্থির অভিব্যক্তি করে, ভ্রূভঙ্গী ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, উত্তেজনায় চোখ উজ্জ্বলতর হয় ; ডানা ঝাপটাতে থাকে অবিরত দুই পতঙ্গ কাচের দু'দিকে কিন্তু তবু শব্দ ঘুমিয়েই থাকে।

এ এক দারুণ অসহায় করুণ অবস্থা।

রেলগাড়ির সময় নেই, সময় নষ্ট করবার। ছেড়ে দিল গাড়ি। ঠিকানা জানা হল না।

কথাও হল না আর। কখনও কি হবে আর ? তার কার্ডটা রেখেছিল কি যোজনগন্ধা যত্ন করে ? নাকি, কোথাও পড়ে-টড়েই গেল ? বড়হি থেকে হাজারীবাগের পথে ঢুকেই জোরে অ্যাকসিলারেটর দাবাল রহিম। যত জোরে ওর এ গাড়ি চালানো সম্ভব তত জোরেই চলতে লাগল।

কিছুক্ষণ চলার পরই ডান দিকে রাজডেরোয়া ন্যাশনাল পার্কের গেট পড়ল। রাজডেরোয়ার পরেই পদ্মার রাজার প্রাসাদ। চাঁদনি রাতে এবং অন্ধকার রাতেও এর সাদা রঙের জন্য ভারী সুন্দর দেখায় প্রাসাদটিকে। পদ্মার রাজাদের বাঘ-ধরার ট্র্যাপ ছিল এই বনে তা থেকেই নাম "রাজডেরোয়া"। তারও অনেক বছর পরে এ বনেরই নাম হয় হাজারীবাগ ন্যাশনাল পার্ক।

পদ্মার রাজার বাড়ির পর পাখারিয়া। তারপরই দেখতে দেখতে হাজারীবাগের সীমান্তে চলে এল গাড়ি এয়ারস্ট্রিপটি পেরিয়ে।

হাজারীবাগ শহরে ঢোকার আগে পথের ডান দিকে দিগন্তবিস্তৃত মোরব্বা ক্ষেত। লাল মাটির মধ্যে এই প্রচণ্ড গরমে পাটকিলে-রঙা হাত-পা ছড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। খরগোস আর সাপেরা অন্ধকার হলেই বেরোবে। আর এই মোরব্বা ক্ষেতের পরই ডান দিকে রিফর্মেটরির লাল পথের পাশে হাজারীবাগ লেক-এর জলের চিকচিকানি দেখা যেত পথ থেকেই। তার পরেই হাজারীবাগ জেল। কিছুদিন হল বন বিভাগ বড়হি রোড-এর ডান পাশে অ্যাকাসিয়া প্ল্যানটেশান করেছেন। গাছগুলো সবে কোমরসমান উঁচু হয়েছে। দেখতে দেখতেই বড় হয়ে যাবে। মেয়েদের মতোই বাড়ন্ত ওদের গড়ন।

বাংলোর সামনে এসে হর্ন বাজাল রহিম। মালী পিটুল এসে গেট খুলল। খুলতে-খুলতেই বলল, শেখর সাহাব আয়া।

একটু নিচু গলাতে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলার মতো করে কথা বলে পিটুল। ওর ভোকাল-কর্ড-এ কোনো গণ্ডগোল আছে।

চায়ে-উয়ে পিলায়া কী নহী ? ধানিয়াকো বোলা থা ?

অর্যমা শুধোলো।

নহী মালিক। আপ্‌হিকি ইন্তিজারীমে হ্যায় উনোনে। আভভি আভভি আয়া। উনোনে মনা কর্ দি।

গাড়ি থেকে অর্যমা নামতেই রহিম বুনো শুয়োরের মতো ধড়ফড় করা গাড়িটা ড্রাইভে ঘুরিয়ে নিয়ে সালাম করে চলে গেল। ভাড়া ও কখনওই সঙ্গে-সঙ্গে নেয় না। জমিয়ে রাখে। অভাবী লোক। যখন দরকার পড়ে অল্প-অল্প করে চেয়ে নেয়।

মিস্টার কমল শেখর এবং তাঁর স্ত্রী মতিভাবী বিহারের মানুষ হলেও বাংলা বলতে পারেন। মতিভাবী তো বাংলা পড়তেও পারেন। বাংলা কবিতা এবং সাহিত্যের খুবই ক উনি। সুন্দরী বলেও খ্যাতি আছে এই ছোট শহরে।

কা খবর কমলদাদা ? লং টাইম নো সী !

আরে ভাই, পটনা গেছিলাম। হাজারীবাগে একসঙ্গে সাত দিন থাকব তার উপায় কি বলো ?

সে তো জানিই ! আপনি তো এখন নন-রেসিডেন্ট হাজারীবাগী ! তা, গেছিলেন কেন ? পটনা ?

আর কেন ! একটা সিম্পোজিয়াম ছিল। জানোই তো ভাই, হাজারীবাগ পুলিশ ট্রেনিং কলেজও আমাকে মাঝে-মাঝে লেকচার দিতে বলেছে। যদিও শুরু করিনি। এদিকে

শুনলাম হাজারীবাগ-বগোদর রোডের ওপর "মেরু"তে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স-এর জবরদস্ত ট্রেনিং সেন্টার হবে। তিন-চার বছরের মধ্যেই নাকি হয়ে যাবে। সেখানেই ট্রান্সফার না করে দেয় ! যে-কোনো চাকরিতেই "লাইং-লো"ই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। ক্রমশই বুঝতে পারছি। এই দেশে, জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রেই "হাই-প্রোফাইল"" যাঁরা তাঁদেরই সব বিপদ চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। কী, ঠিক বলেছি কি না ?

ঠিক। অর্যমা বলল। তারপরে বলল, আপনাকে ডাকবে না তো কাকে ডাকবে দাদা ? আপনার মতো কমপিটেন্ট লোক পাবে কোথায় ?

কমল শেখর বললেন, এই শুরু হল তোমার প্যায়েরভি।

কিন্তু মনে-মনে খুশি হলেন খুবই। ঈশ্বরও প্যায়েরভিতে খুশি হন, আর কমল শেখর তো সামান্য একজন মানুষ। যদিও পুলিশ ; তবুও মানুষ। এবং ভদ্রলোকও। ব্যতিক্রমী পুলিশ। সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম অবশ্যই থাকে।

কি খাবেন ? চা ? না কফি ?

তুমি আবার সন্ধের পরে ওসব খাও নাকি অর্যমা ?

না, না। খাই। এই সব কি আর রোজ রোজ খাবার জিনিস দাদা ? তাছাড়া, অনেক রকম নেশাই মাঝেমধ্যে করি বটে তবে কোনো নেশাই আমাকে পাবে, সেটি হবে না। কোনদিনও না।

তারপরই বলল, আপনাকে অন্য কিছু দেব ? রাম বা হুইস্কি ? ভড়কা খাবেন ? এক কবি, রাশিয়া থেকে নিয়ে এসেছেন। এক বন্ধু নিয়ে এসেছেন সানটোরি হুইস্কি জাপান থেকে এবং আরেকজন অ্যামেরিকান বুবোর্ন। খাবেন ?

নাঃ, থাক। চান-টান করিনি এখনও। তা ছাড়া অনেক জায়গায় যেতে হবে। ফোন যে কবে ঠিক হবে।

বলেই, সামনে একটু ঝুঁকে, বুক পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে বললেন, এই নাও ভাইয়া।

কি ?

মতি তোমাকে দিয়েছে।

ভাবী ?

হ্যাঁ।

কী ব্যাপারে ? মানে, কিসের চিঠি ?

একটু ভয় পেয়েই বলল, অর্যমা।

জানি না। সম্ভবত শনিবার রাতে তোমাকে খেতে নেমন্তন্ন করেছে। চিঠিতে এই কথাই আছে বলে আমার মনে হচ্ছে। আরও কিছু থাকতে পারে। আমার জানার কথা নয়, প্রয়োজনও নেই। অনেককেই খেতে বলেছে। করিম সাহেব, গপুবাবু, ফুদিবাবুদেরও পরিবারসুদ্ধুই বলতে বলেছে। তাই...। সকলের বাড়িতেই গিয়ে বলতে হবে আমাকেই। গপুবাবুর বাড়িতে কলকাতা থেকে কিছু মেহমান এসেছেন, তাঁদেরও বলতে বলেছে। এস.পি. সাহেবকেও, সস্ত্রীক। তবে হ্যাঁ চিঠি দিয়ে নেমন্তন্ন শুধু তোমাকেই।

অকেশানটি কি ? জানেন নিশ্চয়ই ?

দাবার গুটিরই মতো প্রসঙ্গ বোর্ডের অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে বলল অর্যমা, গপুবাবু যে মানুষখেকো বাঘটি মেরেছেন সিলাওয়ার পাহাড়ে, সেই জন্যেই কি ? তারই সেলিব্রেশান ?

অজীব অদমী হো তু ভাই ! আরে না ! সে জন্যে নয়। গপুবাবু বাঘ মেরেছেন তার জন্যে আমার বিবি সেলিব্রেট করতে যাবেন কেন ? তা ছাড়া বাঘ, লক্‌রা, পেন্ড্রা, ভাল্ তো গপুবাবু বহুতই মেরেছেন। ও, মনে পড়ে গেল, ফাক্‌তা ইমামকেও বলতে বলেছে তোমার ভাবী।

সে আবার কে ? এরফান ইমামের ছেলে ?

ক'টা ফাক্‌তা ইমাম আছে হাজারীবাগে ?

ও। কিন্তু অকেশানটি ? কিঁউ দাদা ? ভাবীর জন্মদিন-টন্মদিন নয় তো !

শেখর সাহাব ফাঁপরে পড়ে গিয়ে বললেন, দাঁড়াও। দাঁড়াও। শনিবার কি তারিখ ? ভাল মনে করিয়েছো তো !

শনিবার পনেরো তারিখ। অর্যমা বলল।

পনেরো তারিখে, এই মাসেরই ; পটনার সেই বড় ওয়াগন-ব্রেকারদের দলের পাণ্ডা শারদুল সিংকে "ন্যাব" করেছিলাম দশ বছর আগে। তাই তারিখটা মনে আছে।

তারপরেই বললেন, যাঃ শালা। ভুলেই মেরে দিয়েছি। তাই তো ! সেদিন তো মতির জন্মদিনই ! দুপুরে আজ খেতে গেছি বাড়িতে যখন, দেখি, শোবার ঘরে, খাটে শুয়ে-শুয়ে লিস্টি বানাচ্ছে নেমন্তন্নের। অকেশান-এর কথা কিছু উল্লেখ করেনি। আমিও জিজ্ঞেস করিনি। মাথার মধ্যে সাত ঝামেলা। পুলিশে যে কত্ত রকমের ঝামেলা, তা কী বলব ! কবে যে বদলি হব ! যেন আমার নিজেরই জেলখানা ! গত বছরে একদিন দুপুরে বাড়ি ফিরে দেখি, একটি নতুন তাঁতের শাড়ি পরে রয়েছে তোমার ভাবী। শুধিয়েছিলাম, হলটা কি ? দুপুর বেলা, নতুন শাড়ি !

তোমার ভাবী বলেছিল, ইচ্ছে হল, তাই। যাই তো না কোথাওই ! সব শাড়িই তো আলমারিতেই দুর্গন্ধ হয়ে পচে গেল। আলমারি খুললেই আমার জীবনের গন্ধ পাই। মণ্ডত-এর গন্ধও।

আপনি কি বললেন ? অর্যমা শুধোলো।

অওরত্-এর এত "ডায়লগ্" শোনার সময় নেই আমার ইয়ার। বললাম, আমি আমারই মণ্ডত-এর গন্ধ পাচ্ছি। খানা লাগানে বোলো।

অর্যমা বলল, ছিঃ দাদা ! ভাবীর জন্মদিন ! এসব যে অত্যন্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাছাড়া মেয়েরা খুব সেনসিটিভও হন। আমাকে বলেছেন বলেছেন, এ কথা আর কাউকেই বলবেন না। ছোট করা হবে নিজেকে। মানে, আপনাকেই।

অদ্ভুত এক হাসি ছড়িয়ে গেল শেখর সাহাবের মুখে। সবচেয়ে আগে তা ছড়াল ওঁর চোখে। তারপর ভুরুতে।

নিয়মিত তেল-মাখা, ব্যায়াম-করা, রোদ-লাগানো মানুষটার শরীরের রঙ লাল। তেমনই কাটা-কাটা চোখ নাক চিবুক। ছ' ফিট দু' ইঞ্চি লম্বা। অত্যন্ত সুগঠিত শরীর। যে-কোনো নারীই প্রথম দর্শনেই ওঁর প্রেমে পড়বেন। অবশ্য যাঁরা শুধু শরীর দেখেই প্রেমে পড়েন, তাঁরাই। মন তো অত সহজে বোঝা যায় না।

দুঃখের বিষয় এই যে, নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকেই শেখর সাহাব প্রেমে পড়াতে পারলেন না তাঁর সঙ্গে। অবশ্য তিনি ও-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেননি। শেখর সাহাবের প্রেম ছিল শুধু তাঁর কেরিয়ারেরই সঙ্গে।

কমল শেখর হঠাৎই উঠে পড়ে বললেন, অব চলে ভাইয়া। আরও অনেক জায়গাতে যেতে হবে তো !

অর্যমাও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজকে আটকাব না। আরেকদিন আসবেন কিন্তু ভাবীকে নিয়ে।

আবার ভাবী কেন ? একা আসা কি বারণ ? তোমার ইয়ার, কোথাওই আওরাত ছাড়া চলে না। বিয়েসাদী তো করোনি ? করলে জানতে, জাস্ট পনেরো মিনিটের জন্যেই তাঁরা ভালো। তারও পর সহ্য করো কি করে জানি না। সেই যে গত শীতে "হারহাদ্"-এ পিকনিকে গেলাম। ভাবলাম, স্ট্যাগ-পার্টি হবে। পী-কর্ বেহোঁশ হো যায়গা। ঠিক ছিল, চুরি করে একটা কচি শম্বরভি মেরে কাবাব করে খাব। ডি.এফ.ও. সহায়কে বলেও রেখেছিলাম। সে বলেছিল, কোই বাত নেই, আমাকে শুধু একটা রাঙ পাঠিয়ে দিও। পেছনের রাঙ। যাই হোক, তুমিই তো দিলে সব প্ল্যান ভেস্তে। রাজ্যের বিবিদের জোটালে সঙ্গে। নিজে বিয়ে না-করেও যে, কোনও মরদ এমন বিবিভক্ত হতে পারে তা কখনও দেখিনি। অজীব্ আদ্মী তু ভাই।

হাসতে হাসতেই বললেন কমল শেখর।

অর্যমাও হাসল, ভাবতে-ভাবতে।

ভাবী কি লিখেছেন তা জানার জন্য অর্যমার মন আনচান করছিল।

শেখর সাহাবের কথার পিছনে কি কোনও খোঁচা ছিল ? প্রচ্ছন্ন ? অবশ্য প্রচ্ছন্নতা যে কী বস্তু তা অনেক মানুষই জানেন না। শেখর সাহাবও জানেন না।

গেট অবধি শেখর সাহাবকে পৌঁছে দিল অর্যমা।

ওঁর বয়স কিন্তু তেমন কিছুই হয়নি। যেভাবে উনি বিহার পুলিশ ফোর্সে দ্রুত উন্নতি করছেন তাতে সত্যি সত্যিই শেষ জীবনে আই.জি. কেন, ডি.জি-ও হয়ে যেতে পারেন। বিহার ক্যাডারে এমন সুদর্শন, সাহসী, ডেয়ার-ডেভিল আই.পি.এস. অফিসার বহু দিন নাকি হয়নি। ডি.জি. না-হলেও আই.জি.-তো হবেনই।

শেখর সাহাবের জিপ চলে গেলে অর্যমা ফিরে গিয়ে বারান্দাতে বসল সাদা বেতের চেয়ারে। বেলা পড়ে গেছিল। পশ্চিমাকাশে এখন নানা ফিকে রঙের খেলা। প্রতিদিনেরই এই সময়টাতে অর্যমা ওর নামের মাহাত্ম্যটি নতুন করে অনুভব করে। জুতো খুলে, খালি পা দুটি সাদা কাঠের রেলিংয়ের ওপরে তুলে দিয়ে ভাবীর চিঠিটি খুলল ও। অর্যমা জানত যে, মতিভাবীর চিঠিটি শুধুমাত্রই নেমন্তন্নর চিঠিই ছিল না। এবং সম্ভবত কমল শেখরও জানতেন।

আজ যোজনগন্ধার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েই মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেছে। কিংবা ভাল। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। যোজনগন্ধাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছিল অর্যমা। সেই মেয়েটিই এই মেয়ে ! আশ্চর্য !

যে-কৃষক বৃষ্টি নামানোর প্রার্থনায় যোগ দিতে যাচ্ছিল গ্রীষ্মদিনের ঊষর পথ বেয়ে দূর গাঁয়ের প্রার্থনাসভায় ; তারই নিজের ঘরের উপরে হঠাৎ ঘন কালো মেঘ ছেয়ে এল। ঝুরুঝুরু করে হাওয়া দিতে লাগল। তীব্র, উত্তেজিত চিৎকারে আর লাফালাফিতে টাঁড়ের আর বনের পাখিরা বৃষ্টি আসতে যে পারে, এই সম্ভাবনার কথাই সোচ্চারে প্রচার করতে লাগল।

কিন্তু অর্যমা জানে যে, মেঘের নাম জলদ হলেও সব মেঘই বৃষ্টিবাহী হয় না। সব মেঘই সুখদা নয় ; দুখদাও হয় তারা। মাথার উপরে এসে, সজনে পাতায় দোলা দিয়ে ; নিমগাছে তীব্র ঝরঝরানি তুলে সে মেঘ হঠাৎই ভেসে যেতে পারে অন্য দিকে। ভিন্ন চাতকের পিপাসা মেটাতে, ভিন্ন গাঁয়ে। মেঘেদের আর মেয়েদের মধ্যে খুবই মিল।

চিঠিটি খুলতে গিয়েও খুলল না অর্যমা। ভাবল, চান-টান করে, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে, একটু রুহ্-খস্স ইত্তর মেখে ক্লান্তি অপনোদন করে তবেই খুলবে। একটা হুইস্কি ঢেলে নেবে। নয়তো লেবুর চাকতি আর বেশি করে বরফ দিয়ে একটি "টল রাম্"।

আজ ট্রেনটা লেট ছিল। তাছাড়া সারাটা দিন গরমও গেছে প্রচণ্ড। তারপর রহিমের প্রাগৈতিহাসিক ঐ হুড়খোলা যন্ত্রযানে এতখানি পথ যাওয়া-আসা!

ধানিয়াকে বারান্দাতে চা নিয়ে আসতে বলে জ্যাকারান্ডা গাছের সারির দিকে চেয়ে বসে রইল ও। জ্যাকারান্ডারা গরমেই ফোটে। ভারী সুন্দর ফিকে বেগুনি-রঙা ফুল ধরে বড় বড় গাছগুলোতে। আফ্রিকান গাছ এগুলো। ইংরেজরা অনেকেই গুণের জাত ছিলেন। গাছকে ভালোবাসতে জানতেন তাঁরা। জ্যাকারান্ডা ফোটার সময় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু 'দ্যা জ্যাকারান্ডা'র হাতার জ্যাকারান্ডারা ফোটে জুনের শেষ পর্যন্ত। তাই হয়তো এই বাংলোর অমন নাম দিয়েছিলেন মিস্টার উলব্রিজ, যিনি মালিক ছিলেন এই বাংলোর।

কেসিয়া ভ্যারাইটিরও কতরকম গাছ যে আফ্রিকা থেকে ইংরেজরা এনে এ দেশময় লাগিয়েছিলেন! কত্তরকম চেহারার, কত্তরকম ফুলের। অ্যাকাসিয়া। বাওবাবও এনেছেন। যার আরেক নাম "দ্য আপসাইড-ডাউন" ট্রীজ। বাওবাব অবশ্য মধ্যপ্রদেশের মাণ্ডু দুর্গের মধ্যেও দেখেছে ও। মুসলমান নবাবেরাও আফ্রিকা থেকেই এনে লাগিয়েছিলেন।

গ্রীষ্মে-সন্ধ্যায় হাজারীবাগের নির্জন আরণ্যক পরিবেশে জ্যাকারাণ্ডার ফিকে, স্বপ্নিল, বেগুনি, শেষ-সূর্যের গোলাপি-লালে মিলে যেন এক নাম-না-জানা রঙে মুড়ে দিয়েছে নিজেকে। গেটের দু'পাশে দুটি বাঁদর-লাঠি গাছ। যার বটানিকাল নাম, কেসিয়া ফিস্টুলা। কম্পাউন্ড ওয়াল-এর ধারে ধারে ইউক্যালিপ্‌টাস, ঝাউ, কৃষ্ণচূড়া; সফেদা। বাবুর্চিখাবার পেছনে তিনটি কারিপাতার গাছ। পোর্টিকোর পাশে পাশে পুটেলিকার বেড। এই গরমেই ফোটে তারাও। বহুবর্ণ উজ্জ্বল উদ্বেল কামনারই মতো দিনভর ফুটে থাকে। কামার্ত করে তোলে সমস্ত পরিবেশকে। আর বোগোনভিলিয়া তো আছেই! বিচিত্র রঙা; স্তবকে স্তবকে ফুটে আছে।

এই বাংলোতে, অর্যমা ভাড়া নেওয়ার আগে, ডি.ভি.সি'র. এক বড় অফিসার ছিলেন। এক মারাঠি ভদ্রলোক। পুনেতে বাড়ি। শিবাজী মহারাজের খুবই ভক্ত ছিলেন নাকি। এখনও বসবার ঘরে ছত্রপতির একটি ছবি টাঙানো রয়েছে। খোলেনি আর অর্যমা। নাম ছিল বিকাশ আপ্তে। তিনি আর তাঁর স্ত্রী পল্লভী মিলে এই বাগান গড়ে তুলেছিলেন। বাগানই ছিল তাঁদের প্রাণ। বাগান করাও যে এক ধরনের পুজো তা তাঁদের এই বাগান দেখেই অর্যমা প্রথমে বুঝেছিল।

বড় গাছগুলি, সবই অবশ্য লাগিয়ে গেছিলেন মিঃ উলব্রিজই। ওর প্রসঙ্গ উঠলে মিঃ উলব্রিজের পুরোনো মালী পিটুল বলে, "উলবিজা" সাহাব।

ধানিয়া চা নিয়ে এল। সঙ্গে খাস্তা নিমকি আর আমলকির আচার।

দুটি মস্ত আমলকি গাছও আছে বাংলোর পেছনে। হাতারই মধ্যে। আমলকি এই সেদিন পর্যন্তও ছিল। শীতের আগেই, শরতেই পাতাঝরা শুরু হয় ঝুরঝুর করে। পত্রহীন গাছে গাছে থোকা থোকা আমলকি ফুটে থাকত। নিচে ঝরে পড়ত শ'য়ে শ'য়ে। ধানিয়ার বউ বুধিয়া সেই আমলকি কুড়িয়ে রাখে। তারপর কেটে আচার বানায়। শুকনো আমলকিও রেখে দেয় বয়মে করে ভাঁড়ার ঘরে। দু'বেলাই খাবার পরে দেয় অর্যমাকে। মুখশুদ্ধি।

এ বাড়ির হাতাতে তিন-চারটি মহুয়াও আছে। প্রাচীন মহুয়া। মহুয়ার ফলনও শেষ হয়েছে প্রায় মাসখানেক হল। এখন আর হাওয়াতে কোনও সুগন্ধ নেই। কানহারি পাহাড়ের গাছগুলো পাটকিলে, রক্তশূন্য ; রুক্ষ হয়ে গেছে। সীতাগড়া আর সিলাওয়ার দেখা যায় না এখান থেকে। কিন্তু হাজারীবাগ শহরকে ঘিরে আছে তিন দিকে এই তিন পাহাড়।

চেয়ার ছেড়ে ওঠার আগে চিঠিটি একবার হাতে নিয়েই আবার নামিয়ে রাখল অর্যমা। ধানিয়া এসে চায়ের বাসন নিয়ে গেল।

তারপরই ও চানে গেল।

বাথরুমের খোলা জানলা দিয়ে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। বাংলোটা যেখানে, সে জায়গাটা বেশ উঁচুতে। এবং বাথরুমের দিকে বাংলোর হাতাতে বড় গাছ কম। লালপাতিয়া, মানে যার ইংরিজি নাম পনসাটিয়া, রঙ্গন, কাঠগোলাপ, লতানে গোলাপ, ছোট্ট একটা জ্যাপানীজ গার্ডেন ; যোধপুরী লাল পাথরে বাঁধানো হাঁটার পথ।

উলব্রিজ সাহেব, আপ্তে সাহেব এবং গপু সেনেরও কিছু কৃতিত্ব আছে এই মনোরম বাগানের পেছনে। নানারকম ক্যাকটাই, ফার্ন, অর্কিড ; সাকুলেন্টস। জাপানীজ গার্ডেনটি অর্যমা এ বাড়ি নেবার পরে গপু সেনের উৎসাহেই বানানো হয়।

পেটে ভাত না থাকলেও এমন বাগানে বেঁচে থাকা যায়।

অর্যমা তার মনের মধ্যেও এমন একটি বাগান গড়ার চেষ্টা করে অবিরত। যাতে, সবরকম আর্তি নিয়েও সহজে বাঁচতে পারে ! কিন্তু সে যে কঠিন কাজ বড় ! অসময়ের কালবৈশাখী, শিলাবৃষ্টি ; আঁধি, তার স্বপ্নকে ভেঙে-চুরে দিয়ে যায়। বারে বারেই।

চান সেরে, জামাকাপড় পরে বারান্দাতে এসে চিঠিটি খুলল অর্যমা। ছোট্ট চিঠি।

হাজারীবাগ, ২৯শে মে

প্রিয় দেভরজী,

আগামী শনিবার আমার জন্মদিন। তোমার আসা চাই-ই।

সন্ধেবেলায় খাওয়া-দাওয়া। জানাশোনা অনেককেই বলেছি এবং কাউকেই উপলক্ষটা জানাইনি। শুধুমাত্র তোমাকেই জানালাম।

তোমার তো দফতর নেই শনিবারে। আসলে কোনও বারেই। তুমি সকাল দশটা নাগাদ অবশ্যই এসো। রাতে তো ভিড়ও থাকবে অনেক। শেখর সাহাব তো সকালেই চলে যান। আর থাকলেই বা কী ! চাকরিতে উন্নতির স্বপ্নে সে মানুষটা এতই মশগুল থাকেন সবসময়েই যে, চোখের সামনে দিয়ে হাতি এসে তাঁর পদ্মবন তছনছ করলেও তিনি দেখতেও পান না। আসলে, তাঁর পদ্মবন যে আদৌ আছে, সে খবরটিই তিনি রাখেন না।

আমার চবুতরায় অনেকই দানা ছড়ানো আছে অর্যু। প্রতিদিন ভোরে উঠেই ছড়িয়ে দিই। দিনের বারো ঘন্টা এই গ্রীষ্মদিনে অনেকই প্রাণী এসে তা খুঁটিয়ে খায়ও। কবুতর, চড়াই, পথ-চলতি ষাঁড়, বদরু মিঞার পেছনের দু'পায়ে-দড়ি-বাঁধা সাদা-দাড়িওয়ালা বকরী ; মায় ধোপার গাধা পর্যন্ত। কিন্তু এ চবুতরায় কোনও মানুষই আসে না।

তুমি মাঝে-মাঝে আসো, তাই এখনও বেঁচে আছি।

বর্ষারম্ভে দিল্লি থেকে মস্ত খেয়ালি আসছেন মকবুল সাহেবের বাড়িতে। "মিঞা কি মল্লার" গাইবেন। জানো তো, মিঞা কি মল্লার হল গিয়ে রাগের সেরা রাগ। মল্লারের

মধ্যে সেরা তো বটেই।

ওস্তাদের নাম বশির খাঁ। তাঁর ইলম্ আর হুনরমন্দির নাকি কোনও জবাবই নেই। বরখার ঘটাকারি, বিদ্যুতের চকমকানি, করক্ আর গড়গড়াহট্-এর কম্মী থাকবে না নাকি সেই মল্লারে! এইসব গুণীকে সামনে বসে না শুনলে জীবনই বৃথা।

আমাকে ম্যায়ফিলে নিয়ে যাবার ভার কিন্তু তোমার উপরেই রইল। তোমার কমলদাদা তখন কোথায় চোর ধরতে চলে যাবেন কী হাজারীবাগ স্টেশনে সফেদ কুর্তা-পাজামা-পরা দেশোদ্ধারকারী কোনও-না-কোনও জনদরদী নেতার; বড়-চোর-এর ডিউটিতে লেগে থাকবেন, তা ঈশ্বরই জানেন না, আমি কী করে জানব বলো?

সকালে অবশ্যই এসো। আমি চান করে থাকব। তোমার পছন্দসই হলুদ শাড়ি আর কালো ব্লাউজ পরে। হলুদ-বসন্ত পাখি হয়ে থাকব আমি।

তোমার বাগান থেকে ফুল তুলে নিয়ে এসো। তুমি জানো, আমি কী ফুল ভালোবাসি।

তোমাদের অতুলপ্রসাদের একটি নতুন গান শিখেছি রেকর্ড থেকে। "আমার বাগানে এত ফুল, কেন যায়, ঝরে যায় রে।"

তোমাকে শোনাব।

ভালো করে দাড়ি কামিয়ে আসতে ভুলো না।

আমার গাল জ্বালা করে নইলে।

ইতি—শ্রীমতী ভাবী; সিরিফ তুমহারাই।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ স্বামীর হাত দিয়ে যে নাজুক নারী এমন চিঠি পাঠাতে পারেন তাঁর সাহসের তারিফ করতেই হয়। কবে যে শ্রীমতী ভাবী কোতল হয়ে যাবেন শেখর-সাহেবের হাতে! বোঝা পর্যন্ত যাবে না কী করে অমন ফুলের মতো মহিলা হঠাৎই চলে গেলেন।

একজন বেচারী, দুখী নারীকে সুখী করতে চেয়ে, অন্যর দুঃখ ভরাট করতে গিয়ে, এমন করে অপঘাতেই মরতে হবে একদিন হয়তো অর্যমাকেও। জানে, অর্যমা।

সেদিন বাগাইচাটোলির এক সাধু তার কপাল দেখে বলেছিলেন, রক্তাক্ত হয়ে মরবে ও। ভায়োলেন্ট ডেথ।

ভাবীজী কমল শেখরের মতো মানুষকে নিয়েও কেন যে সুখী নন তা ভেবেও পায় না অর্যমা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা ভারী গোলমালের। তার রকমটা বাইরে থেকে বিন্দুমাত্র অনুমান পর্যন্তও করা যায় না। মেয়েদের শূন্যতাবোধের রকমটাও ভারী অদ্ভুত। খুব কম পুরুষই বোঝেন সেই চোরাবালি বা ঘূর্ণিস্রোতের অসীম রহস্য। বুঝতে যাওয়াটাও মারাত্মক বিপদের।

শ্রীমতী ভাবীকে এবার থেকে আস্তে-আস্তে অ্যাভয়েড করতে হবে। খুবই আস্তে-আস্তে। হঠাৎ করলে, সাংঘাতিক কাণ্ড হতে পারে।

এই এক সমস্যা। পুরনো সম্পর্কর লুজ-এণ্ডস সুষ্ঠুমতো যে না গোটাবে তাকেই জীবনের বনপথের প্রতি ঝোপে-ঝোপে লুকিয়ে-থাকা রাগী মানুষখেকো বাঘিনীর সামনে দিয়ে চলতে হবে সমস্তটা পথ। বাকি জীবন।

পরকীয়া আরম্ভ করা খুবই সোজা। গোটানো ভারী মুশকিল।

রাম্-এর গ্লাসে চুমুক দিয়ে মনে-মনে বলল।

লেখা শেষ করে সূর্যাস্তর আগে সার্কিট-হাউসের দিকে হাঁটতে গেছিল। বাড়ি ফিরে দেখল মালী, পিটুল, একটি চিঠি রেখে গেছে বাইরের বারান্দার টেবলে। দিল্লির ছাপ মারা।

জামাকাপড় না-ছেড়েই, চান না-করেই ; ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ে তুলল খামটি। খুবই হালকা। এত কম ওজন দেখে দুঃখিত হল।

তারপরই ভাবল, ওজন কম হলেও ভার যে কম হবে তার কি মানে ?

দিল্লির মানুষদের খুবই মজা। তারা কত সুন্দর সুন্দর ডাকটিকিট ব্যবহার করতে পারেন। সব নতুন টিকিটই তো দিল্লি থেকেই প্রথমে বেরোয়।

যে-চিঠির মুখ চেয়ে রাত-দিন-সপ্তাহ কেটেছে, এ চিঠি সেই চিঠি। যোজনগন্ধার চিঠি।

অর্যমা রায়
"দ্যা জ্যাকারাণ্ডা"
সার্কিট হাউস এরিয়া
হাজারীবাগ টাউন, বিহার
পিন ৮২৫৩০১

নিউ দিল্লি
৭২ জনপথ রোড

মাস্টারমশাই,

ঘরের কোণে শুইয়ে-রাখা তানপুরার তারে অসময়ের দামাল হাওয়ায় উড়ে-আসা নীল মাছি হঠাৎ এসে বসে মনের ঘরময় ঝংকার তুলেই মিলিয়ে গেল। অনুরণন উঠলো মনে। অনেক দিনের পরে।

এতদিন পরে এমন হঠাৎ-দেখা হয়ে কী যে ভাল লেগেছে! আর কী বলব জানি না। ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যি! এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলেন? কত যে খুঁজেছি আপনাকে! কত ভাবে যে খুঁজেছি। তা স্বীকার করতেও লজ্জা করছে আজ! আমার ঠিকানা দিলাম। যোজনগন্ধা জোয়ারদার; পদবী মনে আছে কি? কম্প্যুটার ইনকরপরেটেড, ৭২, জনপথ, নিউ দিল্লি-১১০০০১। ইচ্ছা যদি হয় তো লিখবেন।

আমার মাস্টারমশাই অর্যমা রায়ই যে লেখক অর্যমা রায় তা জানতে পারি মাত্র মাস ছয়েক আগে। কত বিখ্যাত মানুষ আপনি এখন। কত অনুরাগী আপনার। এখন কি আর যোজনগন্ধার জন্যে সময় হবে?

সত্যি! ভারী ভাল লাগছে।

বাড়ি শিগগিরই বদলাব। তাই আপাততঃ অফিসের ঠিকানাই দিলাম।

ইতি—
যোজনগন্ধা

boiRboi

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
কম্প্যুটার ইনকরপরেটেড
৭২ জনপথ, নিউ দিল্লি-১

দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ
পিনকোড ৮২৫৩০১

যোজনগন্ধা, কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠি এল গতকাল বিকেলে। মনে আছে ; সবই মনে আছে।

"মাস্টারমশায়" সম্বোধন দেখে খুবই মজা লাগল।

এই আমি, অর্যমা রায়, ভাবতেই পারিনি যে, আমাকে কেউ আবারও কোনওদিন "মাস্টারমশায়" বলে ডাকবে !

সত্যি বলতে কী, যখন তোমার শিক্ষক ছিলাম তখন শিক্ষকতা করি এমন বিদ্যা ছিল না আমার। আজও হয়নি। তা ছাড়া, এখন বয়স বেড়েছে বলেই সাহস কমেছে। ক্লাস থ্রীর কোনও ছেলে বা মেয়েকে আজ কেউ পড়াতে বললেও পড়াতে পারব না। এখনকার দিনের পড়াশুনোর রকম ও ছাত্রছাত্রীদের মানসিকতাও আমাদের দিনের থেকে অনেকই পালটে গেছে।

পরিণত বয়সে পৌঁছে "মাস্টারমশায়" সম্বোধনে চমকে উঠতেই হয়। সুড়সুড়িও লাগে। পেছন ফিরে চাইলে সত্যিই আতঙ্কিত হই। কী সাংঘাতিক সময়ই না পেরিয়ে এসেছি ! সাংঘাতিক, বলে সাংঘাতিক !

চিঠি পড়ে মনে হল যে, তুমি ঠিক সেইরকমটিই আছ। সব ব্যাপারেই অমনোযোগী। এদিক সামলাও তো ওদিক ডোবাও। সেরকমই ছেলেমানুষটি।

বহুদিন পরে আমার সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যে দেখা হয়ে "খুবই ভাল লেগেছে" কথাটি দু' লাইনে জানিয়েই কি তোমার ছুটি ?

তুমি কী করো ? তোমার স্বামী কি করেন ? তাঁর নাম কি ? তোমাদের ছেলেমেয়ে কি ? তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ; মানে, যারা আমার পরিচিত ছিল ; তাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আছে কি নেই ? এসব কোনও কিছুই তো জানাওনি চিঠিতে ?

ট্রেনের কামরাতে তোমার পাশে যে হ্যাণ্ডসাম ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন তিনিই কি তোমার স্বামী ?

তোমার দুই প্রিয়সখী ছিল না ? উদ্ভট নামের ? সিনিবালি আর ইলবিলা ? তাদের নামের অভিনবত্বর কারণেই নাম দুটি আজও মনে আছে।

আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছি তোমার মধ্যে কৌতূহল ব্যাপারটার এমন সাংঘাতিকরকম অভাব দেখে। মেয়েদের মধ্যে ঠিক এমনটি কিন্তু আগে দেখিনি কাউকেই !

আমার সম্বন্ধে তুমি কিছুমাত্রই জানতে চাওনি !

আশ্চর্য !

ইতি
অর্যমা রায়

পুনশ্চ : অতি-বিলম্বিত হলেও নববর্ষের শুভেচ্ছা জেনো। তোমার স্বামীকেও জানিও।

boiRboi.net

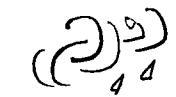

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
কম্প্যুটার ইনকরপরেটেড
৭২, জনপথ, নিউ দিল্লি

মাস্টারমশাই,

আপনাকেও সেদিন দেখে মনে হয়েছিল আপনিও ঠিক আজ থেকে কুড়ি বছর আগের সেই লাজুক, মুখচোরা মানুষটিই রয়ে গেছেন। কিন্তু ছোট্ট হলেও, আপনার চিঠি পড়ে মনে হল ; তা নয়। আপনি অনেকই বদলে গেছেন। আমিও অনেক বদলে গেছি।

সময় বোধহয় সকলকেই বদলে দেয়।

এই আমি, যোজনগন্ধা ; একজন নিটোল নারী। সম্পূর্ণও বটে। আপনিও একজন আস্ত পুরুষ। আমার এবং আপনার এই পরিচয়টুকুই কি যথেষ্ট নয় ?

আপনি জানতে চেয়েছেন, যে-হ্যাণ্ডসাম ভদ্রলোক রেলগাড়ির কামরাতে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি আমার স্বামী কি না ?

না, তিনি আমার স্বামী নন।

কোনও মেয়ের পাশে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন বা বসে, এমনকি যিনি তার বশেও থাকেন, তিনি কি স্বামী ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না ?

মশাই ! তিনি আমার প্রেমিক। উনি কলকাতায় এসেছিলেন তাঁর অফিসের কাজে। একসঙ্গে ফিরে যাওয়াটা নেহাতই হ্যাপী কো-ইনসিডেন্স ছিল। আপনি আমার মাস্টারমশাই এ কথা জেনে উনি খুবই ইনকুইজিটিভও হয়েছিলেন।

কিন্তু আপনার পাঠানো বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছার জোর অবশ্যই আছে বলতে হবে। কারণ, আপনার শুভেচ্ছাবাহী চিঠিটি যেদিন আমি ভোরে পাই, ঠিক সেদিনই সেই "হ্যাণ্ডসাম ভদ্রলোক" বড়াখাম্বা রোডের, "হলিডে-ইন" ক্রাউন প্লাজার সামনের ফ্লাইওভারের উপরে ভর-সন্ধেতে তাঁর মারুতি গাড়িতে অ্যাকসিডেন্ট করে সঙ্গে-সঙ্গেই পটল তোলেন।

আমার কপালকেই ধন্যবাদ দেব, না আপনাকেই ; মানে আপনার শুভেচ্ছাকেই ; এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

নববর্ষের শুভেচ্ছা আপনি আর ক'জনকে পাঠিয়েছিলেন ?

তাঁরা কে কেমন আছেন অথবা আদৌ আছেন কি না, খোঁজ নিন অবিলম্বে।

ইতি—
যোজনগন্ধা

শ্রী অর্যমা রায়
হাজারীবাগ

boiRboi.net

দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

কল্যাণীয়াসু, যোজনগন্ধা,

তোমার চিঠি পেয়ে মর্মাহত হলাম। আমি খুবই দুঃখিত।

প্রিয়জনের মৃত্যু সংবাদটিও কি তুমি অন্যভাবে দিতে পারতে না? মৃত্যুও কি তোমাকে পরিণত-স্বভাবা বা গাম্ভীর্য-সম্পন্না করতে পারল না?

"পটল-তোলা" আবার কেমন ভাষা? কোনও ভদ্রমহিলাকে এমন ভাষা ব্যবহার করতে শুনিনি আমি কখনই।

এই মুহূর্তে তোমাকে আর কিছুই লেখার নেই।

তোমার শোকে আমার অকৃত্রিম এবং আন্তরিক সান্ত্বনা জেনো।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ভালো থেকো।

ইতি—
মাস্টারমশায় অর্যমা রায়

অর্যমা রায়
'দ্যা জ্যাকারাণ্ডা'
হাজারীবাগ
পিন ৮২৫৩০১

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
নিউ দিল্লি

মাস্টারমশায়,

সেদিন "পটল তুলেছে" বলে ঠাট্টা করেছিলাম বটে কিন্তু আজ কবুল করছি যে কৃপর মৃত্যুটা আমাকে বড়ই বেজেছিল।

তার নাম ছিল কৃপ।

সে আমার কেউই ছিল না। কোনওরকম সামাজিক বন্ধনই ছিল না তার সঙ্গে। ভবিষ্যতে হলেও বা হতে পারত! তবু সে আমার অনেকখানিই জুড়ে ছিল। আমার

boiRboi.net

আনন্দের সঙ্গী ছিল। দুঃখেরও।

দেনা-পাওনা ছিল না কিছুমাত্রই! প্রত্যাশাও। কখনও-কখনও একে অন্যকে কিছু কিনে দিয়েছি যে না, এমন নয়। অঢেল অবসরে অথবা খুব খুশি হলে, ক্বচিৎ-কদাচিৎ নিজেদেরও নিয়েছি দিয়েছি। ব্যাস্ এটুকুই। দাবির বোঝা বা অধিকারের দেওয়াল ছিল না সে সম্পর্কের মধ্যে। আমাদের মধ্যের সম্পর্কটা ছিল পুরোপুরিই মুক্ত। অথচ বন্ধনও ছিল। ছিল যে, তা এখন সম্পর্কটা চিরদিনের জন্য ছিন্ন হয়ে গেছে বলেই বুঝি।

প্রতি শনিবার রাতে আমরা বাইরে খেতাম। কোনও কোনও দিন আমার একার ফ্ল্যাটে কৃপ রাতও কাটিয়ে যেত। ইউরোপীয়ান, অ্যামেরিকান ছবিতে যেমন দেখেন আর কী! তবে থাকত ও ওর বাবা-মায়ের সঙ্গেই।

ওদের বাড়িতেও গেছি বহুবার। নেমন্তন্নও খেয়েছি। কিন্তু থাকিনি কখনওই।

কৃপ অমন হঠাৎ চলে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে প্রমাণ করে দিয়ে গেল যে, ও ছিল। এবং প্রচণ্ডভাবে ছিল গত চার পাঁচ বছর ধরেই আমার জীবনে। এবং আমাকে ভরে ছিল। ভরে ছিল বলেই শূন্যতাটা এখন এমন করে বাজছে আমাকে। শীতের দিল্লির কনকনে হাওয়া যেমন পোশাকের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে ঢুকে পড়ে শৈত্যর তীব্রতাটা বুঝিয়ে দিয়ে যায়, কৃপর অভাবও আমাকে হঠাৎ-হঠাৎ তেমনি করে শূন্যতার শৈত্যর স্বরূপটি বুঝিয়ে দিচ্ছে।

অফিস থেকে সাতদিন ছুটি নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, কোথাও চলে গিয়ে একা-একা কাটিয়ে আসি ক'টা দিন। আলোয়ারের সারিসকা গেম পার্কে অথবা অন্য কোথাও। কিন্তু বাড়ি বসে আর ঘুমিয়ে আর স্বদেশী আর পশ্চিমী উচ্চাঙ্গ গানের ও বাজনার রেকর্ড শুনে আর কৃপর ছবি-ভরা অ্যালবাম দেখেই কাটিয়ে দিলাম দিনক'টি।

ছুটি নিয়ে হয়তো ভাল করিনি। কৃপকে ভুলব ভেবেছিলাম কিন্তু আমার এই অখণ্ড অবকাশে ওর স্মৃতি আমাকে আরও বেশি করে পেয়ে বসল।

তিনদিনের মাথায় ওর কাজ হল। পাঞ্জাবিরা বলে কিড়িয়া (ক্রিয়া) বা ভোগ। আমি যাইনি।

পরদিন কৃপর বাবা এসেছিলেন আমার কাছে। "বেটে" "বেটে" করে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করলেন। ভারী ভদ্রলোক। একমাত্র কৃতী ছেলে চলে যাওয়ার শোকের চেয়েও তাঁকে যেন আমার দুঃখটাই বেশি করে বেজেছে। ওঁকে লিফট-এর সামনে দাঁড়িয়ে বিদায়-দেওয়ার সময় মনে হচ্ছিল, কৃপকে বিয়ে করে ফেললেই পারতাম। তা হলে স্বামীকে না-হয় হারাতাম কিন্তু অমন একজন শ্বশুর তো পেতাম!

একা মেয়ে মাত্রই জানে, সংসারে ভালবাসা এবং অবলম্বনের কতখানি দাম!

ইতি—
যোজনগন্ধা

boiRboi.net

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
কম্প্যুটার ইনকরপরেটেড
৭২ জনপথ, নিউ দিল্লী
পিন ১১০০০১

দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

কল্যাণীয়াসু যোজনগন্ধা,

তোমার চিঠি পেলাম।

তুমি টলস্টয়-এর "What men live by" বইটি পড়েছ কি? না পড়ে থাকলে, পোড়ো। সান্ত্বনা পাবে।

তুমি বুদ্ধিমতী, সাহসী মেয়ে! তোমাকে আমি আর কী সান্ত্বনা দেব? তা ছাড়া, শোক যখন তেমন গভীর হয় তখন তাকে বইতে হয় একা একাই। শবদেহে কাঁধ ছোঁওয়াতে পারেন অনেকেই কিন্তু শোকের বোঝা, সন্তপ্তকে একাই বইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের নাতির মৃত্যুতে তাঁর মেয়ে মীরাদেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি লিখেছিলেন: "শমী (মানে রবীন্দ্রনাথের ছোট ছেলে) যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে-আসতে দেখলাম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে, কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল।"

কাজ নিয়ে থাকো যোজনগন্ধা। শোক তার নিজের সময়ে নিজেই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জামাতা নগেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগে তাঁকে লিখেছিলেন:

"ঈশ্বর চিত্তদাহর ভিতর দিয়ে তোমার প্রকৃতিকে আধ্যাত্মিক দীপ্তিতে দ্বিগুণ উজ্জ্বল করে প্রকাশ করুন এই আমি প্রার্থনা করি। যিনি দুঃখ দেন তিনিই ভিতরের থেকে সার্থকতা দেবেন। এ সম্বন্ধে আমরা তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। একটি জায়গা আছে যেখানে অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের স্পর্শও পৌঁছয় না—সেখানে একমাত্র অন্তর্যামী আছেন...."

আমরা সাধারণ মানুষ। বড়দের দিকেই তাকাতে হয় আনন্দ অথবা দুঃখ যখন তীব্র হয় তখন তা সহনীয় করতে।

বিয়ে যদি করা মনস্থ করো তবে সময়ের মধ্যেই বিয়ে করে ফেলো। যদি আবার কৃপরই মতো ভাল লাগে কাউকে। অবশ্য সময় তোমার হাতে এখনও অফুরান।

সময়ের মস্ত একটি ভূমিকা আছে আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে। সময়কে সময় অবশ্য দিতে হয়। কিন্তু বেশি সময় দিলেও সময় কখনও কখনও শত্রুতা করে।

ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর "লীভস অফ গ্রাস"-এ আছে:

"অল ট্রুথস ওয়েট ইন অল থিংগস
দে নাইদার হেস্‌সেন দেয়ার ওওন ডেলিভারি নর রেজিস্টি ইট,
দে ডু নট নীড দি অবস্টেরিক
ফর্সেপস অফ দ্যা সার্জন"

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এর চেয়ে বড় সত্য বোধ হয় আর নেই।

তাই, শুধু সত্য-সন্ধানীরাই নয়, পাত্রী ও পাত্র-সন্ধানীর বেলাতেও এই কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য। সময়কে সময় দিয়ে সঠিক সময়ের অপেক্ষাতে থাকতে হবে।

ভালো থেকো। মন খারাপ করে থেকো না।

ইতি—
অর্যমা রায়

শ্রী অর্যমা রায়
'দ্যা জ্যাকারাণ্ডা'
হাজারীবাগ

নিউ দিল্লি

মাস্টারমশায়,

আপনার চিঠি পেয়ে ভাল লাগল।

উত্তর দিতে অনেকই দেরি হয়ে গেল বলে রাগ করবেন না। বুঝতেই পারেন, মন বড়ই বিক্ষিপ্ত ছিল। কোনোকিছুতেই মন বসাতে নিজের উপরে বড়ই জোর খাটাতে হচ্ছে আজকাল।

ওঁরা আপনার চেয়ে বড় অবশ্যই কিন্তু আপনিও তো আমার চেয়ে বড়। আস্তে-আস্তে কৃপর কথা একেবারেই যে ভুলে যাব তাও জানি। সেটা জেনে আরও কষ্ট পাই। মায়ে পুত্রশোক ভোলে, স্ত্রী, স্বামীর শোক ; আর কৃপতো আমার বন্ধুই ছিলমাত্র। সবই জানি। তবুও...

বিয়ে করার কথা এ পর্যন্ত সিরিয়াসলি ভাবিনি কেন জানেন? আমার আদরের সন্তানদের জন্ম দিয়ে, কোন সততার, কোন শ্রীময়, কোন সুস্থ জীবনের পরিবেশে নিক্ষেপ করে যাব তাদের? সব জেনেশুনেও এখন সন্তানের জন্ম দেওয়াটা সত্যিই অত্যন্ত মুখামির্র কাজ। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রত্যেক মানুষই হয়তো এ নিয়ে আজ চিন্তিত।

আমাদের নয়নের মণিরা জন্মাবধি ভেজাল খাদ্য খাবে। স্কুলে ভরতি হতে পারবে না। যদি বা স্কুলে ভরতি হতে পারে, তবেও স্কুল ডিঙিয়ে কলেজে ভরতি হতে পারবে না। যদি বা পারে, তবুও কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরি পাবে না। জীবিকা, জীবনের স্টেপিং স্টোন। জীবিকাহীন জীবনের কথা তো কল্পনাতেও আনা যায় না।

পৃথিবীর আর কোন মহান গণতান্ত্রিক দেশে খাদ্যে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল,

প্রাণ-বাঁচানোর ইঞ্জেকশানে ভেজাল, এমনকি প্রাণঘাতিনী ওষুধেও ভেজাল বলুন ? যা কিছুই চোখ দিয়ে দেখা যায়, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় তার প্রায় সব কিছুতেই ভেজাল ?

আর মনুষ্যত্বের ভেজালের কথা নাই বা বললাম। সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। ধন্য আমরা ! আর ধন্য আমাদের নেতারা !

আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ বলে কিছুই নেই ! সত্যিই কিছু নেই।

সংবিধানে যে সব মৌলিক অধিকারের কথা লেখা আছে, জাতীয় নেতারা যে সব অধিকার জনসাধারণকে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন, এই দিল্লিরই লালকেল্লার মধ্যরাত্রির গগননিনাদি উৎসবে যে সব আবেগভরা আকাশকুসুম আমাদের নেতারা আমাদের দেবেন বলেছিলেন তার কতটুকু আজ অবধি জনগণকে দেওয়া হয়েছে মাস্টারমশায় ?

কী কেন্দ্রে, কী রাজ্যে কী ধরনের মানুষ আমাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা ?

বিরোধী পক্ষই বা কেমন এই গণতন্ত্রে ? ল্যাজ-নাড়া কান-নাড়া জন্তু-জানোয়ারে দেশ চালায় আর বোবা অন্ধ গড্ডালিকার মতো তাদের আমরা প্রতি পাঁচ বছর বাদে বাদে দলে দলে ভোট দিয়ে গদীতে চড়াই। কুকুরের বাচ্চার নেতা কি কখনওই সিংহের বাচ্চা হয় মাস্টারমশাই ? আমাদের, মানে ভোটারদের এই পালকে হিন্দীতে বলে, ভেড়চাল

আপনি কেমন শিক্ষক ? শিক্ষকতা মানে কি শুধুই প্রশ্ন বেছে তার উত্তর তৈরি করে ছাত্র-ছাত্রীকে তা মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষার বেড়া টপকানোর ঠিকাদারি করা ? তাও যদি বুঝতাম, বেড়া টপকানোর পরও তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকত !

কিসের লেখকই বা আপনি ! আপনারা ?

দেশের কি কিছুমাত্রই প্রত্যাশা ছিল না আপনাদের কাছে ? আপনারা ঠিক কোন ধরনের বুদ্ধিজীবী ? দেশ ও দশের শুভাশুভ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন একদল আশ্চর্য মানুষ আপনারা, তা আপনারাই জানেন কি ? এমন বুদ্ধিজীবীদের হাত থেকে এই হতভাগা দেশকে বাঁচাবে কারা ? কি করেন আপনারা মাস্টারমশাই ? ঘুমপাড়ানি বুড়ি এসে কি আপনাদের সকলকেই ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গেল ? ভাবনা-চিন্তার ক্ষমতাসম্পন্ন, সব মানুষদেরই ? এই দেশের ?

জানি না, এই ঘুম কবে ভাঙবে আপনাদের ?

ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম আপনাদের এই স্বার্থমগ্নতার বিচার অবশ্যই করবে কিন্তু। সেদিন দেশ আর দেশ থাকবে না। আমরা আবারও পরাধীন হব। বেশি দেরি নেই। পরাধীনতার বীজ আমাদের চরিত্রেই নিহিত আছে।

ইতি—

যোজনগন্ধা

পুনশ্চ : চিঠিটি বড় ঝাঁঝ-এর হয়ে গেল। মার্জনা করবেন।

boiRboi.net

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
নিউ দিল্লি

'দ্যা জ্যাকারাণ্ডা'
হাজারীবাগ, বিহার

যোজনগন্ধা, কল্যাণীয়াসু,

অনেকদিন পরে তোমাকে লিখছি। কেমন আছ ?

তোমার চিঠি পেয়ে রাগ করিনি। তবে আমার সামান্যতার, আমার অক্ষমতার কারণে লজ্জিত বোধ করেছি।

আমিতো অগ্রগণ্য কেউ নই। যাঁরা প্রথম সারির তাঁদের চেয়ে আমি অনেকই বেশি সচেতন। আমার সব লেখাতেই আমি তোমার যা বক্তব্য তাই বলি। মনোযোগ সহকারে আমার লেখা পড়ে থাকলে তা বুঝে থাকবে। তবে তোমার বক্তব্য বা কোনো রাজনীতিকের বক্তব্য আর লেখকের বক্তব্য তো একরকম নয়। হতে পারে না। লেখকের যা বলার তা বলতে হয় তাঁর লেখার মাধ্যমে। মানে, চরিত্রর মুখ দিয়ে। লেখকতো রাজনীতিক নন। তাই সরাসরি কিছুই করতে পারেন না তিনি।

তবে একথা অবশ্যই ঠিক যে, অনেক মান্যগণ্যদের মধ্যেই এই গুণটি সত্যিই অনুপস্থিত। তাঁরা শুধু নিজেদের মান-যশ-পুরস্কারের সাধনাতেই বুঁদ হয়ে আছেন।

স্বীকার করি যে, এটা লজ্জার !

তোমার সম্ভাবনাকে, স্বদেশ প্রীতিকে বাহবা দিয়েও বলব, উইনস্টন চার্চিল যেমন একজন এম· পি·কে বলেছিলেন : "উ্য শুড নট ইনডাল্‌জ ইন মোর ইনডিগনেশান দ্যান উ্য ক্যান কনটেইন।" নিজের মানসিক স্বাস্থ্যর পক্ষে সেটা বিপজ্জনক।

দূরের বড়া মসজিদের ভোরের আজানের আওয়াজে আজ ঘুম ভেঙে গেল। প্রায় প্রতিদিনই ভাঙে। মানে, যেদিন নেশা-ভাঙ করি না।

প্রথম-প্রথম রাগও যে হত না এমনও নয় ! কলকাতার ছেলে, ভোরের ঘুমটিকেই আসল ঘুম বলে জেনে এসেছি চিরদিন। তবে হাজারীবাগে এসে মৌরসী-পাট্টা গাড়ার পর থেকে এই ঘুম-ভাঙানিয়া আজানে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

কয়েক বছর হল মসজিদে-মসজিদে অ্যামপ্লিফায়ার লেগেছে। তাই শব্দে ঘুম ভেঙেই যায়। যাঁরা ঘুমকাতুরে, তাঁরা নিশ্চয়ই এই বাধ্যতামূলক ঘুম-ভাঙানো ব্যাপারটা পছন্দ করেন না।

এখন প্রতিদিনই আজানের শব্দে জেগে উঠি। দিনটিকে মস্ত লম্বা বলে মনে হয়। তবে রাত ন'টা বাজতে না বাজতেই হাই উঠতে থাকে কিণ্ডারগার্টেনের শিশুদের মতো।

ভোরে দুর্গা মন্দিরেও ঘন্টাধ্বনি হয়। মন্ত্রোচ্চারণও। তবে আজানের মতো অত ভোরে নয় ! তা ছাড়া, এখান থেকে দুর্গা মন্দির বেশ দূরে বলেও সে শব্দ বিছানাতে শুয়ে শুনতেও পাইনা। হাঁটতে-হাঁটতে ওদিকে গেলে, তবেই শুনতে পাই।

আজানের ধ্বনির পরপরই পায়রাদের ডানার ঝটপটানি শোনা যায়। বড়া মসজিদের

কাছের ধূলি ধূসরিত সরু গলির দু' পাশের বাড়ি ও দোকানে জীবন জাগতে থাকে ধীরে ধীরে, যেন পায়রার ডানার পাখসাট্-এই। শিশুর চিকন গলার স্বর কানে আসে। বিহারী মুসলমানদের বাড়ির উঠোনে, গলায় দড়িবাঁধা দাড়িওয়ালা সাদা বকরীর স্বগতোক্তি, কাবাব-পরোটার দোকানের হাণ্ডি-হাতার ঝনঝন, সাইকেলের ও সাইকেল রিকশার ক্রিং ক্রিং আর সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত একটি নাম, রেশমা। আরে রেশমা!

পাশের গলির মুসলমান মহল্লার মধ্যের একটি বিশেষ দোতলা বাড়ির চিক্-ফেলা বারান্দা থেকে আসে ওই স্বর। ওই দিকেই ভিড়-ভাট্টা। আমার 'দ্যা জ্যাকারাণ্ডা'র পর থেকেই ফাঁকা। জঙ্গল, গাছগাছালি। পৃথিবীতে এখনও যে নির্মল নিশ্বাস নেবার জায়গা আছে এইটিই এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হয় এখন।

রেশমা অথবা রেশমার মাকে কোনদিনও চোখে দেখেনি। দেখার কোনও সম্ভাবনাও নেই। ওঁরা বাইরে যখন বেরোন তখন বোরখা পরেই বেরোন। কালো বোরখাবৃতা, ঘোমটা-দেওয়া দুটি তন্বী অবয়বের দিকে চেয়ে কল্পনা করি, কে রেশমা আর কে রেশমার মা!

রেশমাদের বাড়ির দোতলার বারান্দার চিক্-এর আড়ালে খাঁচার ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে হঠাৎ ভেঙে-যাওয়া কাঁচের বাসনের ঝনঝনানির আওয়াজের মতো তীক্ষ্ণ আচম্বিত স্বরে ময়না ডেকে ওঠে। নানা শেখানো বুলি। সে মালকিন্-এর স্বর নকল করে ডাকে, রেশমা! রেশমা!

রেশমা একটু পরেই রিওয়াজ-এ বসবে। রেশমার কণ্ঠস্বর আমার খুবই চেনা। অথচ রেশমার চেহারাই আমার দেখা নেই। খুবই দেখতে ইচ্ছে করে। বিহার-উত্তরপ্রদেশের মুসলমানদের বড় কষ্ট! তাঁদের পছন্দের, ভালোবাসার জনদেরও সহজে দেখতে পান না তাঁরা।

কলকাতাতেও এমনি করে ঘুম ভাঙত। তবে আজানের শব্দে নয়। আমাদের পার্ক সার্কাসের ভাড়া বাড়ির পাশে এক মস্ত বড়লোকের বাগানওয়ালা বাড়ি ছিল। সে বাড়ি পেরিয়ে, একটি পাটকিলে-রঙা দোতলা জরাজীর্ণ বাড়ি দেখা যেত। মানুষজনকেও দেখা যেত। কিন্তু তাঁদের মুখ-চোখ পরিষ্কার দেখতে পেতাম না। দূরও বটে এবং কাছেও অবশ্যই। কতখানি কাছে থাকলে অথবা কতখানি দূরে থাকলে অন্য মানুষের মুখ দেখা যায় তা নিয়ে গবেষণা করতাম। করে, বড়ই উত্তেজিত এবং পরাভূত বোধ করতাম।

সেই দূরের বাড়ি থেকেই একটি নারীকণ্ঠ, ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে-সঙ্গেই চাঁপা! ও চাঁপা! বলে, ডেকে উঠত।

সম্ভবত চাঁপা হয়তো বাড়ির কাজের মেয়েটি।

ভাবতাম আমি। শুয়ে-শুয়ে ভাবতাম।

সে, কি চাঁপা! স্বর্ণচাঁপা? না, কাঠালিচাঁপা? না, কনকচাঁপা? সম্ভবত তার রঙ হয়তো চাপা; যদিও নাম চাঁপা! সে হয়তো সিঁড়ির তলায় বা চিলেকুঠিতে শুয়ে থাকতো রাতের বেলায়।

প্রত্যেক নারী-শরীরকে যে হুলো বেড়ালদের ভয়ে, পায়রা বা অন্য পাখিদেরই মতো রাতে পাহারা দিয়ে রাখতে হয়ই! ধামা-চাপা দিয়ে। অথবা দোর বন্ধ করে। তাই চাঁপাকেও নিশ্চয়ই তেমন করেই রাখা হত।

সেই বাড়ির সুকণ্ঠী মধ্যবয়সী গৃহিণীর সেই প্রাত্যহিক প্রভাতী "চাঁপা" ডাকে ঘুম ভাঙার পরই একদল রামছাগল নিয়ে বাড়ির পেছনের সরু গলি দিয়ে সাদা দাড়িওয়ালা

একজন বিহারী কালো মুসলমান বুড়ো চেক-চেক সবুজ লুঙি পরে হেঁটে যেত। দেখা যেত আমার ঘর থেকে। খাটে শুয়েই।

ছাগলদের গলার ঘন্টা বাজত ঝুমঝুম করে। বড়লোকের বাড়ির পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা সেই নাম-না-জানা বিদেশি ফুলের গাছ থেকে ফিকে বেগুনি আর গোলাপিতে মেশা গন্ধহীন ফুল রাশ রাশ ঝরে পড়ত। শব্দহীন। সাদা রামছাগলদের গায়ের উপরে।

তারপর একসময় ছাগলদের গলার শব্দ এবং সাদা-দাড়ি কালো-রঙা বুড়োর শব্দহীন ছবি, দুই-ই মিলিয়ে যেত।

ঘুম থেকে উঠে মুখ চোখ ধুয়ে এখানে আমি আমার লেখার টেবিলে বসি রোজ। এই আমার প্রভাতী পুজো। ভোরের নমাজ। দিনের এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে, পাখির ডাকের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগোই। এগোতে পারি কিনা জানি না ; তবে চেষ্টা করি।

এই সময়টিতে কোনওদিনই কিছু পড়িনি। শুধুই লিখেছি। ভোরের শিশিরের মতো মনও তখন টাটকা থাকে। এই সময়ে যাই-ই লেখা যায়, তাই-ই টাটকা থাকে স্মৃতিতে বহুদিন। শরতের শিউলির মতো সজীব। পাঠক-পাঠিকার মনেও হয়তো সেই সজীবতা সঞ্চারিত হয়।

ভালো থেকো। উত্তর দিও।

—অর্যমাদা

'দ্যা জ্যাকারাণ্ডা'
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা,
কল্যাণীয়াসু,

কালকে কুসুমভা গেছিলাম।

হাজারীবাগ শহর থেকে যে পথটি ঝাঁটি-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে বনাদাগ হয়ে টুটিলাওয়া, টুটিলাওয়া থেকে সীমারিয়া, সীমারিয়া থেকে বাঘড়া মোড়—সেই পথে। বাসে করে গিয়ে নেমে পড়েছিলাম বনদাগ-এ। তারপর সুলতানা গ্রামকে পাশে রেখে বোকারো নদী পেরিয়ে, খোয়াই পেরিয়ে ; পৌঁছেছিলাম গিয়ে কুসুমভাতে। বেশ কিছুদিন হল কুসুমভাতে গাড়ি বা জীপেও যাওয়া যায়। বনগাঁওয়া হয়ে।

এই কুসুসমভা গ্রামের পটভূমিতে অগ্রজ সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ মশায়-এর একটি ছোট গল্প আছে। এ অঞ্চলের কোনও কোনও বাঙালির কাছে শুনেছি, একসময়ে এই লাইনে তিনি বাসের কণ্ডাক্টর ছিলেন। কথাটি সত্য কি না জানি না। তবে, তাঁকে ঈর্ষা করি।

(একজন লেখকের জীবনে কোনো অভিজ্ঞতাই ফেলা যায়না। সমস্ত অভিজ্ঞতাই হয় ফুল নয় কাঁটা হয়ে ফুটে বেরোয়ই পরে।)

কাল জোর বৃষ্টি হয়েছিল। আজ সকালে বাসটা যখন বনাদাগের স্টপেজে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল টুটিলাওয়ার দিকে, তখন বেলা এগারোটা হবে। গোন্দার বাঁধটাকে নীল পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছিল। এক ঝাঁক সাদা বক সেই নীল পটভূমিতে মালার মতো দুলতে দুলতে উড়ে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে ওখানে দাঁড়িয়ে তারপর মুখ ঘুরিয়ে হাঁটা দিলাম। হাজারীবাগের বর্ষাদিনের শরীরের গন্ধটা বড় বিস্মিত করে আমাকে। এই গন্ধ, এক ধরনের নেশাগ্রস্ততা আনে। এখনও অবশ্য বর্ষা আসেনি। বর্ষার "ভেক" ধরেছে প্রকৃতি। পৃথিবীর আবহাওয়া উলটা-পুলটা হয়ে গেছে। দু'পাশের ঝোপে-ঝাড়ে কালি তিতির ডাকে। বড়-বড় ফলসা-রঙা অথবা লজ্জা-লাল পাণ্ডুকও। কখনও ডাকে আসকল, বটের ; ঘুমপাড়ানী ডাক। অথবা ক্বচিৎ-ময়ূর ; ঘুম-ভাঙানী।

আকাশ এখন মেঘে ঢাকা। অথচ অন্ধকার নেই। উদ্ভাস আছে এক ধরনের, যা বর্ষার নিজস্ব। এই মেঘ-নিঃসৃত আলোর বড় ভাপ। গা জ্বালা করে। চোখ ধেঁধে যায়।

দূর থেকে কুসুমভা গ্রামটা দেখা যাচ্ছিল। মস্ত মহানিম গাছটা। তার সামনে সারি-বাঁধা তিন-চারটি ঘর। ডানদিকে নয়াতালাও। বর্ষার লাল, ঘোলা-জল বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে নবীন বনের ঘেরের মধ্যে। মহানিম গাছটির বাঁয়ে ও পেছনে কুসুমভা গ্রামটি। কাঁচা, সরু পথের দু'পাশে সারি বাঁধা মাটির দেওয়াল আর খাপরার চালের ঘর।

লাল হনুমান-ঝাণ্ডা উড়ছে পত্‌পত্‌ করে।

একটি লাটাখাম্বা উঠছে নামছে।

গ্রামের সীমানাতে মস্ত বড় পিপ্পল গাছের নিচে বনদেওতার থান। তারপর ছাড়া-ছাড়া জঙ্গল। ঝাঁটিজঙ্গল। টোঁওটা, টোঁটর। কেলাউন্দা, পলাশ। পটুসের ঝাড়। গ্রাম পেরিয়ে গেলেও জঙ্গল। প্রথমে পাতলা। তারপরে ঘন। মিলে গেছে করণপুরার টাঁড়ের মধ্যে। কাঠকামচারির জঙ্গলে ; রাজডেরোয়ায়। এই সব নাম শুনলেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আরণ্যক"-এর মহালিখাপুরের পাহাড়, লবটুলিয়া বইহার, সরস্বতী কুণ্ড, রাজা দোবরু পান্না, কুন্তী আর টাঁড়বারোর কথা মনে পড়ে যায় না ?

উত্তর-পুবে গেলে সে জঙ্গল মিশে গেছে পালামৌর জঙ্গলের সঙ্গে। উত্তর-পশ্চিমে, বড়কাগাঁও ; অধুনা কোডারমা জেলা। সোজা পশ্চিমে, রাঁচি। পুব দিকে গেলে চাতরা এবং পালামৌ। কিছুটা গয়া জেলাও।

লাল মাটির ওপরে গজিয়ে-ওঠা ঘন সবুজ চাপ-চাপ ঘাসের মধ্যে-মধ্যে ফিকে-সবুজ ঝাঁটি-জঙ্গলের ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল আসোয়াকে। যেন, রাজা দোবরু পান্নার কাজিন। একটি কাদা-মাখা মোষের পিঠে পাথালি করে বসে বাঁশি বাজাতে-বাজাতে আসছিল আসোয়া। ওর কাঁধের ওপরে বসেছিল ওর পোষা বগুলা। একটি গো-বক। মানকুমারী তার নাম। বকটার একটা পা নেই। কোনও নতুন আনাড়ি শিকারি গত গ্রীষ্মে নয়াতালাও-এর পুরনো বাসিন্দা, ছোট ছোট কালোকোলো ডুবডুবা হাঁসের ঝাঁককে তাক করে ছররা গুলি ফুটিয়েছিল কোনওদিন। ছররারা ডুবডুবা হাঁসেদের (ড্যাবচিক) কেশাগ্রও স্পর্শ করেনি। কিন্তু মানকুমারীর একটি ডানা এবং দুটি পায়েই ছররার দানা লেগে ডানা আর পা দুটি ভেঙে যায়।

আসোয়া অনেক টোটকা-টুটকি করে একটি পা সারিয়ে তোলে। অন্যটি খোঁড়াই

থেকে যায়। ডানাটিও ভাঙাই থাকে। বকের নাম, আসোয়া আদর করে রাখে মানকুমারী।

হাজারীবাগ শহরের পাগমল এলাকায় বহুবছর আগে দশেরার সময়ে যাত্রা হয়েছিল। সেই যাত্রার ধবধবে ফরসা সুন্দরী নায়িকার নাম ছিল মানকুমারী! আসোয়া যেখানে যখনই যায় মানকুমারীকে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যায়।

পোকাটা, মাকড়টা, ব্যাঙাচিটা ধরে ধরে খাওয়ায় আসোয়া তাকে। এতে বড়ই পরনির্ভরতা এসে গেছে মানকুমারীর।

তবে মানকুমারী নিজেও এক পায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে, কখনও-সখনও চরে-বরে খায়। কিন্তু কুসুমভা গ্রামের হাতার মধ্যেই একজোড়া বনবিড়াল সবসময়েই তক্কে-তক্কে থাকে। মানকুমারী উড়তে পারে না বলেই ভয়। অথচ আসোয়ার ভিক্ষাতে বাঁচতেও ওরও সম্মানে লাগে। তাই যখনই মাঠে বা জঙ্গলে যায়, আসোয়া তাকে পিঠ থেকে নামিয়ে, ছেড়ে দেয়। মানকুমারী এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সে যে এখনও মরে যায়নি, হেরে যায়নি ; তা প্রমাণ করে প্রাণপণে।

মানকুমারীর কাছ থেকে অনেক মানুষও আত্মসম্মানের শিক্ষা নিতে পারে।

আসোয়া চুট্টা খাচ্ছিল।

আমাকে পৌঁছতে দেখেই ও মোষের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে একটি অসন গাছের ছায়ায় এক ঝুন্ড বড় কালো পাথরের মধ্যে বসে আমার জন্যেও একটি "চুট্টা" বের করে দিল। তারপর তার বগল-ছেঁড়া খাকি-খদ্দরের জামার পকেট থেকে দেশলাই বের করে আগুন জ্বালতে গেল।

ওর চুট্টাটি চেয়ে নিয়ে তা থেকেই আমার চুট্টা ধরিয়ে নিলাম।

এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে আসোয়া বলল, চললে কোথায় ? আজকাল তো দেখাই নেই।

ভাবছি।

কোন দিকে যাবে ?

ভাবছি।

এই এলে, না ফিরে যাচ্ছ ?

ভাবছি।

আসোয়া একটুক্ষণ আমার মুখে চেয়ে রইল। তারপরই চুপ করে গেল। ও বুঝল যে, ওর প্রশ্ন অথবা আমার উত্তর দুটোর কোনওটাই একার্থবাহী নয়। দ্ব্যর্থক। ও আমাকে ভাল করেই চেনে।

যখনই দেখা হয় আমাদের, আমরা দু'জনে চুপচাপই থাকি। নৈঃশব্দই আমাদের বন্ধুতার সেতু। এই পৃথিবীতে বড় বেশি কথা হয়। অপ্রয়োজনের কথা।

আমি আর আসোয়া দুজনেই পাথরের উপরে বসে চুট্টা খেতে লাগলাম। মেঘের মধ্যে দিয়ে যে তাপ ও ভাপ আসছিল তা বেশ কিছুক্ষণ ধরেই নরম হয়ে আসছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা মরে গেল। এবার ঘনান্ধকারে মাঠ, বন, কুসুমভা বস্তি, নয়াতালাও সবই দেখতে-দেখতে সেই ঝিরঝিরে হাওয়াবাহী নম্রতায় ভরে গেল। এবং তারপরই নামল, বৃষ্টি, বড় বড় ফোঁটাতে। ওর বাইরের রূপ যতই অসহায়, মলিন হয়ে উঠতে লাগল ; ওর ভিতরের রূপ ততই দীপ্তি পেতে লাগল। ওর দু'চোখ চঞ্চল হয়ে উঠল। মানকুমারীর।

আসোয়া বৃষ্টির শব্দের মধ্যে স্বগতোক্তির মতো বলে উঠল, আজকে এখানে থেকেই যাও, বুঝলে। অসময়ের বৃষ্টি। নয়াতালাও-এর পাশের ক্ষেতে বড়কা বড়কা শুয়োর

আসছে রোজ রাতে। আজ তিন-আংগলি-কস্‌কে আমার গাদা-বন্দুক নিয়ে ওখানে পৌঁছে যাব। শুয়োরের মাংস আর ভাত খেয়ে তবেই কাল দুপুরের পরে যেও। তাড়া কি? বাড়িতে তো আর বউ তোমার ভাত বেড়ে বসে থাকবে না?

বললাম, নাঃ। কাজ আছে।

বললাম বটে, অথচ জানি যে, কাজ নেই তেমন কিছুই। পথচেয়ে বসে থাকার মানুষ নেই। ঘর নেই। যাকে ঘর বলে, তেমন। অবশ্য এই ঘুরে-বেড়ানো, বনে-বেড়ানো, এই মনে-বেড়ানোই তো আমার আসল কাজ। ভাবলাম।

এমনই হচ্ছে বেশ কিছুদিন হল। লক্ষ করছি আমি। কোথায় যে যাই, কী যে চাই; কিছুই বুঝতে পারি না। কোনও ব্যাপারেই মনঃসংযোগ করতে পারি না। কী কোনও কাজে, কী কোনও জায়গাতে, কী কোনও পুরুষে, বা নারীতে আদৌ একনিষ্ঠ হতে পারি না। গন্তব্যে পৌঁছে গেলেই মনে হয়, এখানে তো চাইনি আসতে। তাই পৌঁছেই আবার রওয়ানা হই, কোথায় যাব, যেতে চাই, তা না জেনেই।

কোনও বিশেষ কাজ করব বলে, কোনও বিশেষ ছবি আঁকব বলে, কোনও বিশেষ গান গাইব বলে মনস্থ করে সারারাত বিছানাতে ছটফটিয়ে মরে ভোরের আলো ফুটলে সেই কাজটিতেই বা ছবিটিতেই বা গানটিতেই মনকে কিছুতেই বসাতে পারি না। সদ্য ভাঁটি-দেওয়া পলিমাটির উপরে সে সুন্দরবনের স্যালাম্যান্ডারের মতো কেবলই ছটফট করে।

যে-নারীকে কাছে পেলে মনে করি এ-জীবনের মতো উত্তীর্ণ হব; তাকে একবার চুমু খেয়েই অথবা তার স্তনসন্ধিতে নাক রেখেই মনে হয়; কই? এ তো সে নয়! যে আমার মনের ভেতরে থাকে, না, না এ সে নয়!

সে নয়!

আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে দিয়ে আসোয়া আবারও বলে, থেকে যাও।

যেখানে আদর পাই, ভালোবাসা পাই, যত্ন পাই, যেখানে প্রাধান্য পাই; ঠিক সেখান থেকেই, ভালোবাসার, সম্মানের, আঙুল থেকে আঙুল ছাড়িয়ে নিয়েই আমি অন্যত্র দৌড়ে যাই। অন্যত্র পৌঁছেই আবারও দৌড়োই।

ফিরে যখন যাই, সেই নিশ্চিত উষ্ণতার দিকে, তখন পৌঁছে দেখি, আমার আগেই সেখানে পৌছে গেছে শীতের হিমেল রাত, রণপায়ে চড়ে।

দিন ফেলে রাতে দৌড়োই; রাত ফেলে দিনে। শরীর ফেলে মনে দৌড়োই; মন ফেলে শরীরে। সব পাই, আবার কিছুমাত্রও পাইনা।

নিজের ভেতর থেকে ধড়াস-ধড়াস বুকে বাইরে দৌড়ে আসি আমি কোনও নারীকণ্ঠর পুলকভরা ডাক শুনে। মন বলে, সে, সে, সে, সে এসেছে। এতদিন পরে এসেছে সে! অথচ এসেই দেখি যে, কেউই নেই। এক আকাশ আলোর মধ্যে অসহায় আমি দাঁড়িয়ে দেখি, আমার বাহিরমনের চবুতরায় ছড়িয়ে-পড়া আমার নানা রঙের আশাগুলিকেই কাশীর বিশ্বনাথ-গলির ধাড়ি কোনও ষাঁড়ের মতোই হতাশা যেন কুড়িয়ে-মুড়িয়ে খাচ্ছে। ঘুরে ঘুরে; পাথর খুঁড়ে-খুঁড়ে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মনের গহন থেকে কে যেন আমাকে শিহর তুলে আবার ভিতর পানে ডাকে। বলে, ভিতরে আয়; ভিতরে আয়।

বাইরের আলো থেকে ভিতরে দৌড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে দেখি, ছমছমে অন্ধকার। গভীর অতলান্ত কালো জল। বরিশালের মাধবপাশা দিঘির মতো।

গাছ চিনি, পাখি চিনি, ফুল চিনি, প্রজাপতি চিনি, নারী চিনি; শুধু চিনিনা নিজেকেই

বড়ই কষ্ট পাই। দূর থেকে কাছে ; শীতে, গ্রীষ্মে, বসন্তে অবিরত দৌড়ে বেড়াই। যেখানেই যাই, যাকেই চাই, যা কিছুই চাই ; তাই পাই না। সবখানেই দেখি, নাই।

নাই, নাই ; নাই !

আসোয়া বলে, থেকে যাও বাবু, শুয়োরের মাংস আর লাল চালের ভাত আর মহুয়ার মদ। থেকে যাও।

মানকুমারী চেয়ে থাকে আমার মুখের পানে।

আমি ছুলোয়া-শিকারে তাড়া-খাওয়া, ভয়-পাওয়া শম্বরেরই মতো ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ে ধড়াস-ফরাস-করা বুকের মধ্য থেকে বলি, চললাম।

আসোয়া হাসে।

বলে, এসেছিলে কেন ? এসেই যদি চলে যাবে ?

জানি না।

আমি নিজেকে ব্যঙ্গ করে, কটূক্তি করে, নিজের মুখে নিজে থুথু দিয়ে বলে উঠি, জানি না। সত্যিই জানি না।

যাবে কোথায় ? এখন ?

ভাবছি।

বনাদাগ হয়ে বাসে যাবে ? না পাকদণ্ডী দিয়ে হেঁটে গিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ? কানহারি পাহাড়ের নিচে গিয়ে উঠবে ? নাকি, বনগাঁওয়া হয়ে যাবে ?

ভাবছি।

বলেই, বনগন্ধী ঘনঘোর বৃষ্টির মধ্যে আমি এমন মায়ের মতো গাছটির নিবিড় আশ্রয় ছেড়ে, আসোয়ার বন্ধুতার উষ্ণতা ছেড়ে ; বেরিয়ে পড়ি। তারপর ভিজতে-ভিজতে, প্রথমে গ্রামের ক্ষেতগুলির আলের উপরে-উপরে পথ হাঁটি। পরে, ঝাঁটি-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। তারও পরে, বৃষ্টির তুমুল ঝরঝরানির আর হুটুর-পুটুরের মধ্যে আমি হেঁটে যাই। আমার দু'পাশে কালি-তিতিরের কান্না বয়ে যায় পাহাড়ী ঝোরারই মতো। তিতির-কান্নার মাঠ পেরিয়ে আমি হাঁটি। নিজেকে চেনার জন্যে। নিজেকে জানার জন্যে। শীতের প্রথম রোদে শুকোতে-দেওয়া কাঁথার মতো উলটিয়ে-পালটিয়ে দেখার জন্যেই আমি হাঁটি। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে-ভিজতে নিজেকে নিরন্তর নানা কথা শুধোতে শুধোতে আমি হাঁটি।

মাথার উপর দিয়ে বৃষ্টির সাদা ঘোড়াকে কর্কশ সবুজ চাবুক মেরে এক ঝাঁক টিয়া উড়ে যায় কোণাকুণি গোন্দা-বাঁধের দিকে। আমার মস্তিষ্কর গেঁথে তোলা ভাবনার টায়রাকে টিয়ারা ছিঁড়ে দিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চলে যায়।

লাল খোওয়াই-এর মধ্যে-মধ্যে, ঝাঁটি-জঙ্গলের ফাঁকে-ফাঁকে, বনপথের বাঁকে-বাঁকে নিজেকে সবে-খোলস-ছাড়া চিকন সর্পিণীর মতো আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে আমি হাঁটি। আমার সঙ্গে আমার পায়ে-পায়ে হাঁটে চিরন্তন মানুষ। চিরন্তন জিজ্ঞাসা ভিজতে থাকে অঝোর বৃষ্টিতে। আমারই সঙ্গে।

বুঝেছো ? যোজনগন্ধী।

ইতি—

অর্যমা রায়

পুনশ্চ—এই চিঠিটা বড় বেশি কাব্যিক হয়ে গেল। তাই না ?

হলে হোক।

"তুমি কেমন আছ? আমি ভাল আছি। এখানে বৃষ্টি হচ্ছে" এইরকম চিঠিই তো অধিকাংশ মানুষে লেখে। আমি না-হয় একটু অন্যরকমই লিখলাম।

আমি তো "অন্য" নই, "আমি" যে আমিই! আমি অন্য। এবং অনন্য।

ইতি—অ

অর্যমা রায় নিউ দিল্লি
দ্যা জ্যাকারাণ্ডা/হাজারীবাগ

মাস্টারমশায়, শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার কবিতার মতো চিঠিটি পেলাম। আপনি যে লেখক, আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নন, সে কথা, ওই চিঠিটি পড়ে সহজেই বোঝা যায়।

আমাকে এমন চিঠি কেউই লেখেনি কোনওদিনও। আমাকে এমন চিঠিই লিখবেন। খুশি হব খুব। প্রতিটি চিঠিই যত্ন করে রেখে দেব। চিঠি যে পায়, সেইতো চিঠির মালিক হয়ে যায়! তাই না?

জানেন, ধীরে-ধীরে কৃপকে প্রায় ভুলতেই বসেছি। ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। ও কিন্তু এইকথাই বলত। হেসে বলত, প্রত্যেক নববিবাহিত দম্পতিই মধুচন্দ্রিমার সময়ে গদগদ গলায় বলে: "তুমি কিন্তু মরে যেও না সোনা। তুমি মরে গেলে আমি আর বাঁচব না।"

বলেই, হাসতে হাসতেই বলত, বুলশিট!

যদিও বিয়ে হয়নি আমাদের তবু কথাটা যে সত্যি, আজ তা বুঝি।

সকলেই বেঁচে ঠিকই থাকে। কোনও মৃত্যুই অন্য কারো জীবনকে তেমন বিধস্ত করে না বলেই মনে হয়। একমাত্র আর্থিক কারণ ছাড়া। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয়, বৃদ্ধবয়সে স্ত্রী বা স্বামী বিয়োগ। ধীরে ধীরে সব শোকই মানুষে ভুলে যায়ই। কারণ, না ভুললে চলে না। পৃথিবী তার নিজের নিয়মেই চলতে থাকে। নিরবধিকাল।

কৃপ অবশ্য বলত, নিজেকে ভালোবাসো, নিজের জীবনকে, নিজের পারিপার্শ্বিককে ভালোবাসো। তুমি আছ, তাই পৃথিবী আছে। তোমাকে ঘিরেই তোমার পৃথিবী চারধারে আবর্তিত হচ্ছে। তোমার পথই সায়নপথ। তুমি যেদিন মরে যাবে আমি কিন্তু বারো ঘন্টাও তোমাকে মনে রাখব না। অন্য কেউই রাখবে না। পৃথিবী চলবে নিজের মনে। যার-যার পৃথিবী ঘুরবে তাকে তাকেই কেন্দ্র করে। এটাই ঘটনা। পৃথিবীর সময় নেই, পেছনে চেয়ে, পা ছড়িয়ে বসে কাঁদার।

আসলে কৃপ নিজের সম্বন্ধে এত বেশি নিঃসংশয় ছিল যে, ও নিজেও যে একদিন মরতে পারে এমন কথা বোধহয় দুঃস্বপ্নেও ভাবত না।

আজকে ও নেই। আমি কিন্তু সত্যি-সত্যিই ওকে প্রায় ভুলতেই বসেছি। সেটা ভাল কী মন্দ তা জানি না। আজকালকার পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষেরই অবকাশ এতই কম,

বসে ভাবা বা শোক করার সময়ের এতটাই অভাব যে ; পিছন ফিরে তাকাবার ফুরসত সত্যিই কারোই নেই।

একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছি যে, এতবছর পরে আপনার সঙ্গে এমন হঠাৎ যোগাযোগটা কেন হল আমার ? এবং হল যদি, তাও কৃপর চলে যাওয়ার সময়েই ! কোনো অদৃশ্য শক্তিই কি কৃপর অভাব পূর্ণ করতে আপনাকে পাঠালেন আমার কাছে, আমার এই মানসিক অবস্থাতে ? এই দেখা হওয়াকে, ঐ সময়ে ; কী বলব ?

আমার ডেস্টিনী ?

জানিনা।

আপনি কি কিছু মনে করলেন আমার এলোমেলো ভাবনার কারণে ?

ইতি—
যোজনগন্ধা

শ্রী অর্যমা রায়
দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

নিউ দিল্লি

মাস্টারমশাই,

লেখক অর্যমা রায়ের আমি একজন মনোযোগী পাঠিকা। বহু বছর থেকেই। কিন্তু আগেই বলেছি যে সেই অর্যমা রায়ই যে আমার পুরনো মাস্টারমশাই তা তো জানা ছিল না !

কোন সূত্রে ও জেনেছিল জানি না কিন্তু আমার বন্ধু ইবা (ইলবিলাই) প্রথমে এই আবিষ্কারের কথা আমাকে জানায়।

ইলবিলাকে কি আপনার মনে আছে ? না-থাকারই কথা।

আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। আগে জানতে চাইওনি। আমার জীবন সম্বন্ধেও আপনাকে জানাতে চাইনি। কিন্তু এখন কেন জানি না মনে হচ্ছে যে, যে উজ্জ্বল-চোখের তরুণটিকে আমি জানতাম বহু বছর আগে, নীল-রঙা ফুল-হাতা শার্ট আর খাকি-ট্রাউজার পরা ; চোখে চশমা, হাতে বন্ধুর কাছ থেকে ধার-করা বিদেশি কবির বইয়ের পেপারব্যাক, কণ্ঠার হাড়-উঁচু, সবসময়েই ক্লান্ত ; সেই অর্যমা রায়ের বিবর্তনটা এত বছরে কী প্রকার হয়েছে তা একটু জানা দরকার। চিঠিতে যতটুকু জানা যায়।

আমার মা কিন্তু আপনাকে খুবই পছন্দ করতেন। বলতেন, ভারী ভদ্র ছেলে। মেয়েদের সঙ্গে এমন ব্যবহার ভাল ঘরের ছেলে না হলে করতে জানতই না !

বেচারী মা ! মা যদি জানতেন, ভাল ঘরের ছেলেরা অধিকাংশই কীরকম হয় !

দিদিও আপনাকে খুবই পছন্দ করত। কিন্তু আপনি আপনার কালো ফ্রেমের চশমার মধ্যে দিয়ে দিদির দিকে এমনভাবে চাইতেন যে, তাতে মনে হত আমার সুন্দরী চপলা দিদিতে এবং ধাপার মাঠের ফুলকপিতে যেন কিছুমাত্রই তফাত নেই।

আজকে বলতে বাধা নেই যে, দিদি প্রচণ্ডই আহত হত। আপনার ট্যুনিফর্ম ; নীল শার্টের কারণে আপনার নাম দিয়েছিল দিদি, "নীলবর্ণ-শৃগাল"। তাতেই তার মনের ঝালটা মিটত কিছুটা। আপনি যে ধূর্ত, শৃগাল নামকরণের পেছনে তেমন ইঙ্গিতও ছিল।

আমার কিন্তু আপনাকে কোনওদিনই ধূর্ত বলে মনে হয়নি।

আমাদের অল্পবয়সে বাঙালি মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদ কী ছিল জানেন ? না, অম্লাধিক্য নয়, প্রোটিন-ডেফিসিয়েন্সী নয় ; পুশিং-ড্যাশিংয়ের অভাবও নয়। না, এসব কিছুই নয়। সবচেয়ে বড় বিপদ, অপাত্রে, অসময়ে প্রেম। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, উত্তমকুমার প্রমুখরা মিলে তাঁদের বিভিন্নমুখী সম্মিলিত হরকৎ-এ বাংলার মেয়েদের বোধহয় চিরদিনের সর্বনাশ করে গেছেন। আর কোনও কিছু করা হোক চাই না হোক "প্রেম" তাদের প্রত্যেকেরই একটা করতেই হবে। কচি বয়সেই।

আমার দিদিও ওই প্রেম করেই মরল।

শৌনকদা মানুষ অবশ্য খারাপ ছিল না। তবে পুরুষ নয়। সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতার ফালতু পৌরুষের কথা বলছি না। যে-পৌরুষ জীবনে পুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করে, প্রতিযোগিতাতে সফল করে ; সেই পৌরুষের কথাই বলছি।

চোখের সামনে দিদিকে দেখে তথাকথিত প্রেম এবং বিয়ের উপরে আমার ভক্তি চটকে গেছিল। ওদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একজনও পড়াশুনোতে ভাল হয়নি। অন্য কিছুতেও নয়। টিভির পোকা। জন্ম-পাকা।

শৌনকদা, সরকারী অফিসের কর্মী হিসেবে নিজের কর্তব্যটি না করে সাম্প্রতিককালের পশ্চিমবঙ্গীয় মহান ঐতিহ্যানুযায়ী "গণতান্ত্রিক" আন্দোলন করে। ধর্মঘট। বসা-ধর্মঘট। শোওয়া-ধর্মঘট। খেয়ে-ধর্মঘট। না-খেয়ে-ধর্মঘট। গো-স্লো। বক্তৃতা। গুঁড়িয়ে-দেওয়া। পুড়িয়ে-দেওয়া। মুড়িয়ে-দেওয়া। এইসব নিয়েই চমৎকার আছে।

দিল্লিতে যা শুনি এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের নানাবিধ উন্নতির যা বর্ণনা পাই, তাতে মনে হয় যে, সেখানে আজকে কাজের সংস্কৃতি ছাড়া অন্য সব রকমের সংস্কৃতিই অত্যন্ত প্রবল। এইটেই যে সবচেয়ে বড় অপসংস্কৃতি, কাজ না-করার সংস্কৃতি, ফাঁকি-মারার সংস্কৃতি, মিথ্যাচারের, অনিয়মানুবর্তিতার সংস্কৃতি, আত্মসম্মানজ্ঞানহীনতার সংস্কৃতি ; তা কে বলবে ! আর বললেই বা শুনছে কে ?

শৌনকদাও এই সংস্কৃতিতেই পুরোপুরি "সামিল" হয়ে গেছে। ভাব দেখে মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গের সব নেতারাই বোধহয় কূপমণ্ডুক। পৃথিবী তো দূরস্থান ; ভারতবর্ষের অন্য কোথায় কী হচ্ছে বা হয়েছে, তার খবরটুকু রাখাও তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন না।

লজ্জা রাখার জায়গা নেই মাস্টারমাশায়। আমাদের থুথু ফেলে ডুবে মরাই উচিত। আমার কাজে প্রচুর ঘুরতে হয় সারা দেশেই। এবং বিদেশেও। নিজের রাজ্যকে ভালোবাসি বলেই অন্য রাজ্যে গিয়ে নিজের রাজ্যর সঙ্গে তুলনা করি আর চোখ জলে ভরে আসে।

আবারও বলি, আপনাদের কলকাতা তো ইন্টেলেকচুয়ালদেরই শহর। পথের কুকুর আর ভিখিরির মতোই তো ওই শহরে ইন্টেলেকচুয়ালদের ছড়াছড়ি। পথ চলা যায় না তাঁদের ভীড়ে) কই ? তাঁরা সব কোথায় ? রাজ্যের এই প্রেক্ষিতে ডান-বাম-ঈশান-নৈঋত

মতাবলম্বী নির্বিশেষের ইন্টেলেকচুয়ালদের কি করার কিছুই ছিল না ?

"অবনী বাড়ি আছো"-র মতোই, বলতে ইচ্ছে করে, "পশ্চিমবাংলার আঁতেল, বাড়ি আছো ?"

জেগে আছ হে ?

বেঁচে আছ কি ?

ইতি—
যোজনগন্ধা

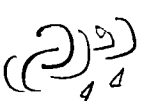

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
নিউ দিল্লি

"দ্যা জ্যাকারাণ্ডা"
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা, কল্যাণীয়াসু,

আমি এখন আর কলকাতার কেউই নই।

তার দোষ অথবা গুণের ভাগীদারও নই। কলকাতা আমাকে ত্যাগ করেছে। আমিও কলকাতাকে।

বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, গত পাঁচ বছর যাইওনি। আজকাল গেলে নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। এত ধুলো, ধুঁয়ো, ঈর্ষা ; দ্বেষ। নির্গুণ বামনদের চাঁদ হাতে নিয়ে এমন লোফালুফি খেলা আর দেখতে ভাল লাগে না।

সত্যি বলছি !

কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে কলকাতার ইনটেলেকচুয়ালসরা কেন যে নীরব তা তাঁরাই বলতে পারবেন। নিজেকে ইনটেলেকচুয়াল বলে মনে করি না। মাথার কাজ করলেই কেউ ইনটেলেকচুয়াল হন না। আমি অতি সাধারণ। জনগণেরই একজন বলে মনে করি নিজেকে। আমার কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শও নেই। তবে দেশকে, আমার জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গকেও ভালবাসি বলেই দুঃখ পাই তার বর্তমান অবস্থা দেখে তোমারই মতো। কিন্তু আজকের দিনের রাজনীতি যে-স্তরে এসে পৌঁছেছে আর রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁদের অধিকাংশদের মানও এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ; কী যে করণীয় তাও তো বুঝে উঠতে পারি না।

আসলে সত্যকথনকে, অপ্রিয়কথনকে আজকালকার নন্-কমিটাল্ ইনটেলেকচুয়ালসরা এতই ভয় পান যে, তাঁদের অজানিতেই তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট ও নষ্ট হয়ে যাচ্ছেন। যাচ্ছেন না বলে, বলা ভাল ; গেছেন।

যা হবার তা হোক।

তবে রাষ্ট্রের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের মাথাব্যথা নেই, বা থাকবে না এ-কথাটাও তোমারই মতো আমারও যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না। কারণ, প্রত্যেক দায়িত্বশীল নাগরিকেরই রাষ্ট্র সম্বন্ধে মাথাব্যথা থাকা উচিত বলেই মনে হয়। রাষ্ট্র তো আর আকাশ থেকে পড়ে না।

ব্যক্তিরা মিলেই তো রাষ্ট্রের পত্তন করেন। ব্যক্তির দায়িত্ব না থাকলে সেই ব্যক্তিসমষ্টির প্রতি রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব না-থাকা আশ্চর্যর কিছু নয়।

নিজের মতের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে ভীত হওয়ার কারণও নেই কোনও সৎ বুদ্ধিজীবীরই! কিন্তু আজকাল যূথবদ্ধতারই দিন। যে-লেখক বা কবি বা শিল্পী একা থাকেন অথবা একা থাকতে চান, কেননা বিশেষ দল বা গোষ্ঠী বা কোনো ক্ষমতাশালী যূথপতির তাঁবেদারি করতে তিনি গররাজি থাকেন ; তাঁর বিরুদ্ধে অবিরত এমন জঘন্য সব প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ ক্রিয়াকাণ্ড এবং প্রচার চলতে থাকে, এমন চরিত্র-হননের চক্রান্ত ; যা পাঠক-পাঠিকাদের অথবা অন্য কারো পক্ষেই বাইরে থেকে বোঝাটা একেবারেই অসম্ভব। নানারকম চক্রান্তর শিকার সেই একা কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-গায়ককে হতে হয়ই! তার উপরে তিনি যদি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তবেতো কথাই নেই! অভিমন্যুর মতোই অবস্থা করা হয় তাঁর।

তোমার কি মনে হয় যোজনগন্ধা, শুধুমাত্র নির্জনতাপ্রিয় বলেই আমি কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছি এখানে ?

একজন লেখকের একা থাকাই ভাল, না দলবদ্ধতাই তাঁর জীবনের মূল কথা হওয়া ভালো, তাঁর পক্ষে সরকারের তাঁবেদারি করা ভাল, না বিরুদ্ধাচারণ করা ভাল ; এ সব নিয়ে দ্বিমত অবশ্যই আছে। চিরদিনই ছিল।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মত ছিল :

"আ রাইটার ইজ অ্যান আউটলায়ার, লাইক আ জীপসী... ইফ হি ইজ আ গুড রাইটার হি উইল নেভার লাইক আ গভর্নমেন্ট হি লিভস আন্ডার। হিজ হ্যান্ডস শুড বী এগেইনস্ট ইট... হি ক্যান বী ক্লাস-কনসাস ওনলি ইফ হিজ ট্যালেন্ট ইজ লিমিটেড। ইফ হি হ্যাজ এনাফ ট্যালেন্ট, ওল ক্লাসেস আর হিজ প্রভিন্স। হি টেকস ফ্রম ওল অ্যান্ড হোয়াট হি গিভস ইজ এভরীবডিজ প্রপার্টি... আ ট্রু ওয়ার্ক অফ আর্ট এনডিওরস ফর এভার ; নো ম্যাটার হোয়াট ইট'স পলিটিকস।"

জর্জ বার্নার্ড শ'ও একবার জন গলসওয়ার্দিকে লিখেছিলেন :

"লিটারারী মেন শুড নেভার অ্যাসোসিয়েট উইথ ওয়ান অ্যানাদার, নট ওনলি বিকজ অফ দেয়ার ক্লিকস অ্যান্ড হেট্রেডস অ্যান্ড এনভীজ বাট বিকজ দেয়ার মাইন্ডস ইনব্রিড অ্যান্ড প্রডুস অ্যাবরশানস্।"

অনেকেই এই মতে বিশ্বাস করেন না হয়তো। হয়তো এই মত অভ্রান্তও নয়। কিন্তু আমি করি যোজনগন্ধা।

যে-কোনও সৃজনশীল মানুষের জীবনই মূলত একা হওয়াই উচিত যে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। রাজনীতিক বা চলচ্চিত্রাভিনেতা বা যাত্রার নায়ক আর লেখক এক মানসিক এবং সামাজিক সমতার মানুষ নন। হওয়াটা কখনও উচিতও নয়।

শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় "নির্জনতা আমাদের কখনও খালি হাতে ফেরায় না।" প্রত্যেক প্রকৃত লেখকেরই জীবন নির্জন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নির্জনতা, অন্তর্মুখীনতা যে সৃষ্টিশীলতার মস্ত বড় আশ্রয়।

তুমি কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ। যে-শহর, যে-রাজ্য, আত্মহননের পথই বেছে নিয়েছে স্বেচ্ছাতে তাকে তুমি বা আমি বাঁচাই এমন সাধ্য কী!

ভালো থেকো।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি—
অর্যমা

পুনশ্চ :

তবে বেশি ভাবাভাবি ভাল কিনা সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

আনাতোল ফ্রাঁসে, ওঁর ''Gsell'' বইয়ে লিখেছিলেন, "থট ইজ আ ফ্রাইটফুল থিং। ...দা ট্রুথস ডিসকাভারড বাই দ্যা ইনটেলেক্ট রিমেইন স্টেরাইল... ইট ইজ ফলি টু ট্রাই টু মুভ মাসেস অফ মেন বাই রিজন। প্রেজুডিসেস, লাইক ল'জ অ্যান্ড গভর্নমেন্টস, ক্যান বী ডেস্ট্রয়েড ওনলি বাই ফোর্সেস ব্লাইন্ড, ডেফ, ব্লো, অ্যান্ড ইরেজিস্টিবল্..."

(প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্কর গবেষণাগারে যা কিছুরই উন্মেষ হয় তার সামান্যই সমসময়ের সাধারণ্যের উপকারে আসে। এটাই ঘটনা। তা, যতই দুঃখবহ হোক।)

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
নিউ দিল্লি

"দ্যা জ্যাকারাণ্ডা"
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা,

তোমাকে মতিভাবীর কথা বলেছিলাম। কমলশেখর আর শ্রীমতী ভাবীর ছেলেমেয়ে নেই। বিয়ে হয়েছে পনেরো বছর। এখনও সময় যায়নি যদিও। ফুদিবাবু বলেছেন, কলকাতায় গিয়ে ডাঃ ঘনশ্যাম কুণ্ডুকে দেখাতে। তিনি নাকি ধন্বন্তরি। আরেকজন ডাক্তারের কথা তিনি প্রায়ই বলেন, সার্জন ডঃ দীপক মুখার্জি। ইউরোলজিস্ট। এতো প্রশংসা শুনি তাঁর যে, ঠিক করেছি কলকাতা গেলে দেখা করে আসব।

এক বর্ষার দুপুরে শ্রীমতী ভাবী, তাঁরই বাড়িতে আমাকে সত্যিই বাধ্য করেছিলেন বলতে গেলে ; তাঁকে বড়-আদর করতে। সে বড় লজ্জার কথা। আমি এখনও বড় অপরাধী বোধ করি নিজেকে, সে কথা মনে হলেই।

অমন পুরস্কার পেতে চাইলে বা পেয়ে খুশি হতে পারলে, প্রতিদিনই হলুদ অথবা কালো বহু গোলাপের শরীরের পুরস্কারেই পুরস্কৃত হতে পারার যোগ্যতা হয়তো আমার ছিল। কিন্তু এসবকে যে "পুরস্কার" বলে আদৌ মেনে নিতে পারিনি। এইসব প্রাপ্তির মধ্যে যে, ক্ষণিক জয়ের বোধ থাকে তা অত্যন্তই ছেলেমানুষী। অথবা, মূর্খর বাহাদুরি-প্রবণতার।

তবে একথাও ঠিক যে, একটা ব্যাপারের জন্যে শ্রীমতী ভাবীরই মতো আরো দু'একজন নারীকে দুঃখ দিতে পারিনি কারণ কার বুকের কোন কোণে যে কোন শূন্যতা থাকে, সেই শূন্যতা যে কার চোখের চাওয়ায়, মুখের হাসিতে বা শরীরের পরশে পূর্ণ হয় বা পুণ্য হয় ; তা তো আগে থাকতে জানা যায় না। তা ছাড়া "না" বলা হয়তো সহজ কিন্তু সেই "না" অন্য নরম মনে যে হতাশা বা বেদনা বা কান্নার ঝড় তোলে, তা নরম অনুভূতিপ্রবণ মানুষ

হিসেবে যে-কোনো মানুষকেই বড় ব্যথিতও করে। এই অভিঘাতের জন্যেই মনকে মনের উত্তর দিতে হয় ; শরীরকে শরীরের। তবে আমি এ পর্যন্ত "ব্যবহৃত" হয়েছি কয়েকবার কিন্তু কখনওই আপ্লুত বোধ করিনি। মনে হয় যে, শুধুমাত্র মনের পরিতৃপ্তিই পূর্ণ করে মানুষকে। আমরাতো জানোয়ার নই ! শরীরটা অনুগামী। শরীর যে সম্পর্কে অগ্রগামী ভূমিকা নেয় সে সম্পর্ক মরশুমী ফুলেরই মতো। ঝরে যাবার জন্যেই জন্মায়।

বর্তমান প্রজন্মে, যখন অধিকাংশ নারী ও পুরুষকেই কাজ করতে হয় প্রয়োজন অথবা আত্মসম্মানের কারণেও, পরকীয়ার সমস্যাটা শুধু আছে যে তাই নয়, তীব্রতরই হচ্ছে প্রতিদিন। তবে তার প্রকৃতি অবশ্যই পালটে গেছে। কর্মরত স্বামী এবং স্ত্রী দু'জনেরই অপোজিট সেক্স-এর বহু সুন্দর ও ভাল মানুষের সঙ্গে প্রতিদিনই দেখাশোনা, ওঠাবসা করতে হয়। তাতে জীবনটা সুখময় যেমন হয় তেমন অনবধানে অত্যন্ত বিপজ্জনকও হয়ে ওঠে। কে জানে ! এই বিপদটা, বিপদের মধ্যে প্রতিনিয়ত বাস করাটাই বোধহয় আধুনিকতা। প্রত্যেক নারী ও পুরুষই হয়তো অভ্যস্ত হয়ে যাবেন অথবা ইতিমধ্যেই গেছেন এই জীবনে।

যোজনগন্ধা, আমি চাই যে, আমি যা বা যেমন, তুমি আমাকে ঠিক তেমন করেই জানো। তুমি প্রাপ্তবয়স্কা। আমার সঙ্গে সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখবে কি না তা তুমিই স্থির করবে।

বঙ্গভূমে "চরিত্র" শব্দটার অর্থ বড়ই গোলমেলে। শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও খুব কম মানুষেই এই শব্দটির যথার্থ তাৎপর্য বোঝেন। তাই, চিন্তা।

রেলগাড়ির কামরাতে একটি গোলাপি-রঙা সিল্কের শাড়িতে বিকেলের স্থলপদ্মর মতো কোমল, রক্তাভ একটি মেয়ে হঠাৎ দেখা দিয়ে, আমার জীবনের কম্পাসের কাঁটাটাকেই যেন রাতারাতি ঘুরিয়ে দিয়েছে। এতবছর পরে তোমাকে দেখে আমি বুঝতে পেরেছি, শ্রীমতী ভাবীর মধ্যে খুঁজে কী পাইনি ! বুঝেছি যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সব নারীই কমবেশি সমান হলেও তাঁরা প্রত্যেকেই প্রচণ্ডভাবে আলাদা। একক, স্বতন্ত্র ; তাঁদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব। আলাদা তাঁরা তাঁদের গায়ের গন্ধ থেকে স্তনবৃন্তের রঙে ; উরুমূলের গড়ন থেকে কানের লতির গড়নে ; বুদ্ধিমত্তা থেকে সংস্কৃতির দীপ্তিতে।

আলাদা বলেই তো বেঁচে থেকে আজও সুখ।

নইলে, জীবন বড় ভয়াবহ কারাগার হত !

ইতি—
অর্যমা

boiRboi.net

শ্রী অর্যমা রায়
দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

মাস্টারমশাই,

আপনি যখন আমাকে প্রাপ্তবয়স্কা এবং প্রাপ্তমনস্কের সম্মান দিয়েইছেন তখন আমিও আপনার সঙ্গে সব ব্যাপারেই খোলাখুলি আলোচনা করতে কোনো দ্বিধা বোধ করি না ; করব না। করাটা হাস্যকরও। মেঘে মেঘে আমারও তো বেলা কম হলো না।

আমার মনে হয়েছে যে, মতিভাবীর ব্যাপারটা নিয়ে আপনি যেন কোনো অপরাধবোধে ভুগছেন।

মতিভাবীকে আপনার মাধ্যমে যতটুকু বুঝেছি তাতে এ কথাই জোর গলায় বলতে পারি যে, এই সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুমাত্র পাপ বোধ আপনার না থাকলেই তা স্বাভাবিকতা হবে।

মতিভাবীতো অসহায়ই! আপনিও অসহায়। দু'রকমের অসহায়তাতে আপনারা দু'জনে জর্জরিত।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল এবং মিসেস রাসেল দু'জনেই এই মতই পোষণ করতেন যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের যে মূল ভিত্তি তাতে পরকীয়া অনেক সময়েই দু'পক্ষেরই অনুমোদন করা উচিত। তাতে বিবাহিত সম্পর্ক দীপ্তিই পায় ; ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার চেয়ে। মনের সম্পর্ক যদি অটুট থাকে তবে বিবাহ-বহির্ভূত ক্বচিৎ শারীরিক সম্পর্কে কিছুমাত্র যায় আসে না। মতিভাবীর ক্ষেত্রে তো স্বামীর সঙ্গে মনের সম্পর্ক নেই বলেই মনে হয়। স্বামীর কাছে যা পাননা তা অন্যের কাছ থেকে ক্বচিৎ কদাচিৎ যদি পান তবে তাঁকে দোষারোপ করার কিছুই নেই। আপনাকে তো দোষারোপ করার প্রশ্নই ওঠে না।

ফরাসী লেখক তালেরাঁর একটি উক্তি আমি বারবার পড়ি "ম্যারেজ অ্যাজ হ্যাপিনেস ? হোয়েন এভরিওয়ান ইজ বাই নেচার পলিগ্যামাস, অ্যাণ্ড উওম্যান মোর সো দ্যান ম্যান" ? ("deux mauvasis humeurs pendant le Jour, et deux mauvasis odeurs pendant la nuit")

এই চিরপুরাতন অথচ চিরনতুন মানবিক সম্পর্কের এবং এই সম্পর্ক ঘিরে যা মিথ্যাচার চলে আসছে তা নিয়ে লেখেন না কেন ? লিখুন।

জার্মান পণ্ডিত দার্শনিক কাউন্ট হারমান কেসারলিংও এমনই বলেছেন যে "পুরুষ ও নারী দু'জনেই ব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্বর ধরনে একেবারেই আলাদা, 'ইনকমপ্যাটিবল্' (বাংলা সঠিক প্রতিশব্দ কি হবে ?) এবং মূলতঃ একা, দু'জনে দু'জনকে বোঝার ক্ষমতাতে চিরদিনই অপারগ সেখানে বিয়ে কি করে দু'জনকে বেঁধে রাখবে তা অজানা।"

আমি এইসব নিয়ে অনেকই ভাবাভাবি করেছি। নিজের চোখে, কাছ থেকে অগণ্য

বিবাহিত দম্পতিকেও দেখেছি। এবং দেখেছি বলেই, বিয়ের উপরে আমার আস্থা নেই।

কেসারলিং এও বলেছিলেন : "অ্যান্ড দ্যা মোর হাইলি ডেভালাপড অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইজ, দ্যা মোর ডিফারেনসিয়েটেড অ্যান্ড সেনসিটিভ হি ইজ, দ্যা হার্ডার বিকামস ফর হিম টু ফাইন্ড হ্যাপিনেস ইন ম্যারেজ।"

আমি জানি না, আপনি উইল ডুরান্ট-এর লেখা পড়েছেন কিনা বা পড়লেও ভাল লাগে কিনা আপনার ? ওঁর একটি বই "দ্যা টেন গ্রেট থিংকারস", পারলে পড়বেন। এবং আর একটি বই "দ্যা প্লেজারস অফ ফিলসফি"।

নিজে লেখক হয়েও, ব্যতিক্রমী মানুষ হয়েও আপনার যদি মতিভাবীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কর অপরাধ-বোধ থাকে তবে তো আমারও কৃপকে নিয়ে তা থাকার কথা ! কিন্তু আমার তা আদৌ নেই। বরং একধরনের গভীর আনন্দমেশা চাপা গর্ব আছে।

আমরা তো ভিক্টোরিয়ান যুগের বাসিন্দা নই মাস্টারমশাই !

ভালো থাকবেন।

ইতি—
যোজনগন্ধা

দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা, কল্যাণীয়াসু,

তুমি যে এতো পড়াশুনো করো তা জেনে ভাল লাগল।

আমা-হেন মূর্খ যার শিক্ষক ছিলাম সেই ছাত্রীই যে ভেতরে ভেতরে এতখানি এগিয়ে গেছে তার শিক্ষককে যে অনেকেই পিছনে ফেলে, তা জেনে সত্যিই ভারী ভাল লাগে।

সংসারে কিছু সম্পর্ক থাকে যেখানে আপাতদৃষ্টিতে যার ভূমিকা অগ্রগণ্য হবার কথা, তিনি হেরে গেলেই তাঁর শ্লাঘার কারণ ঘটে। হিন্দীতে বলে না ? "গুরু গুড়, চেলা চিনি" ? পিতা যদি পুত্রর কাছে হারেন, শিক্ষক যদি ছাত্রর কাছে ; তবে পিতা এবং শিক্ষক দুজনেরই ন্যায্য কারণে গর্বই হয়।

তুমি অবশ্য আমার শিক্ষাতে এতসব শেখোনি ! ফরাসী কোথায় শিখলে ? কলকাতার 'আলিয়াস ফ্রাঁসে'তে না অন্য কোথাও ? নাকি দিল্লিতেই শিখেছ ?

আসলে, কোনো শিক্ষক বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই কোনো শিক্ষার্থী বা ছাত্রকে শেখাতে পারেন না, যদি না, সেই শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখে নেবার ইচ্ছার ; জিগীষার তীব্রতা থাকে। মনে হয় যে, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা অদৃশ্য In-Built গ্রাহক-যন্ত্র থাকে। প্রেরক যন্ত্র যাই পাঠাক না কেন তার গ্রাহক যন্ত্র যদি তেমন উৎসুক, উন্মুখ, উৎকর্ণ না হয় তবে সে কিছুই শিখতে পারে না। ভাল শিক্ষক বা ভাল স্কুলই যদি

শেষ কথা হতো তবে "হ্যারো," "ইটন" বা "ডুন স্কুল" বা অন্যান্য অগণ্য পাবলিক স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই জীবনে হারিয়ে যেত না। ঐ সব স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই আসে কোটিপতির বাড়ি থেকে এবং তারা অনেকেই সেই সব ভাল প্রতিষ্ঠান থেকেও কিছুমাত্রই নিতে পারে না। যে সব ছেলে মেয়ে জীবনে প্রকৃতই "হওয়ার মতো কিছু" হয়, তাদের সিংহভাগই আসে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে এবং তাদের ঐ সব বাঘা বাঘা স্কুলে পড়ার সামর্থ্য ও সুযোগ সুবিধা প্রায় কখনই থাকে না। সাধারণ ঘরে, নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মানোটা দোষের নয়। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলতেন, কে কোথা থেকে এসেছেন তাতে যায় আসে না কিছুমাত্র, সমাজ-সংসারে কে কোথায় গিয়ে পৌঁছন সেটাই আসল কথা।

ব্যক্তিই হচ্ছে শেষ কথা। ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিত্ব না থাকলে, বিশেষ গুণাবলি না থাকলে, বড় হবার, দশজনের একজন হয়ে ওঠার সাধনা এবং জেদ না থাকলে, কোনো ছেলেমেয়ের কোটিপতি বাবা-মায়েরাই তাদের মানুষ করে তুলতে পারেন না। তা যদি সম্ভব হতো, তাহলে জীবনের সবক্ষেত্রেই শুধুমাত্র বিত্তবানদের ছেলেমেয়েরাই উঠে আসতো ওপরে। "বড় হওয়া" বলতে আমি প্রকৃত বড় হওয়ার কথাই বলছি, টাকা রোজগারের কথা, বাবার বা পিতামহর কোম্পানির ডিরেক্টর বা ব্যবসার অংশীদার হওয়ার কথা বলছি না। টাকা রোজগার করতে এসে সে সব হতে আদৌ কোনো বিশেষ যোগ্যতা তো না থাকলেও দিব্যি চলে যায়!

তুমি লেখালেখির কথা বলেছ, পড়ার কথাও। পড়ে, ভাল লাগল। তবে কথাটা কী জানো? বেশি পড়লে, লেখা যায় না ভাল। তাছাড়া লেখালেখি বড় শারীরিক পরিশ্রমেরও, বিশেষতঃ বাংলাতে; যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন। লিখতে, আজকাল সত্যিই গায়ে জ্বর আসে। একটি দুটি চিঠি যাঁরা লেখেন তাঁরাও জানেন, হাতে লেখার কষ্ট। আর দিনে পনেরো-কুড়িটি চিঠির উত্তর দেওয়ার পরে লিখতে আর ইচ্ছেই করে না!

তাছাড়া, যতই পড়া যায় ততই প্রতিদিন এই ধারনাই বদ্ধমূল হতে থাকে যে কীই বা লেখার আছে আর! আমি যা লিখব তাতো বিশ্বসাহিত্যে অনেকেই দিন আগে কোনো না কোনো দেশের লেখক আমার চেয়ে অনেকেই সুন্দর ভাবে লিখে গেছেন! তখনই অজানিতে মনে এক গভীর হীনমন্যতা জন্মায়। লিখতে আদৌ আর ইচ্ছে করে না।

লিখলে, এমন লেখাই লিখতে ইচ্ছে করে, যা থেকে যাবে। মৌন অক্ষরগুলি ইতিহাসের পথ বেয়ে ঝরে যাবে নিঃশব্দ ঝর্নারই মতো, যুগযুগান্তধরে অনাগত দিনের উজ্জ্বল, বুদ্ধিসর্বস্ব পাঠকদের মনে মনে। কিন্তু তেমন লেখার ক্ষমতা যে আমার মতো সামান্য সাধারণ লেখকের নেই!

তুমি আঁদ্রে মালরোর "দ্যা ভয়েসেস অফ সাইলেন্স" বইটি কি পড়েছ? না পড়ে থাকলে, অবশ্যই পড়বে। আরও একটি বই পড়বে, আঁদ্রে মোরোর "দ্যা আর্ট অফ লিভিং"। একজন সমালোচক যে বইকে বলেছিলেন: "দ্যা বাইবেল অফ রাইট সিভিলিজেশন।"

দর্শনের বইও অবশ্যই পড়তে হবে। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পর বই; তাদের সমালোচনার বই-এরই সঙ্গে। ইতিহাসও। বলব, তুমি একেকজনকে ধরে ধরে তাঁদের major লেখাগুলি পড়ে ফেল। দ্যা নাইট ইজ ভেরি ইয়াং, সো ইজ দ্যা লাইফ—তোমার জীবন। আমার জীবন তো মধ্যগগনে। প্রতিদিনই দূরের ছায়ারা দীর্ঘতর হচ্ছে।

বেলাশেষের পাখিদের অস্ফুট কলকাকলী কানে আসছে তিতির-কান্নার মাঠ পেরিয়ে। মধ্যমান তালে এখন নিচু স্কেলে গান গাইবার সময়।

জীবনের সব দৌড়, সব প্রতিযোগিতা থেকেই ছুটি নিয়েছি। এখন যেটুকু লিখি, আঁকি, বা গাই, তাও চানঘরে ; তার সবটুকুই নিজের, শুধুমাত্র নিজেরই ভালোলাগার জন্যে। নিজের কোনো সৃষ্টিকেই, (সরি, "সৃষ্টি" কথাটা আমার কোনো কিছুর বেলাতেই প্রযোজ্য নয়। প্রকৃত বড় মানুষদের বেলাতেই এই শব্দটি ব্যবহার করা চলে) আর "পণ্য" করে অন্যর বিচারের জন্যে ঝলমলে শো-কেস-এও সাজিয়ে দেবার ইচ্ছে নেই। যত শত্রুতা তো সাফল্যরই জন্যে। বিফল মানুষ শত্রুহীন। প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ালেই, যাঁরা আমাকে সহ্য করতে পারেন না, তাঁরা খুবই খুশি হবেন ; শান্তি পাবেন। ঈশ্বর তাঁদের প্রত্যেকেরই মঙ্গল করুন। ঔদার্য দিন তাঁদের। মনুষ্যত্বের অহমিকায় তাঁদের সমৃদ্ধ করুন। আমার ঈশ্বর তাঁদের সব ক্ষুদ্রতাই, সব ইতরামিই যেন ক্ষমা করে দেন ; এই প্রার্থনা।

কনফ্যুসিয়াস, প্লেটো, অ্যারিস্টোটল, জন স্টুয়ার্ট মিল, থমাস অ্যাকুইনাস, কোপারনিকাস, স্পিনোজা, থোরো, বেকন, নিউটন, ভলটেয়ার, কান্ট, হেগেল, ডারউইন, আরও কত নাম করব ; এঁদের প্রত্যেককেই ভাল করে পড়ো। যদি পড়ে, না থাকো। পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে সেই সব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাদের জীবনী পড়ো, তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম সম্বন্ধে কী তাঁরা বলতে চেয়েছেন তা জানো। জানলে, জানবে যে সব ধর্মই সমান। জানবে যে ভারতবর্ষর "জ্ঞান" পৃথিবীর "গভীরতম" জ্ঞান।

এবার চিঠি শেষ করি। এ চিঠি সত্যিই মাস্টারমশাই-এরই মতো হয়ে গেল।

পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যও পড়ো, কারণ "Literature makes a man"। Man অর্থে এখানে womanও।

লিখতে আর ইচ্ছে করে না, ছবি আঁকতেও বা গান গাইতেও, যখনই আর্দ্রে মালরোর এই পংক্তিগুলি পড়ি ("দ্যা ভয়েসেস অফ সাইলেন্স"-এ আছে) :

"...ইন দ্যাট হাউস অফ শ্যাডোজ হোয়্যার রেমব্রান্ডট স্টিল প্লাইজ হিজ ব্রাশ, ওল দ্যা ইলাস্ট্রিয়াস শেডস, ফ্রম দ্যা আর্টিস্টস অফ দ্যা ক্যাভার্নিস অনওয়ার্ডস, ফলো ইচ মুভমেন্ট অফ দ্যা ট্রেমব্লিং হ্যান্ড দ্যাট ইজ ড্রাফটিং ফর দেম আ নিউ লিজ অফ সারভাইভাল—অর অফ স্লিপ।

অ্যান্ড দ্যাট হ্যান্ড হুজ ওয়েভারিংস ইন দ্যা গ্লুম আর ওয়াচড বাই আইজ ইম্মেমোরিয়াল ইজ ভাইব্রান্ট উইথ ওয়ান অফ দ্যা লফটিয়েস্ট অফ দ্যা সিক্রেট ইয়েট কমপেলিং টেস্টিমনিজ ট্যু দ্যা পাওয়ার অ্যান্ড গ্লোরী অফ বীইং ম্যান।"

যা লিখলাম, যা আঁকলাম, যা গাইলাম ; তা যদি "To be watched by eyes immemorial is vibrant with one of the loftiest of the secret yet compelling testimonies to the power and glory of being man" নাই হয়ে উঠতে পারলো, যুগযুগান্তধরে নীরব প্রশংসাতে তা যদি সমাদৃত নাইই হল ; তাহলে এই সব সারস্বতসাধনাতে নিজেকে নিয়োজিত রেখে লাভই বা কি। তার চেয়ে চার্বাকের দর্শনে, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ"-এ বিশ্বাস করে, মৌজ মেরে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়াই শ্রেয় ছিল। "খাও, পিও, মৌজ করো।"

আমি একটা হতভাগ্য অপদার্থ। না হলো ভোগ, না হলো ত্যাগ। ত্যাগ বা সন্ন্যাসাবস্থা আসবে কি করে ? ভোগইতো সম্পূর্ণ হলো না এখনও ! বাসনা-কামনা এখনও

তো নির্মূল হয়নি। আর অমরত্বতো দূর-অস্ত্ ! অনেকেই বড় ব্যাপার।

অমরত্বের পেছনে দৌড়ে, মরীচিকার পেছনে দৌড়ে, এমন সুন্দর একটিমাত্র জীবনকে মাটিও করলাম এবং কিছুমাত্র পাওয়াও হলো না, যা-পাওয়ার জন্যে এই 'track'-এ দৌড় শুরু করেছিলাম একদিন।

এই পাওয়া দিশি-বিদেশি প্রাইজ নয়, জয়মালা নয় ; এক অন্যমালা, অদৃশ্য এই মালার খোঁজ সকলেই যে রাখেন এমনও নয় !

ভালো থেকো।

—অর্যমাদা

অর্যমা রায় নিউ দিল্লি
দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

অর্যমাদা,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগল।

সত্যিই আপনি যথার্থ মাস্টারমশাই আমার। কিন্তু আর "আপনি" বলতে পারছি না।

কলকাতাতে আমাদের পাশের বাড়িতে একটি দম্পতি থাকতেন। এখনও হয়তো আছেন। দু'জনেই বিয়ের আগে একটি কালচারাল অর্গানাইজেশানের সভ্য ছিলেন। প্রোগ্রাম করতে নর্ডিক কান্ট্রিজ-এ গেছিলেন ওঁরা দু'জনেই সেই দলের সঙ্গে। শিখা বৌদি, বিশ্বম্ভরদাকে "খোকনদা (ডাকনাম) এবং "আপনি" বলতেন। পরে দু'জনের বিয়ে হয়। ভালোবেসে। শিখাবৌদি কিন্তু এখনও বিশ্বম্ভরদাকে "খোকনদা' এবং "আপনিই" বলেন। বিয়ে হয়েছে পনেরো বছর। আর আমিতো আপনাকে আপনি বলছি প্রায় পঁচিশ বছর। অতএব আপনি কর্তন বড় সহজ নয়।

প্রায় রোজ আপনার চিঠি পেতে পেতে চিঠি পাওয়াটা এখন সুন্দর এক অভ্যেসেই দাঁড়িয়ে গেছে। চিঠি পাওয়া আর চিঠি লেখাই যেন আমার একমাত্র কাজ। প্রতিদিনই সকালে-বিকেলে ডাক বাক্স দেখাটা অবশ্যকরণীয় কর্তব্য হয়ে গেছে। সুখী, আমার কাজের মেয়েটি ; আমাকে নিয়ে হাসে। হাসলে হাসুক। নিজেকে লুকিয়ে রাখতে শিখিনি যে ! I always want to be true to myself।

ভণ্ডামি, ভান এসব আমার দু'চোখের বিষ।

কেমন আছেন ? জানাবেন ফেরৎ ডাকে।

—যোজনগন্ধা

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
নিউ দিল্লি

দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা, কল্যাণীয়াসু,

অগণ্য শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এখন পর্যন্ত চমৎকার বেঁচে আছি।

ভবিষ্যতের কথা বলতে পারি না।

শত্রুতা না থাকলে, বেঁচে থেকে বোধহয় কোনো মজাও নেই। যে-কোনো মানুষকেই শুধুমাত্র শত্রুরাই Greater efforts-এর দিকে ধাবিত করতে বাধ্য করে। শত্রুদের শত্রুতা না থাকলে, বুদ্ধি-মেধা-যোগ্যতা সবকিছুই ভোঁতা হয়ে যায় যে; যে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। শত্রুতা, ব্লেসিংগস ইন ডিসগাইজ।

জ্বর হয়েছিলো। দিনতিনেক ভুগে উঠলাম।

তুমি লিখেছ "True to yourself" হতে চাও। অতি উত্তম কথা। আমিও চেষ্টা করে দেখেছি। কিন্তু সেই সাধু প্রচেষ্টার পথে বাধা অনেকই। প্রমথ চৌধুরীর কথা ধার করে (ধারই বা বলব কেন, তাতো আমার নিজেরও কথা!) বলতে পারি যে, "পৃথিবীতে True to oneself হবার অন্যতম বিপদ হচ্ছে অন্য লোকে ভুল বোঝে। "বহুরূপী" মনে করে। একটিমাত্র পোজ নিয়ে পাঁচজনের চোখের সামনে দিনের পর দিন বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এবং তেমন করে সেই একই 'পোজ' ধরে রাখতে পারলেই সে মানুষের চরিত্রটা অন্য দশজনের চোখে সহজ সরল ঠেকে। সংসার অতীব বিচিত্র জায়গা। এখানে সরল বলে নাম কিনতে যদি চাও তাহলে নিতান্ত বক্র বা অসরল হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।"*

সংসারে কিছু কিছু myth যে কী করে এতোদিন ধরে বেঁচে আছে তা কে জানে! কেউই কি সেইসব mythকে explode করতে এগিয়ে আসবে না?

বিমলদা (বিমল কর) বহুবছর আগে 'ভুবনেশ্বরী' বলে একটি উপন্যাস অথবা বড় গল্প লিখেছিলেন। কোন কাগজে যে লিখেছিলেন তাও আর মনে নেই এতদিন পরে। কাগজের সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষরা যাই মনে করুন না কেন, লেখার মতো লেখা হলে লেখাটিই মনে গেঁথে থাকে। কোন কাগজে তা প্রকাশিত হয়েছিল সে কথা কেউই মনে রাখেন না। 'ভুবনেশ্বরী' বাংলা সাহিত্যে Explosion Of Myth-এর একটি আদর্শ উদাহরণ। চমৎকার গল্পটি। পারলে, খোঁজ করে পড়ে নিও।

True to Oneself এরই মতো আরও একটি Myth হচ্ছে 'অজাতশত্রু' শব্দটি। কোনো Positive মানুষ আদৌ কী করে "অজাতশত্রু" হতে পারেন তা আমার সুবুদ্ধি এবং দুর্বুদ্ধিরও বাইরে। অন্যের ভাল করলে যদি অজাতশত্রু হওয়া যায় তাহলে করুণাসাগর

*ইন্দিরা দেবীকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর চিঠি থেকে। "দেশ"-এ পড়েছিলাম।

বিদ্যাসাগরের মতো মানুষেরও "কৃতজ্ঞ" বাঙালীজাতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে পরম বিরক্তির সঙ্গে কার্মাটারে গিয়ে সরল সাওঁতালদের গ্রামে শেষ জীবন কাটাতে হতো না। জাতে যে আমরা বাঙালী এই কথাটা ভুলে গেলে চলবে কেন! এমন গুণের জাত যে ভূ-ভারতে আর দুটি নেই!

যে-মানুষ ভাল, মন্দ লোকে তাকে চিরদিনই শত্রু বলে জানবে। যে-মানুষ মন্দ, ভাল লোকে তাকে শত্রু বলে জানবেন। ধনীকে নিরানব্বুই ভাগ নির্ধন শত্রুজ্ঞানে দেখবে কোনো ব্যক্তিগত বিরূপতা ছাড়াই। নেহাতই ঈর্ষার কারণে। কারণ, আমরা বাঙালী। যিনি ন্যায্য কথা বলবেন, তাঁকে, যাঁরা অন্যায়কারী, খল, ধূর্ত, ধান্দাবাজ তাঁরা মন্দ বলবেনই। বিদ্যাসাগরের মতো মানুষকেও বলতে হয়েছিল, "ও আমার নিন্দা কেন করে? আমি তো ওর কোনো উপকার করিনি!"

তাই আমার বক্তব্য যে, অজাতশত্রু শব্দটির মতো Mythও এই রঙ্গভরা বঙ্গভূমে এতোদিন বেঁচে রইল কি ভাবে তা সত্যিই পরম আশ্চর্যের কথা।

ভাল থেকো। —অর্যমাদা

দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা,
কল্যাণীয়াসু,

আমার অগোছাল স্বভাবের জন্যে কারো চিঠিই জমিয়ে রাখা হয় না। নিন্দা বা প্রশংসার কোনো কিছুই জমিয়ে রাখি না। পেপার-কাটিং; রিভ্যু।

আমার বাবা বলতেন, "নেভার লুক ব্যাক ইন লাইফ।"

তোমাকে কি গপুবাবুর কথা বলেছি আগে? সম্ভবত বলেছি। চিঠি রাখিনা তাই পরম্পরা ঠিক থাকেনা আজকাল। না, তেমন বয়স হয়নি, যার জন্যে এমন হবে। এটা হয়, চিন্তভাবনার এলোমেলোমির জন্যেই। চিত্ত সবসময়েই বিক্ষিপ্ত থাকে বলে। কেন থাকে, সে প্রশ্ন কোরো না। কারণ, তার জবাব আমার নিজের কাছেও নেই।

যাই হোক, গপুবাবু গতকাল ভোরে আমাকে প্রায় জবরদস্তি করেই গাড়িতে তুলে নিয়ে "পিতিজ"-এ গেছিলেন। যে 'ইটখোরি-পিতিজ'এ আমি ছাত্রাবস্থাতেও গেছিলাম একবার আমার প্রাণের বন্ধু, আরুণির সঙ্গে। জানিনা, তার কথাও তোমাকে আগে বলেছি কী না। কাতরাস্-এর কলিয়ারীর মালিক ফুদিবাবুর পিতিজ-এর এককালীন "গুটিং-লজ"-এর কথা হয়তো কখনও লিখেছি তোমাকে। মাত্র কদিন আগেই তাঁর বাংলোর বাউন্ডারী-ওয়াল হাতিতে লাথি মেরে ভেঙে দিয়েছে।

আমারও অনেক কিছুকেই লাথি মেরে ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে। যদি হাতির মতো

জোর থাকতো আমার পায়েরও, তবে দিতামও তাই।

তবে কাল আমরা ওখানে উঠিনি। উঠেছিলাম বন-বাংলোতে।

ছোট্ট পাহাড়ী নদী। এই গ্রীষ্মে এখন জল প্রায় নেই বললেই চলে। ইটখোরি হয়ে যে পথটা পিতিজ-এ এসেছে সেই পথেরই পাশে নদীর ওপরেই ছোট্ট বাংলোটি। গপুবাবুর ভগ্নীপতি অমুবাবু এসেছেন ভিলাই থেকে। তাই তাঁকে নিয়ে একটু হুল্লোড় করবার জন্যে সারা দিন কাটানোর অভিপ্রায়েই গপুবাবুর যাওয়া।

তুমি বলতে পারোই যে, উদ্ভট শখ বটে! এই গরমে, যখন লু চলছে বিহার থেকে শুরু করে সারা উত্তর ভারতে তখন পাগল না হলে কি কেউ বাড়ির আরাম ছেড়ে দিন কাটাতে জঙ্গলে যায়?

তুমি তা বলতে পারো বটে। তাছাড়া পাগল যে নই তেমন সার্টিফিকেটও পেশ করতে পারব না। কিন্তু আমি না বললেও, গপুবাবু অন্য কথা বলবেন। জঙ্গলই ওঁর প্রাণ।

উনি বলেন, প্রেমিকাকে শুধু কি সাজগোজ করা অবস্থাতেই দেখবে সবসময়? তিনি যখন রান্নাঘরে গরমে ঘেমেনেয়ে আপনার জন্যে ভালোবাসার রান্না রাঁধেন তখন সেই এলোচুলের, ঘামেভেজা, অবিন্যস্ত তাঁকে দেখবেন না একবারটিও? তা কী হয়? তেমন ভালোবাসাকে ভালোবাসাই বলে না। সে ভালোবাসা, বিলাসী ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার ভান ধরা পড়ে যায়।

আমি কিন্তু ওঁর সঙ্গে একমত নই। একেকজনের ভালোবাসার রকম একেকরকম। তাছাড়া একই মানুষের বিভিন্ন জনকে ভালোবাসার রকমও আলাদা আলাদা হতে বাধ্য। দু'জন পুরুষে-পুরুষে, নারীতে-নারীতে, বা পুরুষে-নারীতে বা নারীতে-পুরুষে যে সম্পর্কই গড়ে উঠুক না কেন, তার গড়ন ও চলন ভিন্ন হতে বাধ্য। আমরা ভাগ্যিস মানুষ! তাই এই বিভিন্নতা। এর জন্যে লজ্জিত না হয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই গর্বিতই তো হওয়া উচিত।

আবারও ওয়াল্ট হুইটম্যানের কথা ধার করতে হয়,

"আই অ্যাম লার্জ, আই কনটেইন মালটিচ্যুডস।"

আমারই মতো তোমার এবং প্রত্যেক অন্য মানুষের মধ্যেই অনেক মানুষ, মালটিচ্যুডস-এর বাস।

এতো গেল মানুষের ভালোবাসার কথা! কিন্তু প্রকৃতিকে ভালোবাসার বেলাতে সে নিয়ম কিন্তু একেবারেই খাটে না। প্রকৃতি নিজেই নিজের নিয়ম।

গপুবাবু এবং তাঁর সাকরেদরা যখন যথারীতি সকালের নাস্তার তদারকিতে, লাঞ্চের প্রস্তুতিতে নদীর জলে ঠাণ্ডা বালির তলায় বিয়ারের বোতল পুঁতে রাখতে ব্যস্ত তখন আমি এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

গ্রীষ্মবনের গায়ে একধরনের জ্বালা থাকে। সেই জ্বালাই, কেন্দ্রীভূত, শিলীভূত হয়ে শিলাজতুর জন্ম দেয়, যে জ্বালা প্রশমিত হওয়ার, স্নিগ্ধতায় দীপিত হওয়ার নীরব সাধনায় দুর্মর গ্রীষ্মবনের দুর্মর হাওয়াতে রুখু মাটির উপরে বয়ে-যাওয়া শুকনো পাতার ঝরঝরানির মধ্যে দীর্ঘ অপেক্ষায় তাপসীরই মতো অপেক্ষামানা থাকে। প্রকৃতিকে ভালো করে অনুধাবন করলে তিতিক্ষা ও ধৈর্যের এমন শিক্ষা হয় যে, তা আর কিছুর মাধ্যমেই হতে পারে না। এই যে প্রস্তরীভূত প্রস্তর-উদ্গীরিত জ্বালা, তার গন্ধ দিনে একরকম আবার সন্ধ্যের ঠিক আগে আগে আরেকরকম। আবার সন্ধ্যের পরে সম্পূর্ণই অন্যরকম। নক্ষত্র জ্যোৎস্নায় এই দাবদাহর বনে দু'চোখ তেমন করে মেলে চাইলে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণকরে

কেন্দ্রীভূত করে দিলে বোঝা যায় যে, কোনো অদৃশ্যলোক থেকে নেমে আসা অনামা এক সুগন্ধ এবং স্নিগ্ধতা চোখ ও নাকের জ্বলুনিকে মুছে দিয়ে ভরে দেয়।

গপুবাবুর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এই গ্রীষ্মশেষের প্রথম বর্ষণের সকালে যখন দিকে দিকে গাছে গাছে রাতারাতি তৃণাঙ্কুরের সবুজের তুমুল সমারোহর আভাস জেগে ওঠে, প্রকৃতির অজানা "মন্ত্র পড়ে চুমু খেয়ে দেওয়ার" তাৎক্ষণিক প্রভাবে, তখন আমাদের চেয়ে সবদিক দিয়ে যাঁরা বড় তাঁদের কথাই বারেবারে মনের কানে নিক্কণ তোলে।

"গ্রেট ইজ লাইফ.... অ্যান্ড রিয়্যাল অ্যাণ্ড মীস্টিক্যাল...হোয়েনেভার অ্যান্ড হুএভার, গ্রেট ইজ ডেথ...শিওর অ্যাজ লাইফ হোল্ডস ওল পার্টস টুগেদার, ডেথ হোল্ডস ওল পার্টস টুগেদার ;

শিওর অ্যাজ দ্যা স্টারস রিটার্ন এগেইন আফটার দে মার্জ ইন দ্যা লাইট, ডেথ ইজ গ্রেট অ্যাজ লাইফ।"

ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতা।

"রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।" রবীন্দ্রনাথের।

কী আশ্চর্য মিল!

হুইটম্যান লিখেছেন :

"হোয়াট বিহেভড ওয়েল ইন দ্যা পাস্ট
অর বিহেভস ওয়েল টুডে ইজ নট আ ওয়ান্ডার,
দ্যা ওয়ান্ডার ইজ ওলওয়েজ অ্যান্ড ওলওয়েজ হাউ দেয়ার
ক্যান বী আ মীন ম্যান অর অ্যান ইন্‌ফিডেল।"

মানুষ নীচ কী করে হয়? কী করে ঈশ্বরে-অবিশ্বাসী হয় মানুষ? এই ছিল তাঁর তীব্র বিস্ময় আর ঘৃণার সঙ্গে ছুঁড়ে দেওয়া প্রশ্ন। এই পৃথিবীর সব মানুষেরই কাছে!

এই গ্রীষ্মবনের মনের কামনা, এই আপাত-দাবদাহ, এই আপাত-মৃত্যু, এই জ্বালাই প্রমাণ করে যে, স্নিগ্ধতা, জীবন এবং প্রলেপই শেষ কথা। বুঝলে যোজনগন্ধা, আমার কেবলই মনে হয় যে, একটা সময় দ্রুতগতিতে টর্নেডোর মতো ধেয়ে আসছে আজকের এই ভোগী, বিজ্ঞানসর্বস্ব, গর্বিত, অপ্রয়োজনের-প্রয়োজনের ভারে চাপা-পড়া মানুষের দিকে, যে-সময় প্রমাণ করবে যে, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে প্রকৃতি আর ঈশ্বরের প্রেম ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই। আমাদের এই সময়ের মানুষের মান ও যশের সব কামনা, সব ওপর-চালাকির, সাফল্যের ও সুখের সব ভ্রান্ত সংজ্ঞাকে চুরমার করে দিয়ে যাবে সেই সময়। তবে তখন মানুষের জীবনের এবং জীবিকার সুযোগ নিয়ে, তার যাথার্থ্য নিয়ে ভাববার মতো মানুষ একজনও বেঁচে থাকবেন কি না জানিনা।

আমার একার ভাবনা হু হু করে বয়ে যাওয়া 'লু'-এর মধ্যে, উর্ধ্ববাহু, মৌন সন্ন্যাসীদের মতো অগণ্য এবং এলোমেলো সার সার গাছেদের মধ্যে, চতুর্দিকে ঝরাপাতার ঝর্ণার ঝরঝরানির মধ্যে, হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত, উৎসারিত মরাপাতার ঘূর্ণির মধ্যে দাঁড়িয়ে আর বেশিক্ষণ চালানো গেল না। আসোয়া এসে বললো, গপুবাবু তলব করেছেন। বাখরখানি রোটি তো পটনা থেকেই আনানো হয়েছেই, কলিজা-ভাজাও তৈরি। নাস্তা করবেন বলে অন্যরা আমার অপেক্ষাতে আছেন, এবারে যেতে হবে।

একেই বলে অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স।

তবে, নাস্তার সঙ্গে প্রকৃতি প্রেমের কোনো বিরোধ নেই। ভাগ্যিস!

ভালো থেকো।

—অর্যমা

পুনশ্চ :

বেশি পড়ার মস্ত দোষ হচ্ছে এই যে, নিজের কথা বলতে বসলে পরের কথা আওড়াচ্ছি বলে মনে হয়। আর পরের কথা পড়ার সময়ও মনে হয়, আরে ! এতো আমারই কথা ! কতবারই তো বলেছি, চিঠিতে লিখেছি কারোকে না কারোকে ; কখনও না কখনও।

পরশু রাতে "দ্যা জ্যাকারাণ্ডা"র বাগানে পায়চারী করছিলাম। পূর্ণিমা আজকে। কিন্তু শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদেরও প্রকোপ বড় কম নয়। বিশেষ করে গ্রীষ্মরাতে। গপুবাবুর গতকাল পিতিজ-এ আসার আসল কারণও ছিল 'মুনলাইট পিকনিক'। গতরাতে পিতিজ থেকেই বেরিয়েছি প্রায় রাত বারোটাতে। পথে ডাকাতের মুখোমুখি পড়তে হয়েছিল। তবে গপুবাবুকে এ তল্লাটের সাধু ও ডাকাত সকলেই সমান সমীহ করে। গপুবাবুকে রাইফেল হাতে নামতে দেখে চকিতে তারা জীপ ঘুরিয়ে বাঁ দিকের জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিয়ে বনবাদাড় ভেঙ্গে পড়ি কী মরি করে পালালো। গপুবাবুর রান্নার হাত আর রাইফেলের হাত সম্বন্ধে হাজারীবাগ এবং কোডারমা জেলাতে সাধু কী অসাধু কারোই কোনো দ্বিমত নেই।

যে কথা বলছিলাম। বাগানে হাঁটতে হাঁটতে মিশ্রফুলের গন্ধে তোমার কথা ভারী মনে পড়ছিল। সত্যি বলছি। দিনেরাতে কতবার যে তোমার কথা মনে পড়ে কী বলব ! খুব জানতে ইচ্ছে করে, তোমার কি আমার কথা মনে হয় ? একবারও ?

তোমাকে তো ভালোবাসিই। জানিনা, তুমি আমাকে বাসো কি না ! কিন্তু এমন চাঁদের আলোয়, ফুলের গন্ধে মনের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা ভালোবাসা হঠাৎ যেন পাখা মেলে রাতচরা পাখিরই মতো মাটিফুঁড়ে উড়ে আসে, চমকে দিয়ে।

প্রমথ চৌধুরী মশায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে, তাঁদের বিবাহপূর্ব কোর্টশিপ-এর সময়ে একটি চিঠিতে ঠিক এই কথাই লিখেছিলেন। জানিনা, তুমি পড়েছো কি না ! ওঁর কয়েকটি চিঠি সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল আরও অন্য অনেক চিঠির সঙ্গে। উনি লিখেছিলেন, হরশৃঙ্গার ফুলের গন্ধে মোহিত হয়ে :

"ভৈরবীর মধ্যে কড়িমধ্যম এলে প্রাণের মূলে গিয়ে যেরকম আঘাত করে ঠিক সেই ভাবের.... একটুখানি চাঁদের আলোয় একটা ফুলের গন্ধ, একটা গানের সুর আমাদের প্রকৃতির আসল অংশটা একেবারে হঠাৎ খুলে দেয়। তুমি সৌন্দর্য, কবিত্ব, মহত্ত্ব বলে জিনিস যে পৃথিবীতে আছে তা বিশ্বাস করো, আমিও করি, কিন্তু জিনিসগুলোর পূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র গুটিকত মাহেন্দ্রক্ষণে হয়। নিজের চেষ্টায় হয় না, বাইরের সৌন্দর্য, কবিত্ব, মহত্ত্ব এসে তা ফুটিয়ে তোলে। একটি মানুষের ভিতর যা কিছু মহৎ, সুন্দর, মধুর, গভীর ভাব আছে তা একটা ফুলের গন্ধে যে ফুটিয়ে তুলতে পারে তা দশ ভল্যুম ফিলজফিতে পারে না।"

এ কথা আমারও মনের কথা।

আর তোমার ?

—অ

boiRboi.net

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
নিউ দিল্লি

দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা, কল্যাণীয়াসু,

মাঝে-মাঝে সকলকেই বোধহয় চিঠিতে পায়।

চিঠি অনেকেই লিখতে হয় প্রতিদিন অনেককেই। কিছু কর্তব্যর চিঠি, কিছু আনন্দের চিঠি, কিছু রাগের চিঠি।

অভিমানের চিঠি আজকাল লিখিই না। যার উপর অভিমান করতে পারি এমন মানুষ আজ আর কেউই নেই।

যে রহিম মিঞার গাড়ি চড়ে আমি সেদিন কোডারমা স্টেশনে গেছিলাম (মানে, যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হল) সেই রহিম মিঞা ও তার গাড়ি সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। কতরকম মানুষই যে এই খুদাহর দুনিয়াতে আছে! আর আছে বলেই না পৃথিবী এখনও এত সুন্দর!

তথাকথিত শিক্ষিত যারা, কলকাতার মতো বিরাট নগরবাসী হাঙ্গরের দল; অর্থ বলো, ক্ষমতা বলো, সবকিছুই যারা নিজেদের স্বার্থপর নগ্ন দাঁতে ছিঁড়ে ফেড়ে বেঁচে থাকেন, এবং ঐ সবকিছু নিয়েই গর্বিত হন; তাঁদের তুলনাতে আমার হাজারীবাগের রহিম মিঞা, করিম মিঞা এবং কুসুমডার কাড়ুয়া আসোয়ারা অনেকেই উচ্চমার্গের মানুষ। এইসব মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করলে আত্মার শুদ্ধি হয়। জানি না, তুমি এমন সব মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছ কি না কখনও জীবনে। যদি না পেয়ে থাকো, তা হলে এদের কথা শুনতে তোমার খারাপ না-ও হয়তো লাগতে পারে। আজও যে মুষ্টিমেয় সৎ, নিলোভি, সরল মানুষ এ দেশে আছে, স্বাধীনতা পাবার পঞ্চাশ বছর পরেও, তাদের অধিকাংশই আছে গ্রামে, গঞ্জে, বনে-পাহাড়ে, তথাকথিত "মফস্বল" শহরেই। কলকাতাতে নয়।

বলব, কখনও তোমাকে ওদের কথা। যাদের আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি।

অনেকদিন চিঠি পাই না।

উত্তর দিয়ে নিশ্চিন্ত কোরো।

—অর্যমা

boiRboi.net

শ্রীঅর্যমা রায়
'দ্যা জ্যাকারাণ্ডা'
হাজারীবাগ

কারলবাগ
নিউ দিল্লি

অর্যমাদা,

এবারে আপনার কথা আমাকে কিছু বলুন। আপনার মা আছেন জানতাম। এখন কেমন আছেন ? স্বীকার করি যে প্রথমে আমি বিশেষ ঔৎসুক্য দেখাইনি। সেটাইতো ভদ্রতা ! কিন্তু এখনতো আমাদের সম্পর্ক চিঠির মাধ্যমে হলেও এক সম্পূর্ণ অন্য মাত্রা পেয়েছে !

ভবানীপুরে আমাদের ভাড়া বাড়ির একতলার বসবার ঘরে, মনে আছে, একটি শালকাঠের কুদৃশ্য ভারী টেবল-এর সামনে শালকাঠের চেয়ারে সোজা হয়ে বসে , আপনি আমাকে পড়াতেন। টেবলটির কোনও রং ছিল না। ওরিজিনাল কেঠো-রং ছাড়া। পেন্সিল-কাটা ছুরির আর চায়ের কাপের দাগে দাগে তা কুদৃশ্যও ছিল।

অসচ্ছলতার সঙ্গে কুরুচির কোনও সাযুজ্য যদিও নেই কিন্তু আমাদের বাড়িতে অসচ্ছলতা আর কুরুচি হাত-ধরাধরি করেই ছিল। চেয়ারগুলো ভীষণ ভারীও ছিল।

আমার বাবা খুব বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন বলে মনে করতেন নিজেকে। এবং হয়তো সেই কারণেই স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পাননি কোনওদিনও। পয়সা দিয়ে জিনিস যখন কিনছেন তখন কাঠের চেয়ার-টেবলও যেন পাথরের মতোই ভারী হয় এবং নিদেনপক্ষে তাঁর জীবদ্দশায় যেন আর টেবল-চেয়ার কিনতে না হয় তখন এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। অথচ অত হিসেবি মানুষটির এইটুকুও জানা ছিল না যে, একটি অল্‌কা-পল্‌কা কাঠের চেয়ারের আয়ুও তাঁর নিজের আয়ুর চেয়েও অনেক বেশি।

বাবা তো সেই কবেই চলে গেছেন ! যাবার সময়ে এক রাশ চিন্তা মাথায় নিয়ে গেছিলেন। তখন সবে দিদির বিয়ে হয়েছে শৌনকদার সঙ্গে। যা সঞ্চয় ছিল তা প্রায় নিঃশেষিত। আমি "ধিঙ্গি" মেয়ে। ছোট ভাই নির্জন, যাকে আপনি হামাগুড়ি-দেওয়া বয়সে দেখেছিলেন ; বাবার মৃত্যুর সময়ে সবে ক্লাস টেন-এ পড়ে।

বাবার অকালমৃত্যুর পরে আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন মায়েরই এক পাড়াতুতো দাদা। আশ্রয়ই শুধু দেননি, আমার এবং নির্জনের আজ যতটুকু পরিচয়, স্বাবলম্বন ; সবই তাঁরই দান। তাঁর ডাকনাম ছিল হাঁদা।

বাগবাজারের খালপারে আমার মা যখন মায়েদের কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে একদল সমবয়েসী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মামাদের যৌথ পরিবারে মানুষ হচ্ছিলেন তখন হাঁদামামারা থাকতেন পাশের বাড়িতে। তাঁদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। কিন্তু বাইরের আড়ম্বর ছিল না কোনো। হাঁদামামা মাকে ভালোবেসেছিলেন।

অল্প বয়েসেই মেয়েরা সব বোঝে। মাও বুঝেছিলেন। কিন্তু মা বুদ্ধিমতী ছিলেন তাই

বুঝেও তাঁর ভবিষ্যৎকে মামাদের আর দাদুর উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে, ওই ভালোবাসার কথা আমরাও যে না-বুঝিনি এমন নয়।

হাঁদামামা হালকা নীল-রঙা ফুলহাতা শার্ট পরতেন। সঙ্গে তাঁতের ধুতি। চিরদিন ওই এক পোশাক। পায়ে পাম্প-শু। রাদু কোম্পানির। রুপোর বোতাম। মুখে জর্দা-পান। হাতে ছাতা।

বাবার হঠাৎ-মৃত্যুর পর বাড়িঅলা তিন মাস অপেক্ষা করে যখন "কিছু একটা করতে" বললেন তখন আমাদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। বাবার সঞ্চয় বলতে ছিল পোস্টাপিসে বারো শো বত্রিশ টাকা। যে লোহালক্কড়ের ফার্মে চাকরি করতেন সেখানে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি পেনশান কিছুই ছিল না। তাঁরাও দয়া করেই চাকরিটি দিয়েছিলেন, বাবার এক বন্ধু ইনকাম ট্যাক্সের ইনস্‌পেকটর ছিলেন, তাঁরই সুপারিশে। স্টোরস-এর খাতা রাখতেন বাবা। ইতিহাসে এম·এ· করেছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজে। চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালিদের তো এই "ঐতিহ্য"। শিক্ষার এই গন্তব্য। বি.এ.।

বাড়িঅলারও কিছু করার ছিল না। তিনিও রিটায়ার্ড। অতি সামান্যই পেনশান পেতেন। ভাড়ার দেড়শোটি টাকাই ছিল তাঁর পাথেয়।

হাঁদামামা এসে, আপনি যে-চেয়ারে বসে আমাকে পড়াতেন, সেই চেয়ারে বসে ছাতার ডাঁটির উপরে দুটি হাতের পাতা রেখে তিন-চারবার কেশে আমাকে বললেন, "মাগো, খলসেকে বলো যে, সে তো জলে পড়েনি! আমি তো এখনও আচি। আর আমার তো পুষ্যি বলতে কেউ নেইও। বিয়েই করিনি, তার পুষ্যি। আমি থাকতে কি তোমরা ভেসে যাবে? এ বাড়ি ছাড়লে, অসহায় বিধবা, ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিপদে পড়ে যাবে। যেমন চলচে তেমনই চলুক। ভাইবোনের পড়াশুনো, তোমাদের গানবাজনা সব কিচুই। আমি একবারটি করে এসে খোঁজ নিয়ে যাবো'খন। খলসেকে জিজ্ঞেস করে এসো। আর এইটা রাখো। তিনমাসের বাড়িভাড়া। এখুনি বাড়িঅলাকে দিয়ে এসো।"

তবে, বাবা বেঁচে থাকতেও হাঁদামামা প্রায় নিয়মিতই আসতেন আমাদের ভাড়া বাড়িতে। তখন আসতেন রবিবারে-রবিবারে। এটা-ওটা নিয়ে আসতেন হাতে করে। দুপুরে বাবার অনুরোধে বেশির ভাগ সময়েই খেয়েও যেতেন।

পরিবেশন করার সময়ে মাকে যে হাঁদামামা এক ঝলক দেখতে পেতেন, তাতেই তাঁর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। আমার কিশোর মনে প্রেমের সংজ্ঞা হয়ে আজও ফুটে আছে হাঁদামামার চোখের সেই চাউনিটুকু। 'প্রেম' ব্যাপারটা যে কত মধুর, কত বিধুর হতে পারে, শরৎ সকালের শিউলির মতো, কত পবিত্র ; তা আমি হাঁদামামা আর মায়ের সম্পর্ক দেখেই প্রথমে বুঝেছিলাম।

কিন্তু মায়ের কপালে প্রেম ছিল না। এ সংসারে প্রেম-এর কপাল করে সকলে আসে না। আমাদের এমনই সমাজ! একজন অকৃতদার প্রৌঢ় একাকী মানুষ যে এসে আমাদের সঙ্গে থাকবেন তারও কোনও উপায় ছিল না।

হাঁদামামা পেটে ক্যানসার হয়ে মারা গেলেন। বেশিদিন কষ্ট পাননি। আমরা দু'ভাইবোন আর মা, তিনজনে মিলে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে রোজই সকাল-বিকেল যেতাম। দিদি ও শৌনকদাও আসত প্রায় রোজই। মা হাসপাতালের লোহার খাটের পাশে টুল নিয়ে হাঁদামামার পাশে বসে থাকতেন। হাঁদামামার পেটে হাত বুলিয়ে দিতেন জামার উপর দিয়ে।

আহা! প্রেমের অমন ভীরু এবং সৌন্দর্যময় প্রকাশ আর দেখিনি কখনও।

অপারেশনের পর আর জ্ঞানই ফিরল না। উইল করে গেছিলেন সবই মাকে লিখে দিয়ে। হাঁদামামার যে এত কিছু ছিল তা আমরা ভাবতেই পারিনি। ওঁর জামা-কাপড়, জীবনযাত্রা কোনও কিছুই দেখে বোঝার উপায় ছিল না কোনও। কিন্তু তাঁর সর্বস্বই মাকে দিয়ে গেছিলেন। তা নিয়ে অনেকেই কদর্যতা হয়েছিল। তাঁর এক বোনপো এসে যা-তা ভাষায় আমাদের অপমান করে গেলেন। তবু শেষ পর্যন্ত আমাদের বৃদ্ধ বাড়িঅলা মদনবাবুর হস্তক্ষেপে আমরা হাঁদামামার সম্পত্তি পেয়ে বেঁচে যাই।

অর্থ যে কত দামী, তা অর্থ যাঁদের আছে তাঁরা জানেনই না!

নির্জন যে আজ মিল্‌ওয়াকিতে অ্যামেরিকান বউ, বাড়ি গাড়ি নিয়ে সুখে আছে, তা পুরোপুরি হাঁদামামারই দৌলতে। আমিও যে স্বাবলম্বী হয়েছি, মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারব নিজের জীবন তাও হাঁদামামারই জন্যে। শুধু মায়ের কপালেই সুখ ছিল না। না ছিল সুখ ; না প্রেম। সকলের সঙ্গে সকলের প্রেমের সম্পর্ক হয়ও না এই পৃথিবীতে। কয়েকশো দম্পতিকে খুব কাছ থেকে দেখেই এই কথা বলছি। ভালবেসে বিয়ে করলেও প্রেমের গ্যারান্টি আদৌ থাকে না তাতে।

"প্রেম", খেয়াল গান মাস্টারমশাই। গজল নয়। তার রেশ যদি সমাপ্তি পর্যন্ত না থাকে তবে "বন্দীশ"-এ সুর যতই ভরপুর থাকুক, আলাপে যতই অঁরমা মাখা থাকুক ; লাভ হয় না কিছুই। আমার মনে হয়, প্রেমের সম্পর্কও দেবদুর্লভ সম্পর্কই। অবশ্য প্রেম কাকে বলে, তা বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে স্বল্পজনই জানেন, তাই বাঁচোয়া। এক বিছানাতে শোওয়া, পদবি ছিনিয়ে নেওয়া, অভ্যেসের জঙ্গলে অনভ্যস্ত জানোয়ারের মতো দিশেহারা হয়ে জোড়ে ঘুরে বেড়ানোর নাম, আর যাই হোক, প্রেম নয়।

বাবার সঙ্গে মায়ের শুধু বিয়েই হয়েছিল। তিরিশ বছরের পার্টনারশিপ। সন্তান উৎপাদিত হয়েছিল, রুজি-রোজগার হয়েছিল, অথচ কোনও "সম্পর্ক" ছিল না। একটি দিনের জন্যেও মায়ের সঙ্গে বাবার ঝগড়া হয়নি। কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি যে, মায়ের সঙ্গে বাবার প্রেমের সম্পর্ক ছিল না।

আমাদের জানাশোনা অনেক দম্পতির জীবনই হয়তো এমন। বাইরে থেকে আমরা বুঝি না, এই যা।

মায়ের ডাক নাম ছিল খলসে। এই নামে বাবা কোনওদিনও ডাকেননি মাকে। "ওগো শুনছ", বলেই ডাকতেন। কিন্তু হাঁদামামা শুধু ওই নামেই ডাকতেন।

এসব ভারী অবাক কাণ্ড। তাই না?

ইতি—

যোজনগন্ধা

পুনশ্চ :

আচ্ছা! আপনি যে প্রায়ই আপনার চিঠিতে লেখেন "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন"। আপনি কি সত্যিই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? লোকে শুনলে হাসবে যে! এই যুগে আপনার মতো শিক্ষিত মানুষেরও এমন ঈশ্বরে ভক্তি থাকতে যে পারে এইটে ভাবলেও অবাক লাগে!

কম্যুনিস্টরা আর আঁতেলরা জানতে পেলে যে, হেঁটোকাঁটা দিয়ে পুঁতে দেবে আপনাকে!

যদি সত্যিই বিশ্বাস করেন, তাহলে জানাবেন আমাকে, কেন করেন? আপনার কোন্

দেব বা দেবীতে ভক্তি ? আমিও বিশ্বাস করি না যে, আপনি সত্যিই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। ছিঃ !

দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ
বিহার

যোজনগন্ধা,
কল্যাণীয়াসু,

তোমার হাঁদামামার কথা জেনে ভারী ভাল লাগল। হাজারীবাগের আশ্চর্য সাধারণ কিন্তু অসাধারণ মানুষদেরই মতো বাগবাজারের খালপাড়ের হাঁদামামাও এক আশ্চর্য চরিত্র। এঁদের নিয়ে কখনও আমরা লিখিনা। কিন্তু লেখা অবশ্যই উচিত।

বর্ণাঢ্য চরিত্ররা চিরদিনই কাব্য সাহিত্যর বিষয় হিসেবে নির্বাচিত হন কিন্তু আমাদের চোখের আড়ালে হাঁদামামাদের মতো উর্ণনাভরা যে এক জ্যোতির্ময় জগত তাঁদের হৃদয়ের অগণ্য তন্তু দিয়ে গড়ে তোলেন তা হঠাৎ আবিষ্কার করে আমরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ি। খুবই ভাল লাগল, তাঁকে। ভাল লাগল, মাকে। ভাল লাগল, তোমার অকপটতাকে, মানুষকে মানুষ জ্ঞান করার শিক্ষা পেয়েছ এক কথা জেনেও।

আমাদের বাঙালী সমাজে 'চরিত্র' কথাটার অর্থ বলে আজও যা আমরা জানি, শরৎবাবুর 'চরিত্রহীন'ও সে অর্থর উপরে কোনো রেখাপাত করতে পারেনি ; সেটি বড়ই হাস্যকর। সেই ব্যাখ্যাতে আমি তো অবশ্যই, তোমার হাঁদামামাও চরিত্রহীন !

তোমার মাকে আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাঁরও জীবনে যে স্বামী ছাড়াও একজন মানুষ ছিলেন ভালোবাসার, সহমর্মিতার, এ কথা ভাবলেই মন বড় উদ্বেলিত হয়। প্রত্যেক সাদাসিধে জীবনের নারীর জীবনেই হয়তো একজন বা একাধিক হাঁদামামা থাকেন যাঁদের সঙ্গে তাঁদের কোনোরকম শারীরিক সম্পর্ক থাকে না অথচ সেই সম্পর্কজনিত প্রেম কী উজ্জ্বল ও বিধুর !

জীবনের পথে অনেকখানি চলে এসে এখন মনে হয় যে, প্রেমের জনকে জীবনে কখনওই পেতে নেই। প্রাপ্তি, প্রেমকে প্রায়শই পরাস্ত করে। প্রেমের দীপ্তি চিরদিনই অম্লান থাকে তার অপ্রাপ্তিতেই।

এই সত্যটি তোমার বয়সে, এবং হয়তো অভিজ্ঞতাতেও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তবে, কূপ চলে গিয়ে তোমাকে সম্ভবতঃ এই তত্ত্ব কিছুটা বুঝিয়ে গেছে। দু'জনে দু'জনকে পাওয়ার পরও প্রেমকে অম্লান রাখতে পারেন কম মানুষই। এটাই ঘটনা।

দুর্ঘটনাও বলতে পারো।

তোমার চিঠি পড়ে অনেক পুরনো কথাই মনে পড়ে গেল।

তোমাদের বসবার ঘরের টেবল-চেয়ারের কথা মনে আছে স্পষ্ট। তুমি আজ তাদের দৈন্যদশার যে ছবি তুলে ধরেছ তখন কিন্তু তা মোটেই বোঝা যেত না। অন্ততঃ আমার চোখে তো কখনও পড়েনি। তখন আজকের মতো এমন অপ্রয়োজনের প্রয়োজন অনেকেরই ছিল না। আমাদেরও নয়। তাই সাদামাটা জীবনযাত্রাই স্বাভাবিক ছিল।

তোমারও যে নিজেকে অভাবী মনে হত তাও মনে হয় না আমার। কৈশোরের এবং হয়তো যৌবনেরও ধর্মই এই। তার নিজের মধ্যে এত সজীবতা, প্রাচুর্য, টইটম্বুর থাকে, এতই প্রাণ, এতই সৌন্দর্য যে ; সে তার নিজের তাগিদেই, নিজের স্রোতেই চারধারের সব মলিনতা, বাধা ও অসৌন্দর্যকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যা সুন্দর নয়, তা চোখেই পড়ে না। অসুন্দরকেও সুন্দর, আলোকোজ্জ্বল করে নেবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে তখন।

আমার স্মৃতিতে কুদৃশ্য, অসুন্দর কিছুমাত্র আর নেই। চোখ পেছনে ফেরালে দেখি, তুমি আমার সামনে বসে আছ, একদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে। জানি না, তুমি আমার মুখে কী দেখতে ! কিন্তু মাস্টারমশাইমাত্রই বোধহয় জানেন যে, বৎসরান্তে ছাত্রীর যতবড় না পরীক্ষা, মাস্টারমশাইদের প্রাত্যহিক পরীক্ষা, তার চেয়ে আদৌ কিছু কম বড় নয় !

তখন তোমার মুখের মধ্যে সবচেয়ে যা আগে চোখে পড়ত তা তোমার চোখ দুটি। ডিম্বাকৃতি মুখে, দীঘল আনত দুটি চোখ, বড়-বড় আঁখি-পল্লব। তোমার চোখে চেয়ে যে সে সব দিনে কত কষ্টই পেয়েছি, কী বলব ! সে সব কষ্টর কথা তোমার ধারণারও বাইরে। আজ সে-কথা অকপটে বলতে লজ্জা করছে না একটুও। বরং বলতে পেরে, হালকা বোধ করছি। আনন্দিত হচ্ছি। কিন্তু সেদিন অনেক নিদ্রাহীন রাতের অস্বস্তি ছিল এই ভাবনাটুকুই !

আমার বন্ধু আরুণি যদি বেঁচে থাকত তবে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম। আর ওর সঙ্গে আলাপ হলে আমাকে আর তোমার একটুও ভালোলাগার প্রশ্নই উঠত না কোনওদিনও। ওর মতো রসিক, সপ্রতিভ, বাক্‌পটু, চোখে-মুখে কথা-বলা মানুষ তো আর একটিও পেলাম না। তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপেই ও তোমাকে নিশ্চয়ই বলত, দশজনের সামনেই বলত ; আহা ! কী সুন্দর আপনার চোখদুটি। বা বলত, আপনি ভারী সুন্দর !

ও সঙ্গে থাকায় যে কত অস্বস্তিকর অবস্থাতেই না পড়তে হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে তা বলবার নয়। কিন্তু ওর তাতে কিছুমাত্রই যেত আসত না।

আরুণি বলত, "দু'-দিনের জন্য এখানে আসা, (তখন তো জানতাম না যে সত্যদ্রষ্টার মতোই সে বলত সে-কথা) সুন্দর কিছু দেখলে তা বলতে দেরি করবি না। মানুষকে সুখী করতে পারলে এক মুহূর্তও দেরি করবি না তার প্রশস্তি করতে। সে প্রশস্তি যা ঘিরেই হোক না কেন ! আমাদের দেশে তা বলতে, গায়ে যেন জ্বর আসে। এই করে করে জাতটার চরিত্রই নষ্ট হয়ে গেল।"

যাই হোক, আরুণি আজ নেই কিন্তু চলতে ফিরতে সবসময়ই তার কথা মনে হয়। তার হাসি, তার রসিকতা ; তার মনের বিরাটত্ব।

কিছু মানুষ এ সংসারের চেয়ে অনেক বড় মাপের হয়। সে কারণেই বোধহয় তারা এখানে পুরোপুরি আঁটে না। এবং আঁটে না বলেই হয়তো তাড়াতাড়ি ফিরেও যায়।

তুমি যখন হাজারীবাগে আসবে তখন তোমাকে ওর ছবি দেখাব। বসবার ঘরে, জঙ্গলের মধ্যে তোলা ওর একটি এনলার্জ-করা ফোটো দেওয়ালে রাখা আছে। সবাই

জিজ্ঞেস করেন, উনি কে ? আপনার বাবা কি ? যৌবন বয়সের ছবি তাঁর ? আপনার সঙ্গে চেহারার মিল নেই তো !

আমি হেসে ফেলি। ছবির ইমপর্ট্যান্টিন্সের জন্যেই সকলে অমন ভাবেন। তাঁদের বলি, বাবা নন ; তবে বাবারই মতো সম্মানিত। তাছাড়া সব বাবার সঙ্গে কি সব ছেলের চেহারার মিল থাকে ?

জানো তো, স্কটল্যাণ্ডে একটি কথা চালু আছে ? কেউ যদি তার বাবার মতো দেখতে না হয়, তবে অন্যে ঠাট্টা করে বলে : "Hey! What's the matter? You don't look like your father. Ask your mother."

কথাটা ফেলে দেবার মতো নয়।

যখনি কোনও মহিলার মৃতদেহ দেখি শ্মশানে, আমার মনে হয়, একটি অজ্ঞাত ইতিহাসও ওঁর শরীরের সঙ্গে পুড়ে ছাই হবে এখুনি। কত গোপন তথ্য, কত রহস্য, তাঁর সন্তানদের এক বা একাধিক বাবাদের কথা ; কত উপন্যাসের প্লট ! কত কিছু ; যা পোড়ানো সোজা ; বলা কষ্টের।

তোমার কথাতেই ফিরি।

তোমাদের বসার ঘরের সামনে একটি খেলার মাঠ ছিল। মনে পড়ে ? তখন কলকাতায়, সব পাড়াতেই কত খেলার মাঠই না ছিল ! বড়-বড় হাতাওয়ালা বাড়ি ছিল অগণ্য। এক কণা জমি তখন সোনার মূল্যে বিকোত না। ভবানীপুর পুরোপুরি বাঙালি পাড়াই ছিল। সর্দারজী আর গুজরাটিরা মালিক হয়ে যায়নি তখনও ভবানীপুরের।

সেই মাঠেরই এক পাশে দুটি কদমগাছ ছিল। একটি কৃষ্ণচূড়া। আর দুটি বকুল। বর্ষাকালে কদমের ছায়া পড়তো তোমার দু'চোখের মণিতে। তুমি দেখতে পেতে না। তুমি পাবেই বা কী করে ?

আমি পেতাম।

আমি যেদিন-যেদিন দুপুরে পড়াতাম তোমাকে, সেদিন-সেদিনই আইসক্রিমের গাড়ি যেত তোমাদের গলি দিয়ে। কে জানে। হয়তো রোজই যেত ! মনে আছে তোমার ?

আইসক্রিমওয়ালা হেঁকে বলত, "কোয়ালিটি ! কোয়ালিটি !"

তোমাদের বাড়ির উলটোদিকে যে বড়লোক-উকিলের বাড়ি ছিল, সে বাড়ি থেকে গুটি চারেক হাবলা-গোবলা ফরসা, মোটা মেয়ে প্লাটিপাস-এর মতো থপথপিয়ে এসে আইসক্রিমওয়ালাকে দাঁড় করিয়ে চকোলেট আইসক্রিম কিনত। একজন কিনত ভ্যানিলা। আজও মনে আছে। যাই বলো আর তাই বলো, তোমার কিন্তু আইসক্রিমের প্রতি খুবই দুর্বলতা ছিল। একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে সেদিকে। কিন্তু লোভীর মতো নয়। কোনোরকম লোভই দেখিনি তোমার মধ্যে। আর আমার যে কী কষ্টই হত, কী বলব ! ইচ্ছে হত, এক মাসের মাইনে দিয়ে তোমাকে এক গাড়ি আইসক্রিম কিনে দিই। যতগুলি হয়। কিন্তু আমি তো তোমাদের চেয়েও অনেক গরিব ছিলাম তখন। তাই মাইনে পাবার পরই সেই ইচ্ছেটা উবে যেত। কলেজের মাইনে, বই, যাতায়াতের খরচ, মেস-এর খরচ, বন্ধুদের ধার শোধ, টিফিনের পয়সা, কত শত দাবি। শত ইচ্ছে থাকলেও তোমাকে একটা আইসক্রিমও কিনে দিতে পারিনি কোনওদিনই।

পরে ভাবতাম, আইসক্রিমের ব্যবসা করব। শুধু তোমাকেই আইসক্রিম খাওয়ানোর জন্য।

তাও হল না।

আমার-তোমার মতো অনেকেই ভাগ্যবান, যাদের ছেলেবেলাটা বা কৈশোরের বা যৌবনের প্রথমভাগ অসচ্ছলতার মধ্যে কাটলেও পরিণত বয়সে পৌঁছে যারা মোটামুটি সচ্ছলতার মুখ দেখতে পায়। অবশ্য সবারই তো তেমন সৌভাগ্য হয় না!

(যখন যেটা চাইবার, তখন সেটা না পেলে, পরে পেলে, তার কোনও আনন্দই আর থাকে না) তবে, একথাও ঠিক যে, এখন পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে, আজকের উষ্ণতার নির্মোকের মধ্যে বসে সেইসব শীতার্ত দিনগুলি সম্পূর্ণ অন্য এক মাত্রা পায়। যে-সব শিশুর সব চাহিদাই পূরিত হয় শৈশবে, তারা বোধহয় অন্যর চাহিদা, অন্যর দুঃখকষ্টর কথা বুঝতে পর্যন্ত পারে না পরবর্তী জীবনে।

তোমার দুই বন্ধু ছিল, মনে আছে? ইলবিলা আর সিনিবালি। কী অদ্ভুত অদ্ভুত নাম ছিল তোমাদের সকলেরই। তারা এলে আমি যখন তোমাকে পড়াতাম তারাও টেবলে বসে পড়ত! ইলবিলার কথাতো তুমি লিখেওছিলে একবার। ইলবিলা ছিল রোগা, শ্যামবর্ণা, চুলখোলা, মিচ্‌কে। আর সিনিবালি ছিল ফরসা। সবসময় সাদা পোশাকে থাকত। দু' বিনুনি করত। তাই না? খুব কম কথা বলত। তারা এখন কোথায় আছে? তোমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ আছে কি?

যদি থাকে, তো ওদের সকলকে নিয়ে চলে এসো একবার আমার এখানে।

একসময়ের মাস্টারমশায়ের কাছে একসময়ের ছাত্রীরা তো আসতেই পারে।

আজ শেষ করলাম।

ইতি—
অর্যমা

পুনশ্চ :

আমার মা অনেকদিনই গত হয়েছেন। বাবা তো, আমার শিশুকালেই। আমার অন্যান্য আত্মীয়রা বেঁচেবর্তে আছেন। দুধে-ভাতেও আছেন বলতে পারো। তবে আমাকে তাঁরা প্রায় বর্জনই করেছেন। তাই, আমিও তাঁদের।

অর্যমা রায়
দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

গ্রেটার কৈলাশ ওয়ান
নিউ দিল্লি

মাস্টারমশাই,

বাড়ি বদলালাম। এখানে আপনার আসতে কোনও অসুবিধে নেই। কষ্টও হবে না কোনও। কবে আসবেন?

উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল অনেক। কিছু মনে করবেন না।

BanglaBook.net

ইলবিলা আর সিনিবালির সঙ্গে যোগাযোগ এখনও ছিন্ন হয়নি। ইলবিলা কলকাতার কাছেই একটি মেয়ে-কলেজে ইতিহাস পড়ায়।

শৌনকদার মতো ইলবিলাও পার্টি করত কলেজের দিন থেকেই। চাকরি পেতে ওর অসুবিধে হয়নি। এক সময়ে পার্টি করলেও এখন ওর পার্টি সম্বন্ধে আর অত ভালোবাসা নেই। পার্টির এক দাদাকে বিয়েও করেছিল ও। কিন্তু তিন বছর পরই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বিয়ে এবং বিবাহিত পুরুষ সম্বন্ধে ওর মতামত এখন অত্যন্তই অস্বস্তিকর। বিয়ের পথে যে আমি যাইনি তার জন্যে ইলবিলার এবং আরও অনেকের অভিজ্ঞতা অনেকটাই দায়ী। বিয়ে করাটা আজকাল অত আর সহজ নেই। বিয়ে করা সহজ হলেও বিয়ে বাঁচিয়ে রাখাটা প্রাণান্তকর ব্যাপার হয়েছে। যা শুনি, স্বাবলম্বী অনেক মেয়েরই কাছ থেকে, তাতেই মনে হয়।

সিনিবালিরও বিয়ে হয়েছিল। বি.এ.-র পর আর ও পড়েনি। বাড়ির অবস্থা ওদের ভালই ছিল বলতে গেলে। সম্বন্ধে করেই বিয়ে দিয়ে ছিলেন মা-বাবা। কিন্তু বিয়ের তিনমাসের মধ্যেই ওর স্বামী মারা যান। ওর বাবার বাড়িতে ভায়েরা সব আলাদা হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়িতেতো আগেই সবাই আলাদাই ছিলেন।

ইলবিলা আর সিনিবালি দু'জনে একটি ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করে চেতলাতে থাকে এখন। স্বাবলম্বী দু'জনেই। ইলবিলার দাদারাও আলাদা হয়ে গেছেন। সিনিবালিদের পৈতৃক বাড়িও বিক্রি হয়ে গেছে। সিনিবালি কলকাতারই করপোরেশন-স্কুলে একটি চাকরি পেয়েছে। পড়াচ্ছে। অর্থাৎ কিছু ছেলেমেয়ের সর্বনাশ করছে। সামান্যই মাইনে। "যেমন পাই, তেমন পড়াই," ও বলে। বাড়ির কাজকর্ম ও-ই দেখাশুনো করে। রান্নাবান্নাও। ইলবিলাই খরচের বেশিটা দেয়।

ওরা দু'জনেই পরম পুরুষ-বিদ্বেষী হয়ে গেছে। একা থাকে বলে অনেক পুরুষই ঘুরঘুর করে। তাদের নিজস্ব স্বল্পস্থায়ী একটিমাত্র ধান্দা নিয়ে। কিন্তু ওরা দু'জনেই এতই বিরক্ত পুরুষদের ওপরে যে একটি কুকুর পুষেছে ; সেটিও মেয়ে। লোকে বলে, কুকুর যদি আপোজিট সেক্সের হয় তবে নাকি বেশি বাধ্য হয়। কেন বলে, জানি না অবশ্য।

কিন্তু বারান্দায় এখন পুরুষ চড়াই পাখি দেখলেও ওরা দু'জনে ঝাঁটা হাতে তেড়ে যায়।

ওরা দু'জনেই এখন প্রায় নিঃসংশয় যে, পুরুষহীন জীবন, চমৎকার। বিয়ে করবার বা পুরুষদের উপরে কোনও ভাবেই নির্ভর করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও বোধ করে না ওরা। ওদের ফ্ল্যাটে গিয়ে আমি থেকেওছি দু'-এক দিন। দু'জনেই লাইব্রেরি থেকে গাদা-গাদা বই আনে। আপনারা, লেখকেরা জানেনও না, কারা আপনাদের আসল অনুরাগী ! তবে কলকাতার শতেক-ঝামেলার জীবনে বই পড়ার সময় মানুষের ক্রমশই কমে আসছে। তার উপরে হাত বাড়ালেই, বিনা মেহনতের, সস্তা আমোদের টি·ভি· তো আছেই। The Great Distractor...

দু'জনে মিলে একটা জাপানী টু-ইন-ওয়ানও কিনেছে। গমগম করে আওয়াজ। ক্যাসেটও কেনে অনেক। ক্লাসিকাল গান শোনে। যা ইচ্ছে হয়, তাই রান্না করে খায়। ওদের দেখে তো আমার একটুও অখুশি বলে মনে হয় না। একটা সময় বোধ হয় আসছে, যখন অগণ্য মেয়েই এইরকম স্বাধীন জীবনযাপন করবে।

আপনার সঙ্গে দেখা হতেই আমি ওদের চিঠি লিখেছিলাম। আপনি যখন আমাকে পড়াতেন তখনকার দিনে ইলবিলা আপনাকে বলত : "ওরে আমার কাঁচা"। না।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি অনুরাগবশত নয়। বলত, তোর মাস্টারমশাই "কাঁচামিঠে" আমের মতো। আপনাকে নাকি ওর কাঁচা খেতে ইচ্ছে করত। ভারি ফাজিল ছিল ইলবিলা। ওরকম বোকা-বোকা মুখ করে আপনার সামনে যখন বসে থাকত তখন কি আপনি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পেতেন যে ও এরকম রসিক ?

আর সিনিবালি আপনার সম্বন্ধে বলত, "বেশি গুড়ি-গুড়ি। এরকম ছেলেরা ন্যকা-বোকা হয় আসলে।" তবে আপনি যে পড়াশুনোয় খুব ভাল ছিলেন এবং আমাদের প্রতি ঔৎসুক্য দেখাতেন না আদৌ, সেজন্যই হয়তো সিনিবালি আপনাকে বলত 'বুকওয়ার্ম'।

শুনলেন তো সকলের ইতিহাস। সে সব দিনের কথা এখন মনে এলে ভীষণই হাসি পায়। কিন্তু সেদিনগুলোই যেন ভাল ছিল।

আমার একথা ভেবে অবাক লাগে যে, কলকাতাতে আজকের দিনেও একই পাড়াতে কত বিভিন্ন মানসিকতার মানুষ, প্রাগৈতিহাসিক থেকে অত্যাধুনিক ; বাস করেন বিভিন্ন বাড়িতে। অবশ্য এ-কথাটা শুধু কলকাতাই নয়, হয়তো সব শহর সম্পর্কেই সত্যি। প্রত্যেক সমাজেই বোধহয় এইরকম হয়। অনগ্রসর এবং অগ্রসর সমাজের মধ্যেও অনগ্রসরতা এবং অগ্রসরতার বিভিন্ন স্তর থাকেই, যা বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল।

তবে একটা কথা বলব আমার বন্ধুদের সম্বন্ধে। আমার বন্ধুরা সাধারণ হতে পারে কিন্তু তারা আমাকে সেই ছেলেবেলার দিনের মতোই ভালোবাসে। আমিও তাদের বাসি। এবং আমরা তিনজনেই আপনাকে ভালোবাসি। অবশ্যই, তিনরকম করে।

ওদের সঙ্গে আপনার যদি কোনওদিনও দেখা হয় তো তবেই জানবেন ওরা আপনার কত মনোযোগী পাঠিকা। কত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব লেখাই পড়ে আপনার।

আমিও পড়ি। তবে ভালোবাসার রকমেরই মতো বই, পড়তে ভালোলাগার কারণও অবশ্যই আলাদা-আলাদা।

ইতি—
যোজনগন্ধা

শ্রী অর্যমা রায়
'দ্যা জ্যাকারাণ্ডা'
হাজারীবাগ/বিহার

পরমহংস রোড
চেতলা
কলকাতা

শ্রদ্ধাস্পদেষু লেখক,

যোজনগন্ধার চিঠিতে জানতে পেলাম যে তার মাস্টারমশাইকে "অবশেষে" সে খুঁজে পেয়েছে। "অবশেষে" বলছি যে, তার কারণ আছে। যোজনগন্ধা আপনাকে হন্যে হয়ে "খ্যাপার" "পরশপাথর" খোঁজারই মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে গত দশ বছর ধরে।

আপনি হয়তো শুধোবেন, কেন ?

সে কেনর উত্তর সে-ই জানে। আমাদের জানার কথা নয়।

অনেক মানুষেরই ছাতা হারায়, কুকুর হারায়, আলমারির চাবি হারায় ; জানি। তাদের ব্যাকুলতার কথাও জানি। কিন্তু মাস্টারমশাই হারিয়ে গেলে যে মানুষ এমন আকুলি-বিকুলি করে তা কিন্তু আমার জানা ছিল না।

যাই হোক, আমার আর সিনিবালির কাছে সবচেয়ে বড় আনন্দের কথা মাস্টারমশাইকে খুঁজে পাওয়া নয়, তেমন আনন্দ, হারানো ছাতা খুঁজে পেলেও হত ; আমাদের আনন্দ হয়েছে খুব এ কথা জেনে যে, মাস্টারমশায় শব্দটির তর্জমা করলে দাঁড়ায় লেখক অর্যমা রায়।

আমরা জানি না, যোজনগন্ধা আমাদের দু'জনের সম্বন্ধে ইনিয়েবিনিয়ে কি লিখেছে আপনাকে। তবে এটুকু জানিয়ে রাখছি যে, আমরা "ফাস্টো কেলাস" আছি এবং অর্যমা রায় ছাড়া অন্য কোনও পুরুষকে আমরা বেশ কয়েক বছর হল পুরুষ বলেই গণ্য করছি না।

আপনার সেই কচি-কাঁচা ভালমানুষ চেহারাটা, নীল শার্ট আর খাকি প্যান্ট পরা, এখনও আমাদের চোখে ভাসে।

আপনি কিন্তু ভীষণ কিপটে ছিলেন। একদিন চিনাবাদাম খাওয়াতে বললাম, তাও খাওয়ালেন না। আর একদিন, সন্ধের মুখে আপনি যোজাকে পড়িয়ে ফিরছিলেন, হঠাৎই কাঁসারীপাড়ার মোড়ে আপনার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগে আর কী। ফুটপাথে বসে ছিল বেলফুলঅলা। বললাম, দেবেন কিনে ? মাস্টারমশাই ? হাতে প'রে বাড়ি যাব। রাতে বালিশের নিচে বেলফুলের মালা রেখে ঘুমুবো।

যেই বললাম, অমনি আপনি মুখটা বেগুন-প্যাঁচা করে ধড়ফড়িয়ে দোতলা বাসে চেপে বসলেন ! যেন, আমি আপনার কলজেই পায়ে মাড়িয়ে দিয়েছি !

তখন আপনি বেশ ক্যাবলা ছিলেন কিন্তু। কে জানে ! পরবর্তী জীবনে যাঁরা স্মার্ট হন তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ছেলেবেলায় ক্যাবলা-কার্তিক থাকেন। ঐ বয়সেই যাঁরা সপ্রতিভতার বাড়াবাড়ি করেন পরে তাদের কী অবস্থা হয় তা আমাদের পুরনো পাড়ার অনেক মাস্তানদের দেখে বেশ বুঝতে পারি।

আপনার বাইশটি বই আমাদের বাড়িতে আছে। জানেন। প্রথমে লাইব্রেরি থেকে এনে পড়ি। আমি আর সিনিবালি ঠিক করি যে, যদি ভালো লাগে তবেই বাড়িতে রাখব। কখনও কলকাতায় এলে আমাদের বাড়িতে অবশ্যই আসতে হবে, থাকতে হবে এবং সব ক'টি বইয়েই সই করে দিতে হবে।

আমাদের বাড়ির কাছেই কাজ-করা মেয়েরা মিলে একটি পুরো বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেস করে থাকে। ওরা প্রায় জনা তিরিশেক থাকে ওখানে। সবাই মহিলা, একটি শুঁফো পুরুষ (দারোয়ান) এবং একটি হুলো বেড়াল ছাড়া। ওদের মধ্যে অনেকেই আপনার ভক্ত। তার মানে এই নয় যে, শুধু মেয়েরাই ভক্ত আপনার। নয় যে, তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে আমার কাছে। হয়তো আপনার কাছেও আছে।

উত্তর দেবেন তো ? আমি আর সিনিবালি কিন্তু শুধু পাঠিকাই নই ! তার চেয়ে আরও অনেকই বেশি। আপনি যখন লেখক ছিলেন না এবং কোনওদিনও যে হবেন এমন সম্ভাবনাও ছিল না, তখন থেকেই আমরা আপনাকে চিনি। তাই অবশ্যই উত্তর দেবেন, প্লীজ ! ফর ওল্ড টাইমস সেক।

আপনার পরিবার কত বড় ? বউদি কোথাকার মেয়ে ? সম্বন্ধ করেই বিয়ে হয়েছিল, না ভালোবেসে ?

হাঃ। পুরুষের ভালোবাসা ! মুসলমানের মুরগি পোষা !

প্রণাম নেবেন। এই প্রণাম, লেখক অর্যমা রায়কে। যোজার মাস্টারমশাইকে আমরা প্রণম্য মনে করিনি কোনওদিনও। প্রণামের সম্পর্ক ছাড়াও নারী ও পুরুষের মধ্যে নানারকম সম্পর্ক থাকতে পারে। এ কথা নিশ্চয়ই মানেন।

ইতি—

নিজের ও সিনিবালির পক্ষে ইলবিলা রায়

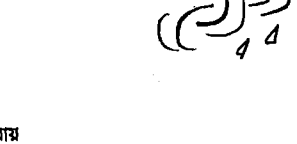

ইলবিলা ঘোষরায়
পরমহংসদেব রোড
চেতলা

দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
ক্যানারী হিল রোড
হাজরীবাগ, বিহার

ইলবিলা, কল্যাণীয়াসু,

এত বছর পরে তোমাদের চিঠি পেয়ে ভারি ভাল এবং অবাক লাগছে।

দীর্ঘদিন যাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, যাদের ফ্রক-পরা অবস্থাতে দেখেছি, তারা যে সব এত বড় আর প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে গেছে তা ভাবতেও অবাক লাগে।

"সময় বড় বলবান"। একটি ওড়িয়া নাটকে ওই ডায়ালগ শুনেছিলাম। কথাটির মতো সত্য বেশি নেই। সময় আমাদের সকলকেই কতই না অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নিয়ে এসেছে আজকের অবস্থাতে ! আমরা কেউই আর তরুণ নই, নিষ্পাপ নই ; আমাদের মন আর শরীর তেমন অনাবিল নেই কারোই। এটা ভাল কী মন্দ তা জানি না। তবে জানি যে, এটাই সত্যি।

না ! তোমাদের কোনওই ভয় নেই। স্ত্রী নামক কোনও ভীতিপ্রদ মানুষের প্রবেশ ঘটেনি আমার জীবনে। তোমরা কেউই বউ দেখে দিলে না বলে বিয়ে করাই হল না। এখন বেলা হয়েছে অনেক। এখন আর কারো আসার সম্ভাবনাও নেই। "বর-বউ বর-বউ" খেলার মতো মানসিকতাও নেই।

তোমরা যখন আমাকে মাস্টারমশাই বলে ডাকতে, আমিও "কানাই মাস্টার" হয়েই থাকতাম। জীবনে একটা বয়সে এসে পৌঁছবার পরে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান ক্রমশই কমে আসে। "প্রাপ্তেষু ষোড়শবর্ষেণ"...র পিতাপুত্রর মতো সকলেই সকলের বন্ধু হয়ে ওঠে। বন্ধুভাবেই এত কথা বলছি তোমাদের।

কলকাতায় গেলে তোমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করব। তবে থাকতে পারব কিনা, তা বলতে পারব না। তোমাদের সঙ্গে একটি দিন কাটাব।

আমি তো হাজারীবাগেই আস্তানা গেড়েছি গত দশ বছর হল। যদিও ভাড়া, কিন্তু মস্ত

বাগানওয়ালা বাড়িটি বেশ বড়ই। দুটি গেস্ট রুমও আছে। তোমরা সবাই যদি দলবেঁধে কখনও আসো, অথবা একা ; একাও আসতে পারো, যেমন তোমাদের খুশি ; তা হলে খুবই খুশি হব। জায়গার অকুলান হবে না। এখানে রান্না করেও খেতে হবে না। থাকা ও বেড়ানোরও কোনও অসুবিধে হবে না। সব বন্দোবস্তই আছে এবং করা যাবে।

যদি পারো, তো আগে জানিয়ে চলে এসো। খুব ভালো লাগবে। কলকাতা থেকে এলে, বম্বে মেল (ভায়া এলাহাবাদ) আসতে পারো। ভোর রাত্রে হাজারীবাগ রোড স্টেশনে নামতে হবে। দিনে দিনে আসতে হলে শেয়ালদা-পাঠানকোটেও আসতে পারো। শেয়ালদা থেকে ছাড়ে। সেটি এসে সন্ধ্যের পর পৌঁছবে ওই একই স্টেশনে। কোডারমা স্টেশনেও নামতে পারো। দ্রুতগামী গাড়িগুলো সেখানেই থামে, হাজারীবাগ রোড স্টেশনে থামে না।

আগে জানলে আমি স্টেশনে যেতে পারি। দুটি স্টেশনই তিরিশ-চল্লিশ মাইল দূর হাজারীবাগ থেকে। না জানিয়ে এলে, হাজারীবাগ রোড স্টেশনে বাস এবং কোডারমাতে ট্রেকার অথবা ট্যাক্সি পাবে। শেয়ারেও পাবে। যেমন সুবিধে হবে, তেমনই এসো। পারলে, আগে জানিও। আজকাল চিঠি পৌঁছতেও তো কমকরে সাতদিন লাগে। যোজনগন্ধাকেও বলেছি।

এসো না, সকলে মিলে পুজোর সময়ে ?

ভালো থেকো।

ইতি—
অর্যমা রায়

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
গ্রেটার কৈলাশ ওয়ান
নিউ দিল্লি

হারহাদ বন-বাংলো
হাজারীবাগ ন্যাশনাল পার্ক
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা, কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠির উত্তর দিতে এবারে বড়ই দেরি হয়ে গেল। রাগ কোরো না। গপু সেনের খপ্পরে ছিলাম। গপু সেনকে ভাল করে জানলে তুমি জানতে তাঁর "খপ্পর" ঠিক কী জিনিস !

তোমাকে তাঁর কথা তো আগেও বলেছি। তাঁর সঙ্গেই হারহাদ-এ এসেছি গতকাল।

হাজারীবাগের কথা বলতে বসে গপু সেনের কথা না বলাটা কৃতঘ্নতা হয়।

'রহিস্' আদমী সম্বন্ধে পশ্চিম, মধ্য এবং উত্তর ভারতে এক বিশেষ ধারণা আছে। কিন্তু গপু সেনকে শুধুমাত্র একটি বিশেষণে সীমিত করে রাখলে, যে তা করবে, তার দেখবার ক্ষমতার সীমাই নগ্নভাবে প্রকট হবে। এরকম ওরিজিনাল, আনপ্রেডিক্টেবল, সমসময়ের, যুগাশ্রিত সমস্ত-অভ্যাসের বিপরীতমুখী-চলা মানুষ এই প্রজন্মে আর আছে কি না জানি

না।

বড়লোক অনেকেই দেখেছি আজ পর্যন্ত। মিথ্যে বলব না, নিজে বড়লোক কোনওদিনই ছিলাম না বলেই তাঁদের প্রতি ঔৎসুক্য ছিল তীব্র। অন্য প্রজাতির প্রাণীরই মতো, হরিণ যেমন দূর থেকে এবং লুকিয়ে তার নিধনকারী বাঘকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করে, তেমন করেই লক্ষ করেছি বড়লোকদের চিরদিন। এবং যতই লক্ষ করেছি ততই অস্বস্তি এবং এক ধরনের ঘৃণাও বোধ করেছি তাঁদের প্রতি। তবে সব আইনেরই ব্যতিক্রম থাকে এবং ব্যতিক্রমই প্রমাণ করে আইনের মান্যতাকে।

প্রথমত, গপু সেনের চেহারাটা বিধাতা এমন "কাস্টম-বীল্ট" করে বানিয়েছেন, গপু সেনের বহু রাইফেল-বন্দুকেরই মতো যে ; তাঁকে দেখে অত্যন্ত সুবুদ্ধি অথবা কুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও ধোঁকা খাবেন। বিধাতার সেই ধোঁকা, ধোঁকা না বলে বরং বলি "তিড়ি", কারণ, হাজারীবাগে এই গপু সেনই নিজের অবিরত চেষ্টায় এই দেশজ শব্দটিকে আরও দুর্ভেদ্য ও সুদৃঢ় করেছেন।

বড়লোকেরা যা-যা করে থাকেন তার কিছুমাত্রই করতে গপু সেনের প্রবল আপত্তি এবং অনীহা নাকি সেই ছেলেবেলা থেকেই। ভাল জামাকাপড়, স্যুট-টাই পরা, ক্লাব-বাজী করা, কথায়-কথায় "যখন প্যারিসে ছিলুম" অথবা "যখন জার্মানী গেস্‌লুম" ইত্যাদি হালুম-হুলুম-এ তিনি আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না কোনওদিনও। কোথাও যানওনি জাপান ছাড়া। জাপানী সৌন্দর্যবোধ, তা বাগানই হোক, কী ইকেবানাই হোক, কী টাটামী-ফ্লোরই হোক, কী কিমোনোই হোক—সবকিছু সম্বন্ধেই গপু সেনের তীব্র আগ্রহ। সে কারণেই জাপানে গেছিলেন। নিছক "ফোরেনে" বেড়িয়ে আসার জন্যে নয়।

জীবনের আট-দশমাংশ তিনি এই হাজারীবাগেই কাটিয়েছেন। ভারতবর্ষেরও খুব কম জায়গাতেই গেছেন। অথচ ইচ্ছে করলেই তাবৎ জায়াগাতেই যেতে পারতেন। মহম্মদ করিম আর গপু সেনের মধ্যে এক নীরব চুক্তি হয়েছে হাজারীবাগকে পৃথিবীর মোস্ট "বিটীফুল" জায়গা (করিম সাহেবের জবানীতে) হিসেবে লোকচক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার।

গপু সেনের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা যা, তাতে তাঁর ছেলের "হ্যারো-ইটন" না-হলেও ডুন স্কুল নয়তো নিদেনপক্ষে লা মার্টিনিয়র বা সেন্ট জেভিয়ার্স-এ এবং মেয়েরও শৈলশিখরের পাবলিক স্কুল অথবা লোরেটো অথবা মডার্ন হাই স্কুলে পড়া অবশ্যই উচিত ছিল। তা না-পড়িয়ে, নিজের পাড়াতেই "বটকেষ্ট অ্যাকাডেমি" এবং "নলিনীবালা স্কুলে" পড়িয়েছেন ছেলে ও মেয়েকে। তাঁর যুক্তি যে, ছেলেমেয়ে ট্যাঁস হয়ে যাবে, বাংলা বই পড়বে না, বাংলা গান শুনবে না ; বাপ-মায়ের প্রতি কোনও মমত্ববোধ থাকবে না।

তাঁর এমৎ মতামতে গপু সেন যে আদৌ ভ্রান্ত নন তার অকাট্য প্রমাণ চারধারেই দেখতে পাচ্ছি ইদানীং অহরহ। ইংরিজি-মীডিয়ম স্কুলে পড়লেই যে বাঙালীত্বই বিসর্জন দিতে হবে এমন আগামার্কা বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালী ছাড়া আর কারোই নেই। লজ্জায় থুথু ফেলে ডুবে মরা উচিত এই নব্য-বাঙালীদের, যাঁরা পৃথিবীর সমস্ত বাঙালীদের কুলাঙ্গার। ইংরিজিতে পণ্ডিত না-হলে (মানে টাই-পরা তেল-সাবান বিক্রিওয়ালাদের মতো ফরফরিয়ে অন্তঃসারশূন্য যতিহীন ইংরিজি না-বকতে পারার ক্ষমতা) যে জীবন বৃথা, কোনও ব্যাঙ্কের বা কমার্সিয়াল ফার্মের বা কোনও শাঁসালো সরকারি বিভাগের ঘুষখোর অফিসার না-হতে পারলে এবং প্রতিবেশীর জ্বলন্ত ঈর্ষার কারণ না হতে পারলে যে মনুষ্যজন্মই বৃথা এই যখন দেশের নিরানব্বুই ভাগ বাঙালীর (সর্ব-ধর্ম-জাতি-উপজাতি-নির্বিশেষে) দুর্মর ধারণা, তখন তার বিরুদ্ধে একা হাতে লড়ে

যেতে গপু সেন ছাড়া আর কাউকেই দেখিনি। বঙ্গভূমে গপু সেন তেমনই ব্যতিক্রমী বাঙালী বড়লোক (যাঁর ছেলেমেয়েরা "ড্যাডি" "মাম্মী" বলে না, ঠাকুরমার ঝুলি থেকে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ, নজরুল, বিভূতিভূষণ, সৈয়দ মুজতবা আলী থেকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী পর্যন্ত পড়ে।) মাতৃভাষা বাংলা বলে যারা প্রকৃতই গর্বিত। যারা, বাংলা গান শোনে।

গপু সেন একাধারে অত্যন্ত রসিক, খুব ভাল শিকারি, প্রকৃতিপ্রেমিক, ফুলের আর বাগানের উপরে একজন অথরিটি, অত্যন্ত উঁচুদরের রাঁধুনি, অত্যন্ত সৌখিন, জীবনরসিক ; খাদ্য-পানীয়-সঙ্গ সব কিছুর ব্যাপারেই অত্যন্ত খুঁতখুঁতে এবং প্রচণ্ড আনকনভেনশনাল। আরও কত গুণগান করব জানি না।

সেই তিনিই স্বয়ং পাকড়াও করে কোথাও নিয়ে গেলে কি না-গিয়ে পারা যায়!

যাওয়া হয়েছিল রহিমেরই গাড়িতে। মহম্মদ রহিম। যদিও গপু সেনের হাজারীবাগের বাড়ির গ্যারাজেই একটি ঝকঝকে ব্যুইক, একটি রোভার এবং একটি জীপ আছে, রহিম খুব গরিব এবং ওর গাড়ি নেহাত দায়ে না ঠেকলে কেউই ভাড়া নেয় না বলেই তিনদিনের কড়ারে তার গাড়িই নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। চারবেলা খাওয়া। বোতলের তলানি, ভাল মদ্যটদ্য। এবং রাম্-এর একটি পাঁইট দৈনিক বরাদ্দ।

সঙ্গী এই অধম। নির্গুণ হলেও, বড়লোক না হলেও, শুধুমাত্র লেখক বলেই আমার সঙ্গ করেন গপুবাবু। আর আমি ছাড়া সঙ্গী মহম্মদ করিম এবং বিটকেলবাবু। বিটকেলবাবুর আসল নাম কোনওদিন জানার সুযোগ হয়নি আমার। গপুবাবু পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আট বছর আগে—এই যে লেখক স্যার! এর নাম বিটকেল বোস। মহা ফোরটোয়েন্টি পার্টি। সাবধানে থাকবেন। বাগবাজারের মাল।

গপু সেন-এর রকমটাই এরকম। আমার দৃঢ় ধারণা বিটকেল বোস-এর একটি রোম্যান্টিক পোশাকি নাম ছিল। গপু সেনই "বিটকেল" নামকরণ করেছিলেন। আমার আড়ালেও আমাকে কী বলে ডাকতেন তা উনিই জানেন। আমারও কোনও নামকরণ করেছিলেন নিশ্চয়ই। উনিই বলেছিলেন, অর্যমা আবার কারও নাম হয়? আপনার যিনি নামকরণ করেছিলেন তাঁর গিরিবাবুর মেডেল পাবার কথা ছেল। গিরিবাবু, অর্থাৎ ভি·ভি· গিরি। প্রেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া।

বিটকেল বোসের পা বলে কিছু নেই। ওঁর অ্যামেরিকান আর্মি-ডিসপোজালের জীপটিই ওঁর পা। তিনি যেখানেই যাবেন ওঁর জীপও যাবে। বিটকেল বোসের মতো এমন রসিক, এবং যথার্থ খিদমদ্গার বড় কমই দেখা যায়।

সঙ্গী হিসেবে সঙ্গে অবশ্য আরও দু'জন এসেছে। একজন কুসুমডার আসোয়ার দাদা কাড়ুয়া। আসল লোক, গপু সেনের। তবে তার ডুপ্লিকেট এখন পালামৌর হুলুক্ পাহাড়ের কাছে ভালুমার বস্তিতে থাকে। তাছাড়া, আসোয়াতো আছেই।

আসলে গপু সেন কনসার্ভেসানিস্টও বটেন এবং পোচারও বটেন। উনি বলেন : "চুরি করে শিকার, পরকীয়ারই মতো আনন্দের। বুয়েচেন অর্যমা স্যার—"

এখন বহু জঙ্গলেই শিকারের পারমিট পেতে বাধা নেই তবে শোনা যাচ্ছে বছর কয়েকের মধ্যেই শিকার করা নাকি পুরোপুরিই বন্ধ হয়ে যাবে দেশে। তাই গপু সেন অ্যান্ড কোং এখন ওভারটাইম করছেন। তবে এখানে পারমিট পাওয়া যায় না। কারণ, হাজারীবাগ ন্যাশনাল পার্কের মধ্যেই পড়ে হারহাদ্। ছোট্ট বাংলো। নিচ দিয়ে বয়ে গেছে হারহাদ্ নদী। সারাদিন তার ঝরঝরানি শোনা যায়। হাজারীবাগ ন্যাশনাল পার্কে

শিকারের অনুমতি কখনও পাওয়া যায় না। তাই এখানে গপু সেনের শিকারের মানে পোচিং-এর পদ্ধতিই একটু অন্য। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে বারান্দাতে জাপানী কিমোনো পরে বসে তিনচার কাপ চা খেয়ে, গোটা চারেক চার্মস্ সিগারেট খেয়ে (তাঁর ভাষায়, বিড়ি !) পোশাক পালটে বেরিয়ে পড়লেন। কাঁধে একটি ঝোলা। ঝোলার মধ্যে একটি দূরবীন এবং সাইলেন্সার লাগানো একটা পয়েন্ট টু-টু পিস্তল গপুবাবুর।

তুমি হয়তো জিজ্ঞেস করবে, সাইলেন্সার লাগানো কেন ? আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম। গপুবাবু বলেছিলেন, কখন কোন জানোয়ার মারতে হয়, বুঝলেন কি না স্যার, শব্দ-টব্দ হলেই ঝামেলি। তাই সঙ্গে-সঙ্গে রাকি।

জানোয়ার মানে মানুষ ! মানে জানোয়ারের মতো মানুষ।

ঝোলায় আরও থাকে জিন-এর একটি বোতল। জিন-এর ভারি ভক্ত গপুবাবু। হয়তো জিন-পরীদেরও। তারপর ধীর পায়ে হাঁটতে থাকেন জঙ্গলের ভিতরে-ভিতরে।

তাঁর হাঁটার ভঙ্গিটিও অননুকরণীয়। সামনে একটু বেঁকে, বাঁদিকে একটু হেলে, সামান্য মুখবিকৃতি করে সমান পদক্ষেপে হাঁটেন। তিতিরকে তাড়া করে যাওয়ার সময়েও ওঁর যেমন গতিবেগ, ওঁকে বাঘে বা ভালুকে তাড়া করলেও সমানই। বিন্দুমাত্র তারতম্য হয় না। 'উত্তেজনা' 'উৎকণ্ঠা' এই সব শব্দ ওঁর অভিধানেই নেই।

একবার আমারই সামনে ওঁকে ভালুকে তাড়া করেছিল বলেই জানি।

মাথায় জাপান থেকে নিয়ে-আসা জাপানী গল্ফ-ক্যাপ। মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে দূরবীন দিয়ে এদিক-ওদিক দেখেন। তারপর এগোন। আর তাঁর পেছন-পেছন হাঁটে, এই দশগজ মতো দূরে ; আসোয়া বা কাড়ুয়া। যে যখন থাকে। তাঁর কাঁধের ঝোলাটি কোলাপসিবল। গপুবাবু সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে কোনও মোরগা বা তিতির বা আসকল বা ময়ূর নিঃশব্দে ধড়কে দিলেই আসোয়া ক্যাসাবিয়াঙ্কার মতো বা ল্যাব্রাডর গান ডগ-এরই মতো তা "রিট্রিভ" করে বা কুড়িয়ে নিয়ে ঝোলায় ভরবে। তারপর জঙ্গলে-জঙ্গলে শর্টকার্ট করে সোজা চলে আসবে হারহাদ্-এর বাংলোর বাবুর্চিখানায়। যেখানে মহম্মদ করিম, মহম্মদ রহিম এবং বিটকেল বোস মিলে লুঙি, পাজামা আর হাত-কাটা গেঞ্জি পরে তার যোগ্য সমাদর করবেন।

সুপুরি থাকবে হাতের কাছে, ভাঙা ক্রকারির টুকরো, ভাঙা কাপ-ডিস হলেও চলবে, পেঁপে, আদা, গরমমশলা, কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা ইত্যাদি ইত্যাদি। কাঠকয়লার ধিকি ধিকি আগুনে এবং বেশি আঁচের কাঠের উনুনে রান্না হবে কত না পদ ! জাফরান্ দেওয়া উম্‌দা মহক-ছড়ানো হলদে পুলাউ, হাজারীবাগ থেকে আনা খাসির মাংস, রইতা, মোরগা-মোরের বা তিত্বরের কাবাব, যখন যা পাওয়া যাবে। কখনও বা থাকবে, পটনা থেকে আনানো বাখরখানি রোটি।

যখন এইসব "বন্‌তে" থাকবে বাংলোর বাওয়ার্চিখানায় তখন গপুবাবু জঙ্গলের মধ্যে কোনও হঠাৎ বাঁক-নেওয়া পাহাড়ী ঝর্ণার অফফ্-হোয়াইট-রঙা বালিতে, ছায়াচ্ছন্ন জায়গা দেখে, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে, থলে থেকে বেলজিয়ান কাটগ্লাস-এর গ্লাস বের করে জিন-এর সঙ্গে জল মিশিয়ে নিজে নেবেন। এবং আমাকেও দেবেন।

তার আগে জঙ্গল থেকে কোনও তিক্ত, অথবা কষায়, অথবা কটু, অথবা মিষ্ট ফল কেটে নেবেন রেমিংটনের ছুরি দিয়ে। তারপর সেই ফলের রস মিশিয়ে নেবেন জিন্-এর সঙ্গে। জুতো খুলে, মোজা থেকে জোড়া পা ছাড়িয়ে নিয়ে, প্যান্ট তুলে, বহতা স্বচ্ছ জলের মধ্যে পা ডোবাবেন। পাহাড়ি ছোট মাছ এক ঝটকাতে জলের মধ্যে মোচড় দিতেই

ডালপালার মধ্যে দিয়ে এসে জলের মধ্যে-পড়া সকালের রোদ কাচের বাসনের মতোই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু নিঃশব্দে প্রতিসরিত জলজ আলো হঠাৎ ঝাঁপিয়ে যাবে নদীর দু'দিকের ঝুঁকে-পড়া গাছ-গাছালির পাতায়-পাতায়, জায়ান্ট স্কুইরেলের মতো।

গপুবাবু জিন্-এ চুমুক দিতে দিতে বলবেন, ভারি শান্ত এই ভাদ্রর সকালটি। কী বলেন অর্যমা স্যার!

আমি তাকিয়ে থাকব, কথা না বলে, গপু সেনের রোদে-জলে চাঁদে হাওয়ায় শীতে-গ্রীষ্মে ভাজা-ভাজা ওরিজিনাল মুখটির দিকে ; খড়্গর মতো নাকটির দিকে। আর আমাদের চারদিকে, নদীতে, জলে, বালিতে, লালধুলোর পথে, পাহাড়ে, গাছে, পাথরে, পাখিতে, প্রজাপতিতে, নীলরঙা কাচপোকাতে জীবন চমকে-চমকে উঠে, স্বপ্নে-দেখা কোনোদেশের নাগরদোলার মতো ধীরে, অতি ধীরে, চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে। হাওয়া এলোমেলো করে দেবে গপু সেনের মাথার চুল। বনের গভীর থেকে কপারস্মিথ পাখি ডাকবে টাকু-টাকু-টাকু করে। অন্য বন থেকে সাড়া দেবে তার দোসর।

কী যে গভীর শান্তি, কী যে গভীর ভাললাগা এই বনের গভীরে! কী বলব। ইচ্ছে হয়, সকলকেই ক্ষমা করে দিই। থ্যাঙ্কস টু গপুবাবু।

আমিও জিন-এ চুমুক দিতে-দিতে ভাবি, আঃ কী চমৎকার ভাবে বেঁচে আছি!

নিজেকে এই ফুরিয়ে দেওয়ারও আরেক নামও তো জীবনই।

তাই নয়?

ইতি—

অর্যমা

শ্রীঅর্যমা রায়
দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ, বিহার

নিউ দিল্লি

মাস্টারমশাই,

গপু সেনের কথা আরও লিখবেন। ওঁর পুরো নাম। এমন মানুষ আজকাল সত্যিই কমে যাচ্ছেন।

দিল্লি শহরটা বড়ই ম্যাটেরিয়ালিস্টিক, ধুলো, ধুঁয়ো, ঘড়ঘড় শব্দের হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতাকে ধরে ফেলবে। আমি তো একা মানুষ। মায়ের টানেই বছরে একবার করে যাই এখনও কলকাতায়। মা চলে গেলে কলকাতার পাটও উঠে যাবে। তখন আমার টাকার প্রয়োজনও কমে যাবে। সেই সময়ে আমার জন্যে আপনার হাজারীবাগের ধারেকাছে একটি চাকরি জোগাড় করে দেবেন?

কিছুদিন হল মনটা ভারী উচাটন হয়েছে। পাগল-পাগল লাগে একটু শান্ত নির্জন

গাছ-গাছালি ভরা নিরিবিলি জায়গার জন্যে। দিল্লিতে অগণ্য পার্ক অবশ্যই আছে। বড়-বড় গাছ। সুন্দর হাঁটার পথ। কিন্তু সেগুলিকে মরুভূমির মধ্যের ওয়েসিস বলেই মনে হয়। ভেতরের শ্যামলিমা মনে করিয়ে দেয় দিল্লি শহরের বহিরঙ্গের দুর্মর ঊষরতার কথা, পুরনো দিল্লির কথা। এই ঊষরতা, অধিকাংশ উত্তর ভারতীয়র অন্তরেও। দিল্লিতে বাড়ি-জমি কিনি সে সামর্থ্য কি আমার আছে? না, হবে কখনও? এ শহরের হাওয়াতে লোভ-এর কণা ওড়ে ধূলিকণারই মতো।

বাঙালীদের যতই সমালোচনা করি না কেন কিছু-কিছু ব্যাপারে বাঙালীর এখনও কোনও বিকল্প নেই। এই বাঙালিয়ানা, বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলার মতো নয়। মুসুর ডালে কালোজিরে কাঁচালঙ্কা সম্বার দেওয়ার গন্ধের সঙ্গে, সরস্বতী পুজোর দিন সকালে বাসন্তী-রঙা শাড়ি পরার সঙ্গে, দোলের দিনে ঘরে-ঘরে ভাল গান ও আবীর খেলার সঙ্গে, বিজয়ার দিনের প্রণাম ও মিষ্টি বিতরণের সঙ্গে, কালীপুজোর রাতে লুচি মাংস খাওয়ার সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথকে Mentor করার সঙ্গে এই বাঙালিয়ানা ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে আছে।

অবশ্য একটা মস্ত বড় দুর্যোগের কথা মানি। আর্থিক অবস্থার অবনতির সঙ্গে-সঙ্গে অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালীই ভিন্নরুচির হয়ে যাচ্ছেন। আর যাঁদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, তাঁরাও ইঙ্গ-বঙ্গ হয়ে যাচ্ছেন। এই দুর্যোগ বড় কম ভয়াবহ নয়। এর কোনো আশু প্রতিকারের কোনো সম্ভাবনাও দেখতে পাচ্ছি না।

জানি না, বাঙলার গ্রাম হয়তো আপনার হাজারীবাগের চেয়েও সুন্দর। আপনার কুসমভা বেড়ানোর বর্ণনা শুনে ওইরকমই কোনও গ্রামে বাকি জীবন থেকে যেতে ইচ্ছে। রাশ্যান দৃষ্টান্তের "খোলখোজ" হয়নি, জমি সেই এখনও টুকরো টুকরো ভাবেই চাষ হচ্ছে। যৌথভাবে কোনও কিছুই করাটা যে বাঙালী চরিত্রানুগ নয়, তা কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, এমনকি সামান্য পারিবারিক দোকানদারীর মতো সব ক্ষেত্রেও আমরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছি।

কী করব মাস্টারমশাই! বাঙালী বলেই এখনও যে বাংলাকে, দুই বাংলাকেই ভালোবাসি। এই ভালোবাসাটা কি অন্যায়? আমাদের সামনেই যখন মানুষে পশ্চিমবঙ্গ আর কলকাতা আর বাঙালীদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে, তখন কি তা শুনতে ভালো লাগে? আপনিই বলুন! এখনতো দেখছি একমাত্র গর্ব করা যায় বাংলাদেশকে নিয়ে। যেখানে বাংলা রাষ্ট্রভাষা। বাংলা ভাষা, বাংলা গান, বাংলা সাহিত্য যেখানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এ সব জেনেও ভালো লাগে।

আমাদের নেতারা আর পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালীরা এ কোন মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন এখনও তা জানিনা। এই দুর্মতির কোনোরকম ব্যাখ্যাই খুঁজে পাইনা।

আমি এই দিল্লিতে বসে, রাগে অভিমানে ক্ষোভে ছটফট করি, হাত কামড়াই, আর কলকাতায় বসে, কলকাতার বাঙালীরা... ?

ইতি—

যোজনগন্ধা

পুনশ্চ :

আগে লেখা একটি চিঠি আজ পেলাম। আশ্চর্য! পোস্ট করতে কি ভুলে গেছিলেন? আপনি কত সহজে পুরোনো দিনের ভালোলাগার কথা আমাকে লিখে ফেলেন!

হ্যাঁ। কষ্ট তো চিরদিন পুরুষদেরই!

কষ্ট বুঝি আপনারই ছিল শুধু! আমার কিছুই ছিল না?

তবে আপনার ঐ চিঠি পড়তে-পড়তে ভাবছিলাম যে, প্রত্যেকেরই জীবনে বোধহয় কিছু কথা থাকে, যা বুকের মধ্যে জমিয়ে রাখাই ভালো। যে-কথা বলা হয় না, বলা যায় না, সেই কথাই সবচেয়ে দামী!

আপনিই যে আমার প্রিয় লেখক এবং আপনি যে আপনিই! তা মনে মনে নিশ্চিতভাবে জানার পর থেকেই তো আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সিনিবালির কাছেই প্রথমে জানি যে, হাজারীবাগে আছেন। আমার অফিসের এক কলিগের ভাইকে বলেছিলাম খোঁজ করতে। সে হাজারীবাগে এসেছিল মামাবাড়িতে বেড়াতে। কিন্তু সে ফিরে এসে বলল, ব্রাহ্মসমাজ কম্পাউন্ডে শ্রীঅমল সেনগুপ্ত বলে একজন লেখক আছেন, খোঁজ নিয়ে এসেছে। কিন্তু অর্যমা রায় নামে কোনও লেখক হাজারীবাগে থাকেন না।

আসলে ওর মামারা বহুদিন বিহারে। ওঁদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যর যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন হয়ে এসেছে। দোষ দিইনা। কলকাতারই বা ক'জন বাঙালি এখন সেই যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন রেখেছেন!

আপনাকে কোডারমা স্টেশনে দেখে যে কী আনন্দ হয়েছিল তা কী বলব! ভেবেছিলাম, হয়ত হাজারীবাগে নয়, কোডারমাতেই থাকেন। থুড়ি, ঝুমরী তিলাইয়া।

আপনার জন্যে, আমাদের বাড়ির সামনে সেই কদমগাছের ছায়াচ্ছন্ন বর্ষার দুপুরে আমার বুকে যা ছিল, তা আজও জমা আছে। নিটোল, না-গড়ানো নির্মল অশ্রু-বিন্দুর মতো। আপনি আমার কথা বলেছেন বলেই আমার কথাও আপনাকে জানানো দরকার।

আমি গর্বিত! আহ্লাদিত!

ইতি—
যোজনগন্ধা

চেতলা
কলকাতা

শ্রীঅর্যমা রায়,
দ্যা জ্যাকারাণ্ডা,
হাজারীবাগ, সার্কিট হাউস এরীয়া,

লেখকমশাই,

আপনি আমাদের পরমহংসদেব রোডের বাড়িতে যে এক ঘন্টার জন্যও এসেছিলেন, সিনিবালির রান্না খিচুড়ি খেয়েছিলেন, তাতে আমরা ধন্য হয়ে গেছি। কিন্তু খিচুড়ি ব্যাপারটাই আমার দু'চোখের বিষ। সিনিবালির খুব দুঃখ রয়ে গেছে যে, সেদিন মটরডালের খিচুড়ি রেঁধেছিল অথচ জানা গেল যে মুসুর কিংবা মুগের ডালের খিচুড়িই

আপনার পছন্দ।

আপনি তো আগে জানিয়ে আসেননি। আমরা খুশি হতাম, তাই এলে।

মধ্যবিত্তের বাড়িতে কোনো আগন্তুক এলেই আগে থাকতে না জানলে গৃহস্থকে অপ্রস্তুতে তো পড়তে হয়ই। যেমন, সেদিন বেডকভারটা পর্যন্ত বদলানো হয়নি। অথচ প্রতি রবিবারই বদলানো হয়। সেইদিনই হয়নি। আমাদের কপাল। যেমন, বিকেলে চান করে উঠে পাট-ভাঙা শাড়িও পড়া হয়নি। চানই করা হয়নি। ভীষণ অসময়ে এসেছিলেন আপনি। কী লজ্জা! ভবিষ্যতে বলে আসবেন।

সিনিবালি রান্নাঘরে ছিল। ছুটির দিন। গরমে বেচারী ঘেমে-নেয়ে ওঠে রান্নাঘরে। ওর আবার একটু শুচিবায় আছে। বাথরুমে একফোঁটা জল পড়ে থাকলে হুলস্থুলু কাণ্ড বাঁধিয়ে দেয়। আমি আবার প্রচুর জলটল না ঢেলে চান করতে পারি না। নইলে তো কবে বিলেতেই চলে যেতাম। আমার তিন বন্ধু ওখানে গিয়ে সেটল করেছে। দু'জন আবার সাহেবও বিয়ে করেছে। ওরা বলে, বিলেতে সুখের নাকি শেষ নেই। পুরুষেরা মেয়েদের দেবীর মতো দেখে। মালক্ষ্মীর মতো ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে। কিন্তু ওই একটিই নাকি অসুবিধে। বাথরুমে একফোঁটা জল ফেললে চলবে না। কমোডের উপরে গরম কাপড়ের কাভার। বাথটাবে এত সাবধানে চান করতে হবে যে, চান করার সব মজাই চলে যাবে। তারপর আবার নিজেই বাথটাব পরিষ্কার করে দিতে হবে। একটুও ময়লা বা সাবানের ফেনা বা চুলটুল পড়ে যেন না থাকে তাতে।

আমি তো এই ভয়েই বিলেতে গেলুম না। এত পুতুপুতু করে, এত সাবধানে, এত কষ্টে মানুষে বাঁচে।? ইচ্ছেমতো চান পর্যন্ত করা যাবে না! কী জ্বালা বলুন তো! মাথায় থাক আমার বিলিতি আরাম-বিরাম সব।

আপনি কি বিলেতে গেছেন কখনও?

মেয়েদের হস্‌টেলের মধুমন্তী, শিখা, কাজলী ও কমলিকা সকলে যে কী খুশিই হয়েছে তা কী বলব। আমাদের খাতির ও প্রতিপত্তি বেড়ে গেছে এ পাড়ায়। মোড়ের মনোহারী দোকানের মধুদা পর্যন্ত বিশেষ খাতির করছেন। উনি চেতলা লাইব্রেরি থেকে আপনার সব বইই এনে পড়েন।

এই তো কালকেই শিখারা পাটিসাপটা করে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। সঙ্গে কড়াইশুঁটির চপ। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার সুবাদে। মধুমন্তী, আপনার "বিকেলবেলার আলো" বইটির সই করা কপি চেয়েছে। পরের বার যদি নিয়ে আসেন তাহলে খুব কৃতজ্ঞ থাকব। আমিও কিনে রাখতে পারি। আপনি শুধু সইটা করে দেবেন। আমার এক পিসতুতো বোনকে মধুমন্তী ফুড ডিপার্টে চাকরি করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরি। কাজ বলতে তেমন কিছু নেই। অনেকটা কলকাতা করপোরেশনের চাকরিরই মতো। তবে সরকারের মাইনে তো ভালো! মাঝে-মাঝে মীটিং-মিছিলে গেলেই চলে। আর ভোটের সময় ভোটটা দেওয়া। করপোরেশনের কর্মচারীদের মতো কোট বা কার্ডিগান চেয়ারে ঝুলিয়ে রেখে দুপুরে অন্য কাজ বা ব্যবসাও করা যায় স্বচ্ছন্দে।

যাই বলুন আর তাই বলুন। আমাদের কলকাতায় অসুবিধে অনেক যদিও তবে সুবিধেও কিছু কম নেই।

চিঠির উত্তর দেবেন।

যাই হোক, এবারে যেন না বলেকয়ে হুট্ করে এসে আমাদের অপ্রস্তুত করবেন না! একটু সাজতেগুজতেও তো দেবেন।

বড্ডই বেরসিক লোক আপনি মশাই !

ইতি—
ইলবিলা

পুঃ—সিনিবালি কাগজে চিঠি লেখে না।

ওর চিঠি লেখার কায়দাটি অন্যরকম। খাবার টেবিলে সানমাইকার উপরে আঙুলকে কলম করে আর জলকে কালি করে অনেক চিঠি লেখে আপনাকে। ও নিজেই লেখে। নিজেই পড়ে। পরে আবার মুছেও দেয়। আমরা জানতেও পারি না কী লেখে।

বড় চাপা মেয়ে ও। চিরদিনই !

ইতি—
ইলবিলা

নিউ দিল্লি

অর্যমা রায়
দ্যা জ্যাকারাণ্ডা, হাজারীবাগ

মাস্টারমশাই,

খুব তাড়াতাড়ি লিখছি।

আমি সিনিবালি এবং ইলবিলা এবার পুজোর সময়ে আপনার কাছে যাচ্ছি। আমি চারদিনের বেশি থাকতে পারব না কিন্তু। ইসস্ ! এখনও কত দিন বাকি !

ওদের অবশ্য অঢেল ছুটি। কিন্তু আমার নেই। তাছাড়া, কোনো অচেনা জায়গাতেই প্রথমবারে বেশিদিন থাকার ঝুঁকি নিই না। কারণ, যদি জায়গাটি পছন্দ না হয় ! ওরা বলেছে, আমি না থাকলে ওরাও একই সঙ্গে চলে আসবে।

হাজারীবাগ সম্বন্ধে আপনার চিঠি পড়ে যে ধারণা হয়েছে তাতে সে জায়গাকে অপছন্দ হবার কোনোই কারণ নেই যদিও তবুও প্রথমবার দেখে, পরে বেশিদিন গিয়ে থাকব।

দিল্লি থেকে সোজা আসব ডিলাক্স-এ কোডারমা। সিনিবালি আর ইলবিলা কলকাতা থেকে বেরিয়ে দুর্গাপুরে ইলবিলার এক আত্মীয়র বাড়িতে একরাত থেকে পরদিন আমি গিয়ে পৌঁছবার আগেই বা কিছু পরে কোনো কনভিনিয়েন্ট ট্রেনে গিয়ে পৌঁছবে কোডারমাতে। পরে, আমি আপনাকে সঠিক তারিখ, সময় ও দুটি গাড়ির, (আপ ও ডাউনের) নাম জানাব যাতে আপনার স্টেশনে বেশিক্ষণ বসে থাকতে না হয় আমাদের অপেক্ষাতে।

সব ইনফরমেশন দিয়ে আবারও সময়মতো লিখব।

ইতি—
যোজনগন্ধা

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
নিউ দিল্লি

দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

কল্যাণীয়াসু,

চিঠি পেয়ে খুবই খুশি হলাম।

এলে ধন্য হব।

সময়মতো তোমাদের আসার দিন ও ট্রেনের হদিস পেলে অবশ্যই স্টেশানে হাজির থাকব গাড়ি নিয়ে। এখানে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা যতখানি আরামদায়ক করা যায় তাও করার চেষ্টা করব। অবশ্য বোঝোই তো ! Bachelor's den-এ অসুবিধা অনেকরকমই হবে। তবে ভরসার কথা এইটুকু যে যাঁরা আসবেন তাঁরাও সকলে De Facto spinster!

অসুবিধে হলে মানিয়ে নিও। কী করা যাবে।

এসো, আমি পথ চেয়ে থাকব।

—অর্যমা

শ্রীঅর্যমা রায়
দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ, বিহার

নিউ দিল্লি

অর্যমাদা,

অন্য কথা বলার আগে বলি আপনার সংক্ষিপ্ত চিঠি, হাজারীবাগ যাওয়ার ব্যাপারে ; পেয়েছি।

চিঠি দিতে অনেকেই দেরি হল এবারে। কারণ, আমার মা চলে গেলেন।

রাত বারোটাতে ফোন পেয়ে, যাতে মাকে দেখতে পাই সে জন্যে সকালের ফ্লাইটে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম।

নির্জন, স্টেটস্-এর মিলওকি থেকে আসতে পারল না। ওর নাকি এমনই কাজ পড়েছে যে, আসা সম্ভব নয়। ফোনে কথা বলেছিল আমার সঙ্গে। দিদি তো কেঁদেকেটে একসা। আসলে, কলকাতাতে তো দিদিই থাকত। আমি চলে আসার পর ও-ই

জড়িয়ে-মড়িয়ে থাকত। মায়ের দেখা শুনো করতো। তা ছাড়া, বড় সন্তান যে, তার সঙ্গে অনেক স্মৃতি, পুরনো অনুষঙ্গ মা-বাবা ভাগ করে নেন। ছোটদের সঙ্গে সেটা তো হয় না বিশেষ। মায়ের অন্ধের যষ্টি ছিল সে। আমি অনেকবার দিল্লিতে আসতে বলেছিলাম, মা রাজী হননি। হাঁদামামার স্মৃতি ছেড়ে যেতে চাননি হয়তো। যে কাছে থাকে, সেই বোধহয় কাছের হয়ে ওঠে। যদিও সবসময় নয়।

যা করবার তা তো শৌনকদাই করলেন। এখনও এদেশে কিন্তু পুরুষও নারীতে অনেকই তফাত আছে এবং এই সত্যটি অত্যন্ত দুঃখবহ হলেও আরও বহুদিন এমনটিই থাকবে বলে মনে হয়। শৌনকদা না থাকলে আমার আর দিদির সত্যিই খুব অসুবিধে হত। আবার শৌনকদা পার্টি করেন বলেও নানাবিধ সুবিধে হয়েছিল। পার্টি করার লাভ সম্বন্ধে একটু ধারণাও হল।

মায়ের দেহ যখন ইলেকট্রিক চুল্লিতে পুড়ছিল তখন শ্মশানে বসে বসে নানা কথা ভাবছিলাম। জন্মাবধি কত স্মৃতি, কত সুখ-দুঃখের ঘটনা, কত মান-অভিমানের কথাই-না মনে আসছিল। কত বছরের অনুষঙ্গ। মা তো মা-ই। মা-বাবার তো কোনও বিকল্প নেই। তাঁরা যে বড় গাছেরই মতো। আমাকে কত ছায়া, কত সান্ত্বনা, কত শাসন, কত প্রশ্রয়, কত উষ্ণতা দিয়ে এতো বছর মুড়ে রেখেছিলেন!

নির্জনটা আসতে পারল না, বা এল না বলে বড় দুঃখ হল। মার মুখাগ্নি পর্যন্ত করতে এল না ও। ফোনে বলল, ছোড়দি, যা হবার তা তো হয়েই গেছে মিছিমিছি...

কত টাকা পাঠাব বল?

বললাম, তুই ওখানেই শ্রাদ্ধ করিস। মেয়েদের কাজ তো তিনদিনে হয়। আমি আর দিদি এখানেই করে নেব। আমাদের কাজের জন্যে তোকে টাকা পাঠাতে হবে না।

ও বলল, ওক্কে। মায়ের একটা ফোটো পাঠাস। হলুদের ছোপ-লাগা লাল-পেড়ে শাড়ি-পরা যে ফোটোটি আছে সেটি তো ভদ্রসমাজে বের করা যায় না। তুই অন্য একটি ফোটো পাঠালে, এনলার্জ করে তারপর বন্ধুবান্ধবদের ডেকে একদিন খাইয়ে দেব'খন। তুই কবে আসছিস এদিকে? চলে আয়। অ্যামেরিকা না দেখলে তোর জীবনই অসার্থক।

জানেন, ও কিন্তু এরকম ছিল না। একেবারেই নয়। উচ্চশিক্ষা যে, সকলকেই উচ্চতা দেয়, তা নয়।

বললাম, আমার যাওয়ার সম্ভাবনা এক্ষুনি নেই। পারলে বরং দিদিকে নিয়ে যাস একবার। খুশি হবে। দিদি তোকে খুব ভালবাসতো।

বাবাঃ, সে তো হোল ফ্যামিলি! দিদিটা তো ইংরিজিও বলতে পারে না। জুলিয়েটের সঙ্গে কথাবার্তাও বলতে পারবে না। শৌনকদাও তথৈবচ। আমার ইজ্জত ঢিলে হয়ে যাবে। তুই এলে, চলে আয়। চিঠি লিখিস বা ফোন করিস, সঙ্গে সঙ্গে Sponsorship পাঠিয়ে দেব। এনি-টাইম।

তোর স্পনসরশিপ পাঠাতে লাগবে না। আমার কত বন্ধু-বান্ধব থাকে পুরো স্টেটস জুড়ে। কানাডায়, ইংল্যান্ডে, ইয়ারোপে। আজকাল আমাদের নাদুবাবুর গলিতেও বিলেত-অ্যামেরিকা-ফ্রান্স-জামনী যায়নি, এমন লোক ক'জন আছেন তা আঙুলে গুনে বলা যাবে। আমার অ্যামেরিকা ভ্রমণের জন্যে তোর ভাবতে হবে না। অ্যামেরিকাতে যাইনি বটে তবে কাজে ইয়োরোপে ও আফ্রিকাতেও গেছি।

বলেছিলাম ওকে।

এই হল কথোপকথনের রকম, নির্জনের সঙ্গে।

আপনি কী বলবেন ?

মায়ের শ্রাদ্ধ যে করলাম তা আদৌ মনঃপূত হল না। পুরোহিত কী যে সব মন্ত্র বললেন তারও কিছুই বুঝলাম না।

না-বুঝে মন্ত্রোচ্চারণ করার মধ্যে এক ধরনের অশিক্ষা ও লজ্জা তো থাকেই ! এর চেয়ে বোধহয় ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধ করাটাই অনেক ভাল ছিল। গান হত ; স্মৃতিচারণ বাংলাতে। সংস্কৃতটা অবশ্যই ভাল করে শেখা উচিত ছিল।

কেমন আছেন আপনি ? দিনের পরে দিন চলে যাচ্ছে। দিল্লি কি একবার আসবেন না ? পারবেন না আসতে ?

ইতি—
যোজনগন্ধা

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
নিউ দিল্লি

দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা, কল্যাণীয়াসু,

ভোরে উঠে একটি বিশেষ কাজে সীমারীয়াতে গেছিলাম। বাড়ি ফিরেই তোমার চিঠি পেলাম।

কী বলব তোমাকে ! তোমার মাকে আমি অনেকদিন আগে দেখেছি, তবু তাঁর সেই শালীন, শান্ত চেহারাটি মনে আছে এখনও। তাঁকে, তাঁর আত্মাকে আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

তুমি নিজে হিন্দু হয়েও সংস্কৃত যেমন জানো না, তেমন বহু শিক্ষিত মুসলমানও আরবী-ফার্সী জানেন না।

তবে আমি তুমি সকলেই সংস্কৃত জানলে ভাল অবশ্যই হত। ফারসী ও সংস্কৃত না জানলে ভারতীয়ত্ব সম্পূর্ণতা পায় না। আমার অন্ততঃ তাই মত। তারপরে উর্দু ও হিন্দী। যার যার মাতৃভাষাতো জানতেই হবে !

তুমি হয়তো জানো যে, "শ্রাদ্ধ" কথাটি এসেছে "শ্রদ্ধা" থেকে। রবীন্দ্রনাথের "শান্তিনিকেতন" প্রবন্ধমালাতে "মাতৃশ্রাদ্ধ" শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বড় সুন্দর করে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বলেছেন। জানি না, তুমি পড়েছ কি-না ?

সংস্কৃতর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলেই হিন্দুধর্মর বাঁধনও আলগা হয়ে গেছে। "যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম।" এবং যে-কোনো ধর্মকেই বেঁধে রাখে কোনো না কোনো ভাষাই।

"বাবা-মাকে যদি প্রাকৃতিক দিক থেকেই দেখা সত্য হত, অর্থাৎ আমাদের জীবনের

প্রাকৃতিক কারণমাত্র যদি তাঁরা হতেন তাহলে "বাবা" বা "মা" সম্ভাষণকে আমরা ভুল করেও অনন্তের সঙ্গে জড়াতাম না। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা বাবা-মায়ের মধ্যে প্রাকৃতিক কারণের চেয়েও অনেক বড় জিনিসকে অনুভব করেছি। বাবা-মায়ের মধ্যে এমন কিছুর পরিচয় আমরা পেয়েছি যা অন্তহীন, যা চিরন্তন, যা বিশেষ কোনও বাবা-মায়ের সমস্ত প্রণিধানযোগ্য ব্যক্তিগত সীমানা ছাড়িয়ে, পেরিয়ে গেছে। বাবা-মায়ের মধ্যে আমরা এমন কিছু পেয়েছি যাতে দাঁড়িয়ে উঠে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারাকে যে শক্তি অনন্তকাল ধরে নিয়ন্ত্রিত করছেন, নিয়মিত করছেন, সেই পরম শক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠেছি : পিতা নোহসি— তুমি আমাদের পিতা।

শ্রাদ্ধদিনের ভিতরকার কথাটি হচ্ছে শ্রদ্ধা। আর শ্রদ্ধা শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস।"

আমার মনে হয়, মৃত্যুকে বিনাশ বলেই জানি আমরা আপাতদৃষ্টিতে, আপাতমননে, কিন্তু গভীরে গেলেই বুঝতে পাই যে, মৃত্যুও নিত্যরই অন্যতর রূপ।

তোমার মায়ের হলুদ-ছোপ-লাগা লাল-পেড়ে শাড়ি-পরা ফোটোটির একটি কপি যদি আমাকে পাঠাতে পারো, তাহলে খুশি হব। নির্জন কেন অন্য ছবি চেয়েছে তা জানি না। এই রূপই তো আমাদের প্রজন্মর মায়েদের চিরন্তন রূপ!

দুঃখ কোরো না। ভাল গান শোনো। ভাল বই পড়ো। কি করবে বলো! কারো মা-বাবাই তো চিরদিন থাকেন না।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি
অর্যমা

যোজনগন্ধা জোয়ারদার,
কারলবাগ, দিল্লি

দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা, কল্যাণীয়াসু,
আগের চিঠিটি কি পাওনি?

কিছুদিন আগে যে প্রশ্নটি তুমি করেছ তার উত্তর দেব দেব করে এতোদিন দেওয়া হয়নি। বর্তমানে তোমার মনের যে অবস্থা, মা চলে যাওয়াতে, তাতে ঐ প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিকও।

ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি কি না তা সঠিক বলতে পারি না। ঈশ্বরকে তো দেখিনি! কিন্তু আমি কোনও ধর্ম মানি না। কিন্তু যাঁরা মানেন, তাঁদের প্রতি আমার কোনো অসহিষ্ণুতা বা বিদ্বেষ নেই। কোনওরকম আচারও পালন করি না। কোনও দেব-দেবীও মানি না। কোনও এক বিশেষ শক্তিতে হয়তো বিশ্বাস করি। যাঁকে হয়তো ব্রাহ্মরা বলেন পরম-ব্রহ্ম। নিরাকার তিনি। তেমন কোনো শক্তিকেই আমার ঈশ্বর বলে মানি। তবে

"সাকারের" আরাধনা যাঁরা করেন তাঁদেরও খাটো করে দেখি না যে, তা আগেই বলেছি। কেন যে দেখি না, তাও তোমাকে কখনও বুঝিয়ে বলব !

আমার এই "ঈশ্বরে" কেন বিশ্বাস, একথা যদি শুধোও তা হলে তার কোনও যুক্তিসম্মত বা বিজ্ঞানসম্মত উত্তর হয়তো দিতে পারব না। ঈশ্বর-বোধ ব্যাপারটা বিজ্ঞানসম্মত বা যুক্তিসম্মত নয়ও হয়তো। কিন্তু বিজ্ঞানের ভূমিকা আধুনিক বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিজ্ঞানই তো আর শেষ কথা নয় ! আমার মতে, নয় ! একটা দিন আসছে যখন পৃথিবীর সব মননশীল মানুষই এই কথা বুঝবেন। বিজ্ঞান, মানুষের ভাল যেমন করেছে, ক্ষতিও কম করেনি।

আমার মতো পরম মূর্খরও ; তোমারই অভিব্যক্তিতে বলি, "আরকেটাইপাল" বা "প্রোটোটাইপ" না-হবার অধিকার আছে। অধিকার থাকা উচিত অন্ততঃ। তাই তার নিজস্ব মতামতও মার্জনীয় তো বটেই ; প্রণিধানযোগ্যও।

এইসব সারগর্ভ বিষয়ের আরও গভীরে যাওয়ার আগে তোমাকে একটি কবিতা শোনাই। যদি বলতে পারো কার কবিতা তবে যা চাইবে তা-ই দেব। কবিতার নাম "শীর্ষাসন"।

"যতক্ষণ শ্বাস রয়েছে-ততক্ষণই আশ
এই আসে তো এই ভেঙে যায় ঈশ্বরে বিশ্বাস ॥
ততক্ষণই কলঙ্কভয়, মুখে ঝ্যাঁটার বাড়ি
যতক্ষণ না সবার সামনে ন্যাংটো হতে পারি ॥
আকাশমুখো কুত্তা আমার ঘেউ ঘেউ ঘেউ ডাকে
সুযোগ পেলেই কামড়ে দেবে ঈশ্বর আল্লাকে ॥
কামড়ে দিলেই মজার ব্যাপার, কেউ নেই কোথাও
ক্রুশের থেকে নেমে ক্রাইস্ট, বলেন, 'বেটা আও' ॥"

বলতে পারো ? কোথায় পড়েছ ? কার লেখা ?

"যতক্ষণ শ্বাস রয়েছে ততক্ষণই ত্রাস
এই ছিলো না, এই এসে যায়, ভূত প্রেতে বিশ্বাস ॥
পিদিম জ্বলে, পিদিম চলে, পিদ্দিমে চক্কর
গুটগুটিয়ে ঘুরে বেড়াই ছোট্ট দিগম্বর ॥'

ভাল না ?

জয় গোস্বামীর কবিতা।

এবারে ঈশ্বর বা কোনো সুপার পাওয়ারে কেন বিশ্বাস করি সেই কথাতেই ফিরে আসি।

রবীন্দ্রনাথ তো আমার তোমার চেয়ে ছোট মাপের মানুষ ছিলেন না যোজনগন্ধা। ছিলেন না টলস্টয়ও। তাঁদেরও তো গভীর ঈশ্বরবিশ্বাস ছিল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী "পথের কবি"তে জীবনীকার শ্রীকিশলয় ঠাকুর উল্লেখ করেছিলেন যে, উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল-এ ওঁর একজন অনুরাগী পাঠিকাকে সঙ্গে নিয়ে বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট ডেভিড মীড-এর বক্তৃতা শুনতে গেছিলেন। বক্তৃতা ছিল, নীহারিকা পুঞ্জ সম্বন্ধে। উনি বলেছিলেন, "আলটিমেট রিলেসানস অফ দ্যা ইউনিভার্স আর অ্যাট প্রেজেন্ট কোয়াইট বিয়ন্ড দ্যা রীচ অব সায়ান্স অ্যান্ড প্রোবাবলি আর

ফর এভার বিয়ন্ড দ্যা কমপ্রিহেনশন অফ দ্যা হিউম্যান মাইন্ড।"

ওই বক্তৃতা শুনে বিভূতিভূষণ সঙ্গীকে বললেন : "শোনো সুপ্রভা, বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে পরমসত্যকে অস্বীকার করতে চায় বাতুলেরা। ওদের বলতে চাই কথাটা। আমিও বোঝাতে পারি না, ওরাও বুঝতে চায় না। এলে আজ শুনতে পেত ওরা।"

"ওরা বলতে সাহিত্যিক-বন্ধুদের কথাই বলছিলেন উনি।" (শ্রীকিশলয় ঠাকুরের উক্তি।)

পাকিস্তানের নোবল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিদ আবদুস সালাম সাহেবের সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল পাইকপাড়ার রাজবাড়ির বিকাশ ও দেবযানী সিংহর বাড়িতে। বিখ্যাত পদার্থবিদ বিকাশ ওঁর ছাত্র ছিলেন বিদেশে। সালাম সাহেবের গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা তখনই জানি।

বেশ কিছুদিন আগে 'দেশ' সাপ্তাহিকে শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখা কয়েকটি চিঠি বেরিয়েছিল। চিঠির প্রাপকের নাম, সম্ভবত ছিল না সেই চিঠিগুলোতে। ঠিক মনেও নেই। বেশ কিছুদিন আগের কথা। তিনি লিখেছিলেন :

"যাঁরা আমাদের চেয়ে সব বিষয়েই বড়, তাঁরা সকলেই ঈশ্বর এবং মঙ্গল এক করে উপলব্ধি করেছেন।..."

আসলে নির্জনবাস ও জনতার ভিতর বাস করার মধ্যে অভিজ্ঞতার পথের আসমান-জমিন তফাৎ থাকে। আপনি ঠিকই লিখেছিলেন, নির্জনতা কখনও আমাদের শূন্য হাতে ফিরায় না।

লেখাপড়া, ছবি, সবই নির্জনতার অবদান।

কলেজে আমার এক বড়লোক বন্ধু ছিল। তার কথা কি বলেছি তোমাকে? ওর নাম ছিল আরুণি। সেও তোমার কৃপরই মতো হঠাৎই মোটর অ্যাকসিডেন্টে চলে গেছিল। গ্রান্ডট্যাঙ্ক রোড আর বগোদরের মোড়ে কয়লা ভর্তি ট্রাক এসে ওর সাদা-রঙা সানবীম্-ট্যালবট স্পোর্টস কারকে শুঁড়ো করে দিয়েছিল। হাজারীবাগ থেকেই সে ফিরছিল কলকাতায়।

সে সব অনেকদিন আগের কথা। সে কথা এখন থাক। যা বলছিলাম, বলি। আরুণি ওর মামার জঙ্গলের বাংলোতে একবার শিকারে যাচ্ছিল। ইটখোরি হয়ে পিতিজ-এ। যে 'পিতিজ'-এ গপুবাবু আমাকে সেদিন নিয়ে গেছিলেন।

আমিও ওর সঙ্গে জুটে গেলাম। শিকারে নয়। জন্মে বন্দুকে হাত দিইনি। বকও মারিনি। জঙ্গল দেখব বলেই গেছিলাম। মারামারির কোনওরকম ইচ্ছেও কোনওদিন জাগেনি মনে।

আরুণি ছিল, যাকে বলা চলে, পরস্পর-বিরোধিতার জাজ্বল্যমান সংজ্ঞা। ঠিক এ ধরনের মানুষ আর একজনও দেখলাম না। ওর বিভিন্ন সত্তার সঙ্গে অন্যান্য সত্তার বিরোধ ছিল তীব্র কিন্তু প্রতিটি সত্তাই নিজ নিজ ঔজ্জ্বল্য ও দ্যুতিতে পরম দীপ্তিমান ছিল।

ডিসেম্বর মাস। মাচার উপরে আমি আরুণির সঙ্গে বসে আছি। প্রচণ্ড শীত। নিচে পাঁঠা বাঁধা আছে। চিতা বাঘ আসবে, এই আশা। নিচের শিশিরভেজা ঝোপ-ঝাড়ে প্যাখিরা নড়ে-চড়ে বসছে। জংলি ইঁদুর সড়সড় করে চলাফেরা করছে। উপরে কৃষ্ণা নবমীর আকাশ। নক্ষত্রখচিত। নির্জনতা। কী নির্জনতা!

সত্যিই, "কনটেমপ্লেশন্"-এরই পরিবেশ।

একজন সামান্য মানুষের মনেও যে কতরকমের শুভ চিন্তা, গভীর চিন্তা আসে অমন

নির্জনে ! আমি তো আর শিকার করতে যাইনি। মাফলারে মাথা-কান ঢেকে, আকাশের দিকে চেয়ে বসে ছিলাম। এমন সময়ে হঠাৎ একটি তারা খসে গেল। মানে, shooting star। তারাটিকে দিগন্তরেখা অবধি চোখ দিয়ে অনুসরণ করলাম আমি। যেন দশতলা বাড়ির ছাদ থেকে দেখা কালীপুজোর রাতের একটি নীল হাউই !

আরুণিও দেখেছিল। কিন্তু তখন কথা বলা বারণ। তাই কথা কেউই বললাম না।

চিতা যখন এল না তখন রাত এগারোটা নাগাদ শীতের আর মশার প্রকোপ সহ্য করতে না পেরে আমরা গাছ থেকে নেমে, পাঁঠাটিকে খুলে নিয়ে, বাংলোর দিকে এগোলাম জঙ্গলের সুঁড়ি পথ দিয়ে।

পাঁঠার দড়িটা আর বন্দুকটা আমার হাতে দিয়ে ও পাইপটা ধরালো। ধরিয়ে, এক রাশ ধোঁয়া ছাড়ল আরুণি। মিষ্টি টোব্যাকের গন্ধে আমার নাক ভরে গেল।

আরুণি বলল, বুঝলি কিছু ?

বললাম, কি ?

তারা খসে যাওয়া দেখে ? বুঝলি না কিছু তুই অর্যমা ? বোকাইটা !

কি বুঝব ?

কিছুই বুঝলি না ? কোনও অনুভূতিই হল না তোর ?

হল। তবে সেটা যে কী, তা ঠিক বুঝিনি।

বলল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝলি না ? তুই কি রে ? আমার তো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সে আবার কী ! এর মধ্যে ঈশ্বর এলেন কোথা থেকে ?

আমাদের এই পৃথিবীর ভূমিকা এই ইউনিভার্সের মধ্যে কতটুকু ?

কিছুই নয়। মানে, অতি সামান্য।

আমাদের এই পৃথিবীতে তোর আমার ভূমিকা কতটুকু ?

কিছুই নয়।

আমি আবার বললাম।

হ্যাঁ ! আমাদের ভূমিকা ওই জংলি ইঁদুরদের বা রাতের বনে অন্ধকার ঝোপের মধ্যে বসে-থাকা পাখিদেরই মতো সামান্য। কতখানি যে সামান্য, তার কোনও ধারণাও কি তুই করতে পারিস ?

বুঝতে পারি একটু একটু।

তবেই বোঝ, আজ এই শীতের সন্ধ্যেবেলাতে যে তারাটি খসে গেল সে যে এই পৃথিবী থেকে কত হাজার বা লক্ষগুণ বড় সে খোঁজটুকুও আমাদের করার মতো ঔৎসুক্য হল না। অবশ্য তা জানার মতো জ্ঞান বুদ্ধিও আমাদের নেই। সম্ভবত হবেও না কোনোদিন। কোনও-কোনও রাতে, যখন সারা রাত মাচায় বসে থাকি, তখন দেখি, একই রাতে পাঁচ-দশটি তারা খসে গেল। এই যে এত বড় তারাটি আজ খসে গেল তার জন্য একটুও শোক হল না মহাবিশ্বে। গুঞ্জন পর্যন্ত উঠল না একটুও। আমাদের, মানে, পৃথিবীর এই মানুষদের প্রেক্ষিতে ওই অগণ্য গ্রহ, শশী, তারাকে করতলগত করে রাখা এই মহাবিশ্বের ভূমিকাটা, বিরাটত্বটা কি অনুমান করতে পারছিস তুই ?

আমি বললাম, সায়ান্সের ছেলেরা হয়তো পারবে। অবসার্ভেটরীতে যারা রোজ বসে বসে এই সব দেখে, তারাও হয়তো পারবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছাত্র যারা।

আরুণি বলল, আঃ ! তুমি সত্যিই একটা ইডিয়ট ! এটা জানার কথা নয়। অনুভূতির কথা। উপলব্ধির কথা। ঈশ্বরবোধের জন্যে তো অবসার্ভেটরীতে যেতে হয় না, সেই

বোধ তো থাকে বুকেরই মধ্যে। যাদের থাকে ; তাদের থাকে। তারা উচ্চকোটির যোনিসম্ভূত। যাদের থাকে না, তারা নেহাত মন্দভাগ্য। ঈশ্বরবোধ কাকে বলে তাই তো তারা এই জন্মে জানল না।

আরুণির কথাটা আমার যুক্তিনির্ভর মন যে পুরোপুরি মানল, তা নয়। তবে সেই দিন থেকে একা থাকলেই সেই খসে-যাওয়া তারাটি আমাকে আচ্ছন্ন করে থাকত। মনে-মনে ফিরে যেতাম সেই ঘন অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে, মাচার ওপরে। নানান চিন্তা আসত মাথাতে।

তারপর আরুণিই একদিন আমাকে বিবেকানন্দ পড়তে দিল। কী ধারালো, কী যুক্তিনির্ভর, কী বিজ্ঞানমনস্ক তাঁর লেখা ! যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে অনন্তকে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। পড়ে, মনে হয়েছে যে, এ পৃথিবীতে কোনও বৈজ্ঞানিকই কোনও কিছু "উদ্ভাবন" করতে আসেননি। যা কিছু হয়েছে এবং হবে, চাঁদে পা-দেওয়া থেকে বৃহস্পতিতে দোলনা-চড়া, এসবই শুধুমাত্র "আবিষ্কারের"ই ফল। সবই ছিল। এবং আছে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিকস্-এ সবকিছুই গুণান্বিত হয়ে এমন জায়গাতে পৌঁছবে একদিন, যেখানে পৌঁছনোর পর দেখা যাবে যে, উদ্ভাবনের, থুড়ি ; আবিষ্কারের আর কিছুই নেই।

এটা আমার কথা নয়, বিবেকানন্দরই কথা।

ঈশ্বরে অর্থাৎ, এক উচ্চতর শক্তিতে কেন যে বিশ্বাস করি তা তোমার হয়তো বিশ্বাস এত সহজে হবে না যোজনগন্ধা। হওয়া উচিতও নয়। নিজের বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়েই বিচার করে দেখবে।

অনেকের মতে, ঈশ্বরে বা সুপারপাওয়ারে বিশ্বাস করা যেমন এক ধরনের "অন্ধত্ব" ; আমার মতে তাতে অবিশ্বাসটাও অন্য ধরনের, হয়তো আরও বড় ধরনের অন্ধত্ব। যেহেতু অবিশ্বাসটাই আজকের দিনের ফ্যাশান, অনেক মানুষই শুধু "ফ্যাশনেবল" হওয়ার জন্যেই অবিশ্বাসী। সাধারণের, গড্ডালিকার ; ধর্মই এই। সবাই যা করে, তাই করা।' হিন্দীতে একেই বলে "ভেড়চাল"। তুমি বোধ হয় শব্দটা জানো।

ভালো থেকো।

আমার ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি—
অর্যমাদা

boiRboi.net

অর্যমা রায় নিউ দিল্লি
দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ

মাস্টারমশাই,

আপনার চিঠি পেলাম।

কালকে কনট-সার্কাসের আন্ডারগ্রাউন্ড এয়ারকন্ডিশানড্‌ও বাজার "পালিকা-বাজার"-এ গেছিলাম একটু কেনাকাটার জন্য।

একটি ফুলহাতা সোয়েটার দেখেই মনে হল যেন আপনার জন্যেই সেটা বানানো হয়েছে। হালকা ছাইরঙের উপরে বুক ও গলার কাছে এবং হাতের কব্জির কাছে মরচে-লাল আর কাঠ-কয়লা কালো রঙের কাজ। মাপেও মনে হল আপনার ঠিকই হবে। আপনার বুকের সঠিক মাপ তো আমি জানি না। যদিও হৃদয়ের মাপ জানি।

ক্যুরিয়ার সার্ভিসে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছি সিনিবালির কাছে। ও যে-করেই করে আপনাকে পাঠাবে। আমার উপহার যখন পাঠাবে ও তখন ওরাও নিশ্চয়ই ওদের তরফেও কিছু-না-কিছু পাঠাবেই আপনাকে। ভালই হল। উপহারের snow-balling effect হবে।

আপনার চিঠিতে শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কথা পড়ে ভারী ভাল লাগল। এমন-এমন লেখা পড়লে মনে হয়, আমরা ইংরিজি বাংলাতে অধিকাংশ লেখাই যা পড়ি, নানা ম্যাগাজিনে, দৈনিকে, পাক্ষিকে, মাসিকে ; তার মধ্যে সত্যিই নিজেকে উন্নত করার মতো এতই কম জিনিস থাকে যে, তা পড়া-না পড়া সমান। মিছিমিছি সময় নষ্ট। "টাইম কিল" করা। অথচ সময়ের চেয়ে দামি এ পৃথিবীতে আর কী আছে ?

নির্জনতা, মনে হয়, অবশ্যই ভিতরের ও বাইরের সব কিছু সৃজনশীলতারই দ্যোতক ! ঈশ্বরবোধও হয়তো এক ধরনের সৃজনশীলতা।

আপনার চিঠি পড়ে আমি কিন্তু এখনও ঠিক ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারিনি। দুঃখিত। আপনি লিখেছেন যে, পরে আরও লিখবেন। সেই আশায় থাকব। আমার দুর্মর অবিশ্বাসের দুরপনেয় কলঙ্ক দূরীভূত হতে সময় লাগবে অনেকই। তবে এটা ঠিক যে, যা নিয়ে কোনওদিনও ভাবিনি অথবা ভাবব বলে ভাবিনি তা নিয়েই এখন ভাবাভাবি করছি। বিনোদবিহারীর মতো মানুষ, রবীন্দ্রনাথের, টলস্টয়ের মতো মানুষ যদি কোনও কিছুতে বিশ্বাস করেন তা বাতুলতা বলে পথের ধুলোয় ফেলে তো দেওয়া যায় না ! তাকে বাতিল করার আগে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই যাচাই করা দরকার। আমার যুক্তিনির্ভর বা বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক একটি মন আছে বলেই সবকিছুই "শ্রেডার" মেসিনে ফেলে কুচি-কাটা করতে যে হবেই তার মানে কি ?

নির্জনতা প্রসঙ্গেই বলি, জানি না আপনি জানেন কি-না ; রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরীতে

শ্রীঅরবিন্দর সঙ্গে দেখা করার পর তাঁর পুত্রবধূকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, ৩০শে মে, ১৯২৮ তারিখে। তাতে লিখেছিলেন :

"স্থির করেছি এবার ফিরে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মতো সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্নতা অবলম্বন করবো। —কেবল প্রতি বুধবারে সাধারণকে দর্শন দেব। —বাকি ছ'দিন চুপচাপ নিজের নিঃসঙ্গ নির্জন শান্তি অবলম্বন করে গভীরের মধ্যে তলিয়ে থাকবো। অরবিন্দকে দেখে আমার ভারী ভালো লাগলো। বেশ বুঝতে পারলুম নিজেকে ঠিকমতো পাবার এই ঠিক উপায়।"

এর পরও রবীন্দ্রনাথ কেন এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করলেন না, তা যদি আপনার জানা থাকে, তো জানাবেন।

এর বেশ কিছুদিন পরেও "প্রবাসী" সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কেও ৮/৬/১৯২৯ তারিখে উনি লিখেছিলেন আবার প্রায় একই কথা।

"দেশে গিয়ে সম্পূর্ণ নির্জনবাসের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে দীর্ঘকাল বাক্য ও কর্ম থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেব ঠিক করেছি— ছোট-ছোট দাবির শিলাবৃষ্টিতে আমার দেহমনের সমস্ত ডাঁটাগুলো একেবারে আলগা হয়ে গেছে। ডাক্তার বলছে স্থির হয়ে থাকা ছাড়া আর ওষুধ নেই। অন্তরের মধ্যে তার একান্ত প্রয়োজনও বোধ করচি।"

এই সিদ্ধান্তও কার্যকর না করার কারণ কিছু জানেন ?

ভালো থাকবেন।

ইতি—
যোজনগন্ধা

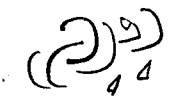

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
গ্রেটার কৈলাস ওয়ান
নিউ দিল্লি

দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা,
কল্যাণীয়াসু,

না, কারণ কিছু জানি না। বলো তো, শান্তিনিকেতনে খোঁজ লাগাই।

এটুকু বলতে পারি যে, যে-সব মানুষ অত্যন্তই কর্মব্যস্ত থাকেন তাঁদের নিজ কর্মস্থানে এক মুহূর্তও মাথা তোলার বা নির্জনতার সুযোগ নেই বলেই তাঁরা দীর্ঘ ছুটি পেলেই তাঁদের বিচিত্রবীর্য মন নানা জল্পনা-কল্পনায় মাতে। জিনিয়াস-এর এও এক লক্ষণ। আমি একাধিক প্রতিভাবান জীবিত ব্যক্তিকে এমন করতে দেখেছি। যখন তাঁদের মন মাতে তখন সেই কল্পনার কতটুকু বাস্তবে পরিণত করা যাবে না যাবে তা নিয়ে তাঁরা আদৌ মাথা ঘামান না। তার কারণ, কল্পনাই তখন তাঁদের মস্তিষ্ককে চালায়।

নিজের কর্মস্থানে তখন তাঁরা ফিরে এসে বুঝতে পারেন ছুটি ফুরোলেই যে, তাঁদের

নিজেদের সৃষ্ট নিশ্ছিদ্র কারাগারেই তাঁরা বন্দী। যা কল্পনা করেছিলেন, ভেবেছিলেন ; তা বাস্তবে রূপায়িত করা প্রায় দুঃসাধ্য। অন্যের গড়া কারাগার সহজে ভাঙা যায় কিন্তু নিজের কারাগার ভাঙতে অসামান্য দৃঢ়তার এবং সাহসের প্রয়োজন হয়। সাহসই শুধু নয়, সে কারাগার ভাঙলে নিজেরই দেওয়া অন্য অনেক অঙ্গীকারের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অগণ্য মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থর প্রতিও অন্যায় করতে হয়। হয়তো নিজস্বার্থ, নিজগুণের কারণে যা সহজে করা যেত, অন্যদের স্বার্থ, কোনও প্রতিষ্ঠান বা মহৎ উদ্দেশ্যর স্বার্থর কারণেই তা করা হয়ে ওঠে না। এই সব বড় মানুষের দুঃখের কথা, হতাশার কথা ; আমাদের মতো মানুষেরা প্রায়ই বুঝি না। হয়তো সেই হতাশা বা দুঃখকে সঠিকভাবে বোঝবার ক্ষমতাও আমাদের নেই।

নিজ-কারাগার ভাঙার সাহস এবং অবকাশ রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষেরও হয়তো ছিল না।

ভালো থেকো।

ইতি—
অর্থমা

পুনশ্চ : তোমার সোয়েটার, সিনিবালির দারুণ কলম এবং ইলবিলার পাঠানো সুন্দর লেখার প্যাড পেলাম আজ দুপুরে। রাঁচি থেকে এক ভদ্রলোক পৌঁছে দিয়ে গেলেন। একটি বইও কিনে এনেছিলেন সঙ্গে। অটোগ্রাফ করাতে।

ধন্যবাদ দিয়ে তোমাদের ছোট করব না। তোমাদের কি দিতে পারি ? ভাবছি, একটি করে বই তোমাদের উৎসর্গ করব। এই উপহার দিতে সময় লাগবে ঢের। বুঝতেই পারো।

অর্থমূল্যে এই উপহারের মূল্যায়ন করা যায় না। তবে আশা করি, এর মূল্য তোমরা তিনজনেই বুঝবে।

দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ

কল্যাণীয়াসু,
যোজনগন্ধা,

তুমি তো ক্লাসিক্যাল গান শিখতে কানন সাহেবের কাছে তাই না ? আমার মনে আছে। এ· টি· কানন সাহেবের মতো প্রচার-আকাঙ্ক্ষাহীন উঁচুদরের প্রকৃত গুণী আজকাল ক্রমশই বিরল হয়ে আসছেন। গান কি ছেড়ে দিয়েছ একেবারেই ? ছেড়ো না। গান, সে কারো চানঘরের গান হলেও, প্রত্যেক মানুষকেই নিয়ত নবীকৃত করে। গান, যতখানি নিজের আত্মার আনন্দের জন্যে ; ততখানি বোধ হয় পরকে আনন্দ দেবার জন্যে নয়।

মকবুল সাহেবের বাড়িতে সেদিন গানের ম্যায়ফিল বসেছিল। শেখর সাহাবের স্ত্রী মতিভাবীর ও মকবুল সাহাবের উৎসাহেই এই ম্যায়ফিলের আয়োজন হয়েছিল।

মকবুল সাহেবের বাঁশ, কাঠ, বিড়িপাতার ব্যবসা। অত্যন্ত রহিস্ আদমী। অনেকদিন আগে থেকেই তোড়জোর চলছিল। এতদিনে তা জমল।

গেয়া থেকে চিরাগ বাঈ এসেছিলেন। গেয়ার অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বাঈজী। ভাল বাইজীদের প্রজন্ম আজকাল শেষ হয়ে গেছে। তাই চিরাগ বাঈ এক বিরল বিস্ময়। মানে, গানেওয়ালি শুধু। 'বাজানেওয়ালি'র বদনাম তাঁকে কেউই দিতে পারেননি নাকি আজ অবধি। অথচ কী বলব! এই রকম রূপ যে নারীর, তিনি একভোগ্যা হয়েই থাকবেন সারা জীবন ; এ-কথাটা ভাবলেই খুদাহ্‌র উপরে অভিমানে দু' চোখ জলে ভরে আসে।

এতদিন আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, সৌন্দর্যে কোনও খুঁত না থাকলে বুঝি তা নিখুঁত হয় না। হয়তো নিখুঁত সৌন্দর্য কাকে বলে তা আগে জানতাম না বলেই তখন এমন ভাবতাম।

কিন্তু চিরাগ বাঈকে দেখার পর আমার সে ভুল ভেঙে গেছে।

সুন্দরী তো তুমিও কিছু কম নও যোজনগন্ধা! শেখর সাহাবের স্ত্রী মতিভাবীও কম সুন্দরী নন। সুন্দরী তো কম দেখিনি আজ অবধি, কম বার মরিনি পৌনঃপুনিক মরণে! কিন্তু এমন রূপের মুখোমুখি কখনওই হইনি এর আগে!

বিশ্বাস করবে কি না জানি না, এখন সকাল এগারোটা ; এখনও কাল রাতের ঘোরের মধ্যেই আছি। সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। কেবলই এ-পাশ ও-পাশ করেছি। সৌন্দর্যর মার যে কতবড় মার তা যাঁরা সুন্দরের পূজারী নন, তাঁদের জানার জগতের বাইরে। এই "অচানক্ বিমারী"তে যে—মারীজ বে-হোঁশ হয়, তার ইলাজ হতে পারে শুধুমাত্র সেই সৌন্দর্যে অবগাহন স্নানেই। কিন্তু এক ফোঁটা জলও যেখানে মেলার নয় ; সেখানে অবগাহন স্নানের প্রশ্নই তো ওঠে না!

আমরা পৌঁছবার পরেই এলেন চিরাগ বাঈ। মেয়ে তো নয়, যেন মা-বাবার তারিফ।

আমরা গিয়ে বসেছি। বসে, বানারস থেকে আনা মঘাই পান আর উম্‌দা জর্দা সহযোগে আলবোলার অম্বুরী তামাকের গন্ধের মধ্যে বুঁদ হয়ে খোসমিজাজে খাল-খরিয়াত রাহান-সাহানের পুছ-পাছ চলেছে, এমনই সময়ে মকবুল সাহাবের খাস দোস্ত গেয়া শহরের শেঠ হীরালাল যখন তাঁর কালো ঝকঝকে ব্যুইক গাড়িতে করে চিরাগ বাঈকে সঙ্গে করে পৌঁছলেন এসে তখন গুঞ্জরন উঠল বাইরের বারান্দাতে।

এরমকটিইতো হওয়ারই কথা ছিল। তাই বিশেষ খেয়াল করিনি। কিন্তু যখন চিরাগ বাঈ আসরের সাদা ফরাস পাতা আর লাল মখমলের তাকিয়া ছড়ানো জমিতে খালি পায়ে এসে দাঁড়ালেন আমাদের সামনে তখন তাঁর পায়ের দিকে তাকিয়েই হৃৎকম্প উপস্থিত হল আমার।

"আপাদমস্তক" শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রইল না। প্রথমে পায়ের দিকেই চাইতে হয় বটে! কিন্তু সেই পদযুগলের বর্ণনা করি এমন ভাষা আমার মতো মামুলী ভাষাসেবীর শব্দ-ভাণ্ডারে নেই যোজনগন্ধা।

আস্তে আস্তে পা ছেড়ে চোখ উপরে উঠতে লাগল।

আহাঃ কী গড়ন নারীর! পরনে একটি গোলাপি ঢাকাই শাড়ি। মধ্যে-মধ্যে ছাইরঙা কাজ। ছাইরঙা পাড় শাড়ির। গাঢ় গোলাপি ব্লাউজ। কানে, হাতে গলায় শুধুই হীরে।

হীরের নাকছাবি। ঘন কালো কোঁকড়া চুলের মধ্যে শুদ্ধ চরিত্রের পবিত্রতারই স্মারক যেন, উজ্জ্বল, মসৃণ সিঁথি। অঙ্গারের মতো গায়ের রং চিরাগ বাঈয়ের। এমন সার্থকনামা নারী বেশি নেই। চোখদুটির কনীনিকার রং পূর্ণ-যৌবনা শ্বেতবর্ণা রুইমাছের চোখের রঙের মতো গোলাপি। দীপশিখারই মতো একটি ডিম্বাকৃতি মুখ। দীঘল আঁখিপল্লব। এবং প্রতি পলে-পলে সেই পল্লব খোলে এবং বন্ধ হয়। কলকাতার আশুতোষ দেব, সাতুবাবু কেন যে গান বেঁধেছিলেন "নয়নে আমার বিধি, কেন পলক দিয়াছে/ দরশন সুখে আমায় বিমুখ করেছে···" ! বোধহয়, এমন কাউকেই দেখে।

এ কথা, যেন আমারই নয়নের কথা। নিজের পলক তো শত্রুই, তাতে যদি প্রিয়ার পলকও এমন শত্রুতা করে ; তবে তো বাঁচাই দায় !

তবে সেই চোখে বেশিবার চাইবার মতো হিম্মৎ পৃথিবীতে কম পুরুষেরই হবে। হাত-পা অবশ হয়ে আসে অমন সৌন্দর্যে। নিজের অজানিতে গায়ের তাপ বাড়তে থাকে, বাড়তে-বাড়তে কামজ্বরে শরীর জ্বরাক্রান্ত হয়ে যায়।

মকবুল সাহেব বলেন, সংগীতের মতো, কাব্যগুণের মতো ; সৌন্দর্যও আল্লার এক কিম্‌তি দান। এমনকি গুণহীন-সৌন্দর্যও অসীম কদরের জিনিস। এমন মনোযোগ দিয়ে, এমন ব্যতিক্রমী করে, ব্রহ্মা বোধহয় বেশি মানুষকে গড়েননি। তেজ, ক্ষিতি, মরুৎ, ব্যোম, অপ্ কোনও কিছুরই কমতি পড়েনি এঁকে গড়বার সময়ে। কোনও তুলির রোমে একটুও কুঞ্চন ঘটেনি। রঙ মিলেছিল তেলের সঙ্গে, তারল্যর সমান ঘনত্বে।

চিরাগ বাঈ গোলাপি গালিচার উপরে আসন নিলেন। রুপোর পানদানি থেকে পান উঠিয়ে মুখে দিলেন। একটু পরে পানের ঘন লাল পিক যখন গোলাপি গ্রীবার নীল শিরা বেয়ে নেমে যাচ্ছিল তখন মনে হল, দূর সাগরের কোনও নিভৃত প্রবাল দ্বীপে বাসা বেঁধেছে আমার এই কুৎসিত চোখ দুখানি। একটু পরই যেন খুদাহুর দুয়া লাগবে আমার এই দু'চোখে।

চিরাগ বাঈ আসরে উপস্থিত সকলের সঙ্গে আদাব নমস্কার বিনিময়ের পর গৃহস্বামী মকবুল খাঁ সাহেবের অনুরোধ হল, গাইবার জন্যে।

বাইরে তখন ভরা বর্ষা। তবে হাজারীবাগের বৃষ্টিও বড় নাজুক। বড় শর্মিন্দা তার। ফিস্‌ফিস্ করে সে কথা কয়, শাদীর রাতের বিবির মতো। আতরের গন্ধ ওঠে তার পায়ে পায়ে।

কোন উস্তাদ কী রাগ গাইবেন তা তাঁর উপরে ছেড়ে দেওয়াটাই আদব। কিন্তু সংসারে আমার মতো বে-আদব মানুষের সংখ্যাও তো নেহাত কম নয় !

আমারই মতো কেউ-কেউ হয়তো বর্ষার রূপ দেখে সে কথা নিচুস্বরে উচ্চারণ করে বে-আদবী করে থাকবেন। ঐ স্বগতোক্তির মতো বলা কথাও কানে গেল খাঁ সাহেবের।

তিনবার আদাব করলেন তিনি। তার পরে বললেন : ইজাজৎ যদি দেন তো আজ মিঞা কী মল্লারই শোনাই।

কেয়া বাত্। কেয়া বাত্। ইয়া আল্লা। বড়া মজা আ যায়গা আজ, ইত্যাদি শব্দের গুঞ্জরন উঠল ঘরে। ধূপের গন্ধ প্রখরতর হল। আতরের মিশ্র গন্ধ খুশিয়ালি ছড়াল। বাইরে বৃষ্টি ভেজা প্রকৃতির গন্ধ। গাছের গন্ধ, পাতার গন্ধ, ফুলের গন্ধ, তারার গন্ধ, অন্ধকারের গন্ধ। আর ভিতরে তোমারই মতো রক্ত যোজনগন্ধা নারীর সুপ্রসাধিত শরীরের গন্ধ।

জোড়া তানপুরার আওয়াজ ক্রমশ জোর হতে লাগল। বাঁধা চলছিল তখনও

তানপুরা।

তবলাতে বসেছিলেন চিরাগ বাঈ-এর নিজস্ব তবলচি, মিঞা আলতাফ হুসেন। গেয়ারই মানুষ। বয়সে নবীন। হাত বটে আলতাফ-এর। তবলা বাঁধার আওয়াজেই মালুম হল তা! "রাইডিং রাফশড" অভিব্যক্তিটি একসময়ে পুরনো ইংরিজিনবীশেরা প্রায়ই ব্যবহার করতেন। আজকালকার ইংরিজিনবীশেরা হয়তো শব্দটিকে জানেনও না। তবলার সঙ্গে যদি শেটল্যান্ড পনির তুলনা করা চলে এবং তার "ট্রট"-এর সঙ্গে তবলার বোল-এর ; তবে বলতে হয়, আলতাফ-এর দুটি ঘোড়ার পায়ের খুরই মোড়া ছিল বসরাই গালচেতে। (দ্রুততা যে কী শ্লথ হতে পারে, অসমান ধ্বনি যে কত সমান এবং মসৃণ হতে পারে ; গভীরতা যে কত অগভীর হতে পারে, দূরত্ব যে নৈকট্যের কত বড় দ্যোতক হতে পারে তা আলতাফের তবলা শুনলে তবেই বোঝা যায়।)

ওর দুটি হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

একটু দাঁড়াও। কে যেন এসেছেন!

ফিরে : কলোনের কুমার সাহেব এসেছেন। তাঁর গরু নিয়েছে চিতাবাঘে। গপু সেন অ্যান্ড কোম্পানিকে খবর দিতে হবে আজই মারতে যেতে। পাছে তাঁর কথা "সিড়ে" গপুবাবু না শোনেন তাই আমাকে মুরুব্বী পাকড়াতে চান। দুয়ারে গাড়ি প্রস্তুত।

অতএব চিঠির এইটুকুই আজ খামে ভরে দিচ্ছি ধানিয়াকে। ডি ভি সি-র মোড়ের লাল বাক্সে ফেলে দেবে। ম্যায়ফিলের বাকিটুকু পরের চিঠিতে। একটু ধাতস্থ হয়ে নিয়ে। দিলএ বড় চোট দিয়েছে চিরাগ বাঈ।

ইতি—
অর্যমা

পুনশ্চঃ চিরাগ-এর প্রতিশব্দ শামা তা কি জান? চিরাগ বাঈ-এর প্রসঙ্গে একটি শায়ের মনে পড়ে গেল :

"শামা জ্বলতি হ্যায় যিস্‌মে ক্যোই উজালা হি নেহি, হুসন্ বেকার হ্যায় যিস্‌কি ক্যোই চাহনেওয়ালাহি নেহি।"

মানে কি বুঝলে?

যে প্রদীপে ঔজ্জ্বল্যই নেই তার জ্বলে কি লাভ? যে সুন্দরীর কোনও যাচক নেই, তার সৌন্দর্যও তো মিছিমিছিই।

হায় চিরাগ! হায় শামা! হায় শামা!

boiRboi.net

গ্রেটার কৈলাস টু
নিউ দিল্লি

অর্যমা রায়
দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ

অর্যমাদা,

আপনি শুনে সুখী হবেন যে আমার প্রচণ্ড একটা লিফট হয়েছে। সঙ্গে একগুচ্ছ পার্কসও। কোম্পানি গাড়িও দিতে চেয়েছিল কিন্তু আমি নিইনি। কারণ, আমার বর্তমান বাড়িতে গারাজ নেই।

আপনি ছাড়াও আমার আরও সৎ বন্ধু আছে। যেমন, আমার জার্মান স্পিৎজ কুকুরটি। ওর নাম দিয়েছি, আমি "শাপলা"। সেও পুরুষ। সাদা লোমের ; ফেনার মতো নরম। কালো উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। ও সবই বোঝে। আমার দুঃখ হলে ও দুঃখী হয়। আমার আনন্দে আনন্দিত। ও আমাকে আমার জন্যেই ভালোবাসে। ওর ভালোবাসাতে কিছুমাত্র স্বার্থ নেই। মানুষদের মতো নীচ নয়ও। আমার অসুখ হলে ও আমার খাটের পাশে মাটিতে মনমরা হয়ে বসে থাকে। কোনো আগন্তুক আমার সঙ্গে উঁচু গলাতে কথা বললেই তাকে ভীষণ ধমকে দেয়। ও আমার কাছে কিছুই চায় না, শুধু একটু মনোযোগ ছাড়া।

মাঝে মাঝেই ভাবি, মানুষরা যদি কুকুরের মতো হতে পারত !

মানুষের প্রেমিক এবং প্রেমিকা যদি কুকুর কুকুরীর মতো সৎ এবং নিস্বার্থ হতো তবে প্রত্যেক মানুষের জীবনই অন্যরকম হতে পারত !

"শাপলা" ছাড়াও আমার অন্য বন্ধুও আছে। তারা বই আর রেকর্ড। ডিস্ক। ক্যাসেট। একটি নতুন টেপ-ডেক কিনেছি তাতে ম্যাগনেটিক ডিস্কও যায়। আর আছে বই। বইয়ের সঙ্গেই আমার ঘর-করা। তারাই আমার বন্ধু, আত্মীয় ; প্রেমিক, স্বামী। বইয়ের মধ্যে বসে থাকি ; বইয়ের মধ্যে শুই। বই পেরিয়ে, বই ডিঙিয়ে চানঘরে যাই। আমার বাড়িতে বইয়ের জন্যে নিজের থাকার জায়গা হয় না। এই জন্যেই এবারে মস্তবড় ফ্ল্যাট নেবো একটা।

আমার মতো সামান্য একজন মানুষের জন্মের কত শো বছর আগে থেকে কত গুণী, জ্ঞানী, অনুভূবিপ্রবণ, প্রেমিক মানুষে তাঁদের সব জ্ঞান, সব গুণ, রক্তাক্ত ও সুখী হৃদয়ের সব কিছু নিংড়ে আমাদের জন্যে যা কিছু লিখে গেছেন তার কী কোনো বিকল্প আছে ? কত জ্ঞান, কত আনন্দ ; সব জমা করা আছে পাঠকের জন্যে ! ভাবা যায় ? বুঁই পড়া মানেই তো আড্ডা মারা। আর দেশবিদেশের কত সব উৎকৃষ্ট মানুষদের সঙ্গে আড্ডা মারা। এমন আড্ডা মারার সুযোগ থাকতেও মানুষে কেন যে আজেবাজে মানুষের সঙ্গে,

জ্যাঠতুতো দিদি বা পিসতুতো ননদের সঙ্গে থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড় এর আলোচনাতে, নিরন্তর পরচর্চাতে, এই একটি মাত্র অমূল্য জীবনের সময় নষ্ট করে তা আমার মোটা বুদ্ধিতে কুলোয় না।

কবে, আপনি আসবেন আমার কাছে? অনেক যোজন পথ মাড়িয়ে, এই সামান্যা, প্রণতা ; যোজনগন্ধার কাছে? আসবেন কি কখনও? এ জীবনে?

আপনি যদি দিল্লিতে আসেন তবে সেবা কাকে বলে, যত্ন কাকে বলে তা দেখিয়ে দেব। আপনার কাছে আমার কিছুই চাইবার নেই কিন্তু। আমি আপনাকে আমার "শাপলা" আমাকে যেমন করে ভালোবাসে, ঠিক তেমন করেই ভালোবাসব।

মসৃণ, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।

ভালো থাকবেন।

ইতি
যোজনগন্ধা

নিউ দিল্লি

শ্রীঅর্যমা রায়,
দ্যা জ্যাকারান্ডা,
হাজারীবাগ, বিহার

অর্যমাদা,

আপনি তো লেখক!

এর আগেও জিগ্যেস করেছি বোধহয় আপনাকে একবার যে, আপনি কেন লেখেন? আর উত্তরে আপনি প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে লিখেছিলেন, "না-লিখে পারি না বলে"। ঐ প্রসঙ্গেই আরও অনেক কথা বলেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আমার যা মনে হয়, মানে আমি যতটুকু বুঝি, তা জানাচ্ছি। আপনার কি মতামত, তা জানলে খুশি হব।

প্রত্যেক লেখকেরই সমস্ত জীবনের লেখা ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তাঁর সব লেখার মধ্যেই একটি মূল সুর ফুটে ওঠে। আমার মনে হয়, প্রত্যেক লেখকেরই একটি নিজস্ব জীবন-দর্শন থাকে। অন্ততঃ থাকা উচিত। যা নইলে, তিনি লেখক হতেই পারেন না।

জেমস জয়েস, তাঁর বিখ্যাত বই "আ পোর্ট্রেট অফ অ্যান আর্টিস্ট অ্যাজ ইয়াং ম্যান"-এ বলেছিলেন : "টু লিভ, টু আর, টু ফল, টু ট্রায়াম্ফ, টু রিক্রিয়েট লাইফ আউট অফ লাইফ।" এই বোধহয় সাহিত্যের মূল সংজ্ঞা।

অন্যরা অন্যভাবে বলেছিলেন। অন্য কথাও।

যতই পড়ি, ততই ভাল লাগে আবার কখনও কখনও ধন্দতেও পড়ে যাই। লেখালেখি

সম্বন্ধে কত লেখক যে কত রকমের কথা বলেছেন ! তবে সকলের কথাতেই একটা ব্যাপার প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। লেখা বড় বেদনার ব্যাপার। হৃদয় নিংড়ানোর ব্যাপার। এবং লেখাও কম টেনসান-এর ব্যাপার নয়। কারণ প্রত্যেকটি লেখাই যে এক একটি পরীক্ষা। অগণ্য, অচেনা পাঠক-পাঠিকাই লেখকের পরীক্ষক।

স্টাইনবেক লিখেছিলেন, "সাডেনলি আই ফিল ভেরী লোনলি ইন আ কিউরিয়াস ওয়ে। আই গেসস্ আই অ্যাম এফ্রেড। দ্যাট ওলওয়েজ কামস্ নিয়ার দি এন্ড অফ দ্যা বুক। দ্যা ফিয়ার দ্যাট উ্য হ্যাভ নট অ্যাকম্লিশড হোয়াট উ্য স্টার্টেড টু ডু। ইন আ শর্ট টাইম দ্যাট উইল বী ডান অ্যান্ড দেন ইট উইল নট বী মাইন এনিমোর। আদার পিপল্ উইল টেক ইট ওভার অ্যান্ড ওওন ইট অ্যান্ড ইট উইল ড্রিফট এওয়ে ফ্রম মী অ্যাজ দো আই হ্যাড নেভার বীন আ পার্ট অফ ইট।"

রবার্ট স্কোলস, তাঁর "এলিমেন্টস অফ রাইটিং" বইয়ে (এই বইটি আমাকে আমার বান্ধবী রিংকি মুলগাঁওকার দিয়েছে আমার জন্মদিনে) বলছেন : "রাইটিং দেন ইজ আ ডিসিপ্লিন। ইট ইজ আ স্পেশ্যাল ফর্ম অফ সাউন্ডলেস স্পীচ অ্যান্ড ভার্বাল থট। টু ডীল উইথ এনি আসপেক্ট অফ ইওর লাইফ ইন রাইটিং ইজ হার্ডার দ্যান টু স্পীক অ্যাবাউট ইট অর টু থিংক অ্যাবাউট ইট।"

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী সুরমা ঘটককে (বিভূতিভূষণের আত্মীয়া হতেন উনি। সুরমা ঘটকের "ঋত্বিক" বইয়ে পড়েছি, (আশা প্রকাশনী, ৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯) লিখেছিলেন :

"সাহিত্য কি ? এও তো এক ধরনের খোলা চিঠি। যা কিনা নিজের অন্তর্যোগে নিঃসৃত, সেই আন্তরিক প্রকাশকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।"

উইনস্টন চার্চিল, সাহিত্যিক না হলেও, লেখকতো অবশ্যই। ভীমসেন যোশী সাতটি স্বর নিয়ে যা করেন, যাদুকরের খেলা ; উইনস্টন চার্চিলও ইংরিজি ভাষাকে নিয়ে তাই-ই করেছিলেন বলে আমার এতো ভাল লাগে ওঁর লেখা। আরেকজন লেখকের ইংরিজিও আমাকে মুগ্ধ করে, অথচ ইংরিজি তাঁর মাতৃভাষা নয় ; তাঁর নাম ভ্লাডিমির নবকভ। রাশ্যান।

বরিস পাস্তারনাক, আরেকজন রাশ্যানের কথাও মনে পড়ে গেল এই প্রসঙ্গে, যদিও ওঁর লেখা, অনুবাদেই পড়েছি। মনে পড়ে গেল এই জন্যে যে, গদ্যলেখক হিসেবেই ওঁর নাম ডাক কিন্তু আমার ওঁকে গদ্যকারের চেয়ে অনেক বড় কবি বলে মনে হয়।

কেন জানিনা, রাশ্যান সাহিত্যিকদের আমি এক অন্য চোখে দেখি। আমীর খান-এর আলাপের চাল এর মতোই ওঁদের সাহিত্যর চাল। টলস্টয়, ডস্টভয়েস্কি, চেকভ, টুর্গেনিভ এমনকি পাস্তারনাকের লেখার মধ্যেও তান-বিস্তার বা ঝালা বা জোড়ের প্রাধান্যর চেয়ে আলাপের প্রাধান্যই বেশি। তাই, মাধুর্যও।

বাজনা বা গান যাঁরা সত্যিই ভালোবাসেন এবং কিছুটা বোঝেনও তাঁরা ঝালা বা তান-বিস্তারকে মন্দ বলেন না। কিন্তু তাঁরা জানেন, কে কত বড় গুণী তা বিচার করতে হয় আলাপ শুনেই। তবলার সহযোগিতার আগে। গভীর ধ্যানমগ্নতা যেমন বাদকের, গায়কের প্রয়োজন ; তেমন শ্রোতারও অবশ্যই প্রয়োজন। গভীরতা না থাকলে, কোনো শ্রোতারই, আলাপের রসাস্বাদন করতে পারার কথা নয়। রাশ্যান সাহিত্য, বিশেষ করে ক্লাসিকাল রাশ্যান সাহিত্য অবশ্যই ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলাপের সঙ্গে তুলনীয়।

আবার ফিরে আসি উইনস্টন চার্চিলের কথাতেই। "রাইটিং আ বুক ওজ্ অ্যান

অ্যাডভেঞ্চার। টু বিগিন উইথ ইট ওজ্ আ টয় অ্যান্ড অ্যামুজমেন্ট, দেন ইট বিকেম আ মিস্ট্রেস, অ্যান্ড দেন আ মাস্টার, অ্যান্ড দেন আ টাইরান্ট।"

আপনার প্রিয় লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে একবার তাঁর প্রকাশক চার্লস স্ক্রিবনারকে বলেছিলেন : "রাইটিং ওজ আ ডিজীজ, আ ভাইস্, অ্যান্ড অ্যান অবশেসান। টু বী হ্যাপী, হি হ্যাড টু রাইট, হুইচ মেড ইট আ ডিজিজ। হি ওলসো এনজয়েড ইট, হুইচ টার্নড দ্যা ডিজিজ ইনটু আ ভাইস। সিন্স হি উইশড টু রাইট বেটার দ্যান এনিওয়ান এলস্ হ্যাড এভার ডান, দ্যা ভাইস কুইকলি বিকেম অ্যান অবশেসান।"

আপনার কি মনে হয়, কোনো লেখকের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থাকা উচিত ? যেমন হেমিংওয়ের ছিল ?

আপনার কি মতামত তা জানাবেন।

ইতি
যোজনগন্ধা

যোজনগন্ধা জোয়ারদার,
নিউ দিল্লি

দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা,

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠি পড়ে খুব অবাক হলাম। আমি নিজে লেখক যদিও কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে এতো গভীরে গিয়ে ভাবাভাবি আমিও করেছি বলে মনে হয় না।

আমি যে একদিন তোমার মাস্টারমশাই ছিলাম এ কথা মনে করে সত্যিই অত্যন্ত গর্বিত হচ্ছি। প্রতি চিঠিতেই তোমার অনেক লেখাপড়ার কিছু উদবৃত্ত আমার দিকে উপচে দিও। এই অধমের অনেক উপকার হবে।

না লেখকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব, আমার মতে ; আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। তবে প্রতিযোগিতা, অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু তা শুধুমাত্র নিজের সঙ্গেই। নিজের আগের লেখাটিকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা থাকা উচিত প্রত্যেক লেখকের মধ্যেই।

কিন্তু লেখকদেরও তো ইচ্ছে করে যে, "অতিক্রম" করার চেষ্টা থেকে অন্তত কিছুদিনের জন্যে নিবৃত্ত হয়ে কখনও "ব্যতিক্রমী" হবার। আগের লেখার ব্যতিক্রমও হতে পারে পরের লেখা। ব্যতিক্রম হলে তো আর তুলনা চলে না। তুলনাতত্ত্বের গোড়ার কথাই হচ্ছে সমতা বা, সাযুজ্য। উ্য শুড ওলওয়েজ কমপেয়ার লাইক উইথ লাইক। শুধুমাত্র সমানের মধ্যেই তুলনা চলে। ব্যতিক্রম হলে লেখক বা তাঁর লেখা বই প্রতিযোগিতাতে বাতিল হয়ে গিয়ে একটা নতুন ধারার প্রবর্তন করেন ; একটি নতুন মানের প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যরা সেই পথিকৃৎ-এর দেখাদেখি তাঁর চারপাশে এসে জড়ো হয়। জড়ো হবার পরেই তখন সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন উঠতেও বা পারে। পাঠকদের

চোখেই।

লেখকের পরীক্ষক পাঠক-পাঠিকারাই। তাঁর অবশ্যই এক লেখকের লেখার সঙ্গে অন্য লেখকের লেখার বিচার করবেন। তুলনা করবেন। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রতিযোগিতা হয়তো থাকেই। কিন্তু আবারও বলব, সেটা থাকে, পাঠক-পাঠিকারই চোখে। লেখকের মনে নয়। থাকাটা উচিত নয় অন্ততঃ।

প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি যে-লেখকের মধ্যে আসে তাঁর পক্ষে বেশিদিন লেখক থাকা খুবই কঠিন। হেমিংওয়ে ব্যতিক্রম ছিলেন হয়তো।

আমি লিখি, লেখার আনন্দেরই জন্যে। শুধুমাত্রই আনন্দের জন্যে।

ভালো থেকো।

কবে আসবে হাজারীবাগে ? জানালে না তো এখনও তারিখ।

অর্যমা

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
গ্রেটার কৈলাস ওয়ান
নিউ দিল্লি

দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা,
কল্যাণীয়াসু,

মহম্মদ রহিমের গাড়িটা হাজারীবাগের বড়া মসজিদের ছায়াতেই শুয়ে থাকে।

ওর ভাষায় "অমর্যার" মতোই "অকলদার" কেউ যদি ভাড়া নেয়, তো তবেই ভাড়া খাটে। যে-কেউ পয়সা দিলেই যে সে তার পক্ষিরাজকে ভাড়া খাটাবে তেমন কামিনা ইনসান রহিম নয়! সপ্তাহে দু'-একদিন ভাড়া খাটে। নইলে গাড়িটি শুয়েই থাকে, কোনো নবাবের তোষাখানার দরজার প্রকাণ্ড প্রহরী কুকুরের মতো। ভোরের দিকে রোদ পড়ে কিছুক্ষণ। তারপর বেলা দশটা থেকে বিকেল চারটে অবধি ছায়া। আবার বিকেল চারটে থেকে মসজিদের গম্বুজ আর মিনারের ফাঁক-ফোকর দিয়ে পশ্চিমের আলো এসে পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে।

থাকে রহিম হাজারীবাগ শহর থেকে অনেকেই দূরে। গরিব মানুষ। ছাড়োয়া ড্যামের দিক থেকে সাইকেলে আসে। তবে সারাটা দিন মসজিদেরই আশেপাশে কাটিয়ে দেয়। বড়া-কাবাব-পরোটা খেয়ে, তিনবার নামাজ পড়ে।

রহিমের গাড়ি জলেও চলে, তেলেও চলে। মানে, ভালোবেসে চলতে বললেই চলে। পুরনো টি-এইট মডেলের কন্‌ভার্টিবল্ ফোর্ড গাড়ি। তবে, হুড বহুদিনই হল হাপিস হয়ে গেছে। তিরিশ টাকায় কোডারমা কী সারিয়াতে ট্রেন ধরার জন্যে যাওয়া-আসা। এইরকমই ভাড়া। তবে, তেলটা অবশ্য "পিসেঞ্জারের" নিজের। অবশ্য তেমন "তেল" না থাকলে ওই গাড়ি চড়ার হিম্মতই হবে না কোনও "পিসেঞ্জারের"।

তবে রহিম, ড্রাইভার ভাল।

গপু সেনের শিকারের সাঙাত ছিলেন মহম্মদ করিম জুতোর দোকানী, মুঙ্গেরী টোপিওয়ালা বন্দুকওয়ালা, কার্তুজওয়ালা ; বিহার পুলিশ, এন· সি· ডি· সি·, হেভী এনজিনিয়ারিং, বোকারো স্টীল থেকে গুমিয়ার ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস-এর দারোয়ান আর চৌকিদার আর নাইট-গার্ডদের ড্যানিফর্ম, বুট, পাগড়ি, টোপি, বেল্ট ইত্যাদি সাপ্লাই-করনেওয়ালা। তিনি, এক সময়ে একটি গাড়ি কিনেছিলেন সিরিফ্ গাড়ি চড়বারই বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে। এই মহম্মদ করিমের গাড়িতে একবার চড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার অনেকদিন আগে। গয়া জেলার জৌরীতে মহম্মদ ইদ্রিসের মেয়ের বিয়ের দাওয়াত পেয়ে গপু সেন, আমি এবং আরও একজন, করিম সাহেবের ভাতিজা শাকলুকে নিয়ে সেই গাড়িতেই হাজারীবাগ থেকে টুটিলাওয়া, সীমারীয়া ভায়া চাত্‌রা এবং জৌরী হয়ে সিজুয়াহারাতে পৌঁছেছিলাম। পৌঁছে যে ছিলাম শেষ পর্যন্ত, সেও আল্লার অশেষই দোয়া বলতে হবে।

সিজুয়াহারাতে গপু সেনের বন্ধু থাকতেন, রঘু শেঠ। তাঁর ভাণ্ডার ছিল পাহাড়ের উপরে। রঘু শেঠের বউ ছেড়ে গেছিল তাঁকে। আমার জীবনে সেই প্রথম বউ-চলে-যাওয়া পুরুষ দেখা। দেখে, বড় অনুকম্পা হয়েছিল আমার। এবং পরের বউ সম্বন্ধে এক তীব্র বিদ্বেষ এবং উৎসাহও জাগরূক হয়েছিল। তারপরে অনেকই বৌ-চলে যাওয়া পুরুষ দেখেছি।

সিজুয়াহারা পৌঁছতে হলে গয়ার ফল্গু নদীর দুই শাখা নদী, গভীর জঙ্গল-পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে-যাওয়া ইলাজান আর জাঁম নদী পেরিয়ে যেতে হত তখন। "জাঁম" মানে হচ্ছে পানপাত্র। সেই শায়েরী আছে না বিখ্যাত ?

"অ্যায়সা ডুবাহুঁ তেরী আঁখোকি গেহ্‌রাইমে
হাত মে জাঁম হ্যায়,
মগর পীনেকি হোঁস নেহি।"

অর্থাৎ তোমার চোখের গভীরে আমি এমনই ডুবে আছি প্রিয়া যে, হাতে যদিও আমার পানপাত্র কিন্তু তবু চুমুক দেবারও হুঁশ নেই।

শীতের শেষ রাতে ওই নদী দুটি পেরোতে হয়েছিল করিম সাহেবের গাড়িতে। (কিছু পথ গাড়িতে চড়ে আর কিছু পথ গাড়িকে কোলে চড়িয়ে)

করিম সাহেব চিরদিনই সাইকেলেরই সওয়ারি। গরিবের ঘোড়া-রোগের মতো তাঁকেও একসময়ে গাড়ি-রোগে পেল। কারণ, নাম বলা যাবে না যদিও ; এক ব্যাটা বদ্‌তমিজ পয়সাওয়ালা ভূমিহার গাড়িতে চড়া নিয়ে কী যেন খোঁটা দেয় তাঁকে।

করিম সাহেব প্রায়ই আমার সঙ্গে সাইকেলে পাশাপাশি প্যাডল করতে-করতে বিড়বিড় করে গালাগালি দিতেন : আল্লা করেন যেন সেই বেহুদার চোখ দুটো গলে যায়, যেন কান দুটো খসে পড়ে, যেন নাকটা বন্ধ হয়ে যায়, যেন পা দুটো বেঁকে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

"তারিফ" শুনে আমার মনে হত যে, "হুনরমন্দি" শুধু গায়কের গলার সুরের মধ্যেই থাকে না, গালি-দেনেওয়ালার গালাগালির তীব্রতার মধ্যেও থাকে। আহা ! করিম সাহেবের "চন্দ্রাননে কী শোভা" তখন।

করিম সাহেব বলতেন, হারামজাদে খুদ বদ্‌তিমিজ, উসকি বিবি বদ্‌তিমিজ, উসকি সব্বে আওলাদ্‌ভি বদ্‌তিমিজ।

এর মাসখানেক পরেই করিম সাহেব গপু সেনের গয়া রোডের বাড়ির সন্ধ্যে আড্ডায় বজ্র-নির্ঘোষের মতোই ঘোষণা করলেন যে, তিনি গাড়ি কিনেছেন। গাড়িওয়ালা, সেই ভূমিহার বড়লোককে এক হাত নেবেন বলে।

গপু সেন একদিন এসে হাজির আমার ভাড়া বাংলো "দ্যা জ্যাকারান্ডতে"। বললেন, চলুন লেখক, করিম্মোয়ার গাড়িটা দেখেই আসি।

আমি বললাম, আমার কিন্তু তাজ্জুব লাগছে। ছোটাপালু ঘাটে এই সেদিন যে বক্রীর লরি লুঠ হল তার সঙ্গে মহম্মদ করিমের এই হঠাৎ-অ্যাফ্লুয়েন্সের কোনও যোগ নেই তো?

গপু সেন বললেন, কী যে বলেন লেখক! ছোটাপালু ঘাটে লরি লুটে নতুন গাড়ি হয় না। হান্টারগঞ্জের শেরঘাটির ঘাটে লুটেও নয়। করিম্মোয়া নিশ্চয়ই এম· এল· এ· বা এম· পি· হয়েছে এবার চুনাওতে। আমরা তো কোনও খবরই রাখি না।

যে সময়ের কথা হচ্ছে, সেই সময়ে এম· এল· এ· বা এম· পি·-দের দাম এতখানি ওঠেনি। শোনপুরের মেলায় দিনে দশ সের দুধ-দেওয়া সুলক্ষণা মোষের যা দাম—তেমনই দাম ছিল। তখন যে বেগুনের কে· জি· ছিল দশ পয়সা। বিশ পয়সা, উজ্জ্বল, মসৃণ; গোল মতো টইটম্বুর লাল টোমাটোর। তিরিশ পয়সায় এক জোড়া ইয়াব্বড় বাবা-মোরগার ডিম। তো, সেই বাজারে এই সাচ্চা গণতন্ত্রের এম· পি· বা এম· এল· এ·-দের দাম আর কতই বা হতে পারত!

তা করিম মিঞা কী গাড়ি কিনলেন?

আমি শুধিয়েছিলাম।

আরে! স্বচক্ষেই দেখবেন চলুন স্যার। গাড়ি আর ডেরাইভার নাকি পাঁচশো টাকাতে কিনেছেন।

গপু সেনের এই স্বভাব। আমার সঙ্গে তো মোটে বছর দশেকেরই আলাপ। যাঁদের সঙ্গে বাল্যাবধি আলাপ, তাঁদেরও সকলকেই "স্যার" বা "আপনি" করে বলতেন। কাউকেই বেশি কাছে ঘেঁষতে না দেওয়ার এটা এক ধরনের বড়লোকি বর্ম। বুদ্ধিমান মানুষমাত্রই এরকম করেন।

আমি শুধিয়েছিলাম, কোত্থেকে গাড়ি কিনলেন?

পটনার এক বাঈজীর কাছ থেকে। পেয়ারী বাঈজী। সে এখন সুপার-অ্যানুয়েটেড। আগে শুধুই গাইত। শুনেছি, ভালই গাইত। তারপর গান ছেড়ে দেওয়ার পর "বাজাত"। এখন চিক্-ফেলা বারান্দায় বসে আলবোলায় পটনাই তামাক খায়। সকালে তিলের রেউড়ি। আর পেয়ারী তেওহারের দিনে পথ-বেয়ে-যাওয়া রঙ্গিলা তামাশা দেখে দোতলার ওই বারান্দাতেই বসে।

তা ড্রাইভারই বা কেন কিনতে গেলেন? পাঁচশো টাকাতে গাড়ি ও ড্রাইভার! বলেন কি গপুবাবু?

অবাক হয়ে বলেছিলাম আমি।

ইয়েস স্যার। তবে আর বললুম কী! অনেক মানুষই থাকেন যাঁদের গুষ্ঠিতে কেউ সাইকেল, খিদমদগার আর গানা-বাজানেওয়ালি ছাড়া কিছুই স্বহস্তে চালাননি। ডেরাইভারের পেয়োজন ছেল বইকী!

নাইনটিন-এইটটিন মডেলের গাড়ি আর সেম মডেলের ড্রাইভার। ড্রাইভার আগে বাঈজীর তবলিয়া ছিল। এখন তবলা ছেড়ে স্টিয়ারিং ধরেছে। নাইটিনটিন-টুয়েন্টি এইট মডেলের একটি পায়জামাও ছিল নাকি ডেরাইভার সাহেবের। সেটি ক্ষয়ে-ক্ষয়ে এখন

আন্ডারওয়্যার হয়ে গেছে।

গপু সেন বললেন, রেডিওর ঘোষকের মতো।

কী বলব ভেবে না পেয়ে, গপু সেনের সঙ্গে করিম মিঞার বাড়ি পৌঁছলাম। তখন করিম মিঞা থাকতেন বড়া মসজিদ থেকে বেশ দূরে একটি ঘিঞ্জি, গরিব, মলিন, মুসলমান পাড়ার মধ্যে। যেখানে অগণ্য ছেলেমেয়ে; নাকে সিক্‌নি-গড়ানো। ধূলি-ধূসরিত রাস্তা। দু'পাশে কাঁচা নর্দমা। প্রত্যেক বাড়ির সামনে একটু চবুতরা কতো। দু'দিকে সিমেন্টের বসার জায়গা।

বড় ভালোবাসতে জানতেন মানুষটা। হাঁড়িতে কি আছে না আছে তার খোঁজ তিনি কোনো বিবির কাছেই নিতেন না কিন্তু তাঁর বাড়িতে যে-কোনও সময়ের অতিথিমাত্রই নারায়ণ! মানুষটা হাতেমতাই-এর মতো অতিথিবৎসল। দিল্‌টা ছিল হারুনুর রশিদেরই মতো। একা খেতে পারতেন না কখনওই। বড়লোক-গরিব বিচার ছিল না কোনও। প্রত্যেক মানুষই ছিল তাঁর হৃদয়ের কাছের। কারো জন্যেই উষ্ণতার "কম্মী" ছিল না। সে তিনি আমীরই হন, বা ফকির।

করিম সাহেবের পাশের বাড়িটি ফাঁকা পড়ে ছিল। গিয়ে দেখলাম, তারই চবুতরাতে টি-এইট মডেল ফোর্ডেয়া গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁড়িয়ে আছে মানে, বসে আছে। ইয়েস ম্যাডাম। ইটের পাঁজার উপর গাড়ির চেসিস্ তা'য়ে বসা উট পাখির মতো জম্পেস করে বসে আছে। পা নেই, ডানা নেই; লেজ নেই। যে-কোনো মুহূর্তে ডিম পাড়তে পারে। এমনই ভাব। "প্রেগন্যান্ট উইথ পসিবিলিটিজ!" এবং গাড়িরই পাশে লাল-রঙা সিমেন্টের বেঞ্চে এক পায়ের উপর অন্য পা কাঁচির মতো তুলে, না-শুয়ে, না-বসে, আফিং-এর মাত্রা পুরো করে সেই ড্রাইভার পেটের গেঞ্জি বুক অবধি গুটিয়ে তুলে নাইনটিন টুয়েন্টি এইট মডেলের পাজামা; অধুনা—আন্ডারওয়্যার পরে, ফুরফুরে হাওয়ায় বসা-অবস্থাতেই দিবানিদ্রা দিচ্ছেন।

দূর থেকে দেখলে মনে হয়, বেডফোর্ড ট্রাক-এর শক্-অ্যাবসর্বারই বুঝি!

গপু সেন, খুব সন্তর্পণে, যেন ঘুমিয়ে-থাকা বাঘের দিকেই আঙুল দেখাচ্ছেন; এমন ভাবেই তর্জনী তুলে আমাকে সেই আশ্চর্য চার-চক্রযানের রাহান্‌সাহান্ হাল-হকীকৎ বোঝাতে লাগলেন।

গাড়ির চার-চারটে চাকাই সলিড বিলিতি টায়ারের। কাঠের স্পোক। কোথাও-কোথাও সুরত্‌হারাম, আগ্রাসী, পরম-হাভাতে, "ফোরেন"-ভক্ত দিশি ছুঁচোরা "কোনওদিন খাইনি" বলে, আদিখ্যেতার চরম করে হেতা-হোতা থেকে বিলিতি রাবার খাব্‌লে-খাব্‌লে খেয়ে গেছে। করিম সাহেব তাতে বিন্দুমাত্রও না দমে অন্য এক বা একাধিক উৎস থেকে দিশি রাবার সংগ্রহ করে তা বড়-বড় পেরেক দিয়ে সেঁটে দিয়েছেন সব খোঁদলেই। কালো হয়ে-যাওয়া টেনিস বল্-এর মতো দেখাচ্ছে ফুলে-ওঠা জায়গাগুলোকে। যেন, পাকা ফোঁড়ার উপর তুঁতের তকমা।

আনসাসপেক্টিং— আমি শুধিয়েছিলাম, গাড়ি ইটের উপর বসে কেন?

গপু সেন বলেছিলেন, আপনি কী স্যার? পরে ধকল যাবে তো! তাই রেস্টে আছে। এটুকুও বুঝলেন না স্যার?

আমরা কবে যাচ্ছি জৌরী?

আমি শুধোলাম।

পরশু দিন।

শুনে অবধি ঘুম হয়নি আমার।

পরশু দিন করিম মিঞার গাড়ি "গুপু সেন অ্যান্ড কোম্পানিকে" তুলে যখন আমার ডেরা "দ্যা জ্যাকারান্ডাতে" এসে পৌঁছল ভরসন্ধেতে তখন মনে হল যেন কোনও প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারই এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির সামনে। ঘটা-ঘং-চকা-চক্ কিট্রি-কিটি লাকু-ফাকু-ঝিং-ঝিং— চ্যাক্-চ্যাক্ নানা আওয়াজ উঠছিল সেই স্টার্টে-রাখা কিন্তু দাঁড়িয়ে-থাকা গাড়ি থেকে। যেন বীটোভেনিক অর্কেস্ট্রা! আর মাঝে-মাঝেই সাইলেন্সার থেকে দুর্বাসা মুনির চোখের দোজখ-এর বহুযুগ-সঞ্চিত অভিশাপ নিয়ে তামিলনাড়ুর হাউইয়ের মতো আগুন ছুঁড়ছে হুস্-হুস্স করে। "টু ক্যাপ ইট অল" মাঝে-মাঝেই কঁকর্-কঁর্র্র্র্ আওয়াজ করে ট্রাম্পেটের মতো বাল্ব-হর্ন এমনই আওয়াজ করছে যে, যে-কোনও সুস্থ মানুষকেও তা হার্টফেল করিয়ে মারার পক্ষে যথেষ্ট।

করিম সাহেব বললেন, আরে আইয়ে না। রাতভর্ চলনে সে তব্‌হিনা পৌঁছেগা জৌরী! দের কাহেলা? দের কর্‌নে সে বরাত আ পৌঁছ যায়ে গা।

রাতভর? রাতভর চল্‌না পড়েগা কা?

বলেন কি রহিম সাহেব?

আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম।

এক রাতেও কি পৌঁছনো যাবে?

গপু সেন বললেন, অন্তর্যমী হয়ে।

পেছনের সীটের দরজা খুলে দিলেন করিম সাহেব নিজে। স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন পেছনের সীটের উপর, পর্যাপ্ত মহুয়া সেবনের পর "স্বয়ংসিদ্ধ" হয়ে। নিম্নাঙ্গে খাকি ব্রিচেস্। উর্ধ্বাঙ্গে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি। গা দেখা যাচ্ছে। তীব্র গুলাব ইত্বরের গন্ধ বেরুচ্ছে বুকের কাঁচাপাকা চুল থেকে। হাসিখুশি গপু সেন হাসা-হাসি মুখে উঠে বসলেন।

আমি উঠে গাড়ির দরজা বন্ধ করে বসে পড়তেই কে যেন আঁউ! আঁউ! ইস্‌স্! পেছনে সজোরে খামচে ধরল। কে?

কে র‍্যা? কে?

আমার মধ্যে থেকেই কেউ নীরবে জিগাইয়া উঠল।

আর কে র‍্যা? সাধের ট্রাউজারের আধ-গিরে কাপড় সেখানেই লট্‌কে রইল। পশ্চাদ্দেশে ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। হায় হায়! অমন অ্যামেরিকান ব্যারেথিয়া কাপড়ের ট্রাউজার। দুঃখের কথা কম্মু কারে!

স্বগতোক্তির মতো বললাম, হায় রাম!

রাম না কহো; কহো রহিম।

ড্রাইভার সাহেব ধমকে বললেন।

তাঁর কানের দু' ফুটো দিয়ে হিম্বা ইত্বরের তীব্র গন্ধ হুড়হুড়িয়ে বেরুচ্ছিল রাতের হিলহিলে হাওয়ার সঙ্গে।

গপু সেন ফিসফিস করে বললেন, এ তো জানে না আমাদের রহিম কি চিজ! মানে, গাড়িওয়ালা রহিম। ফিরে আসি, লড়িয়ে দেব। তাপ্পর দেখব।

করিম সাহেব বললেন, ঘাবড়ানোকো কুছ্ নহী।

নহী, নহী। ঘাবড়ানেকো ক্যা··· ?

বলেই, জোর করে সীট থেকে উঠে পড়ে দেখলাম যে, দুটি উর্দু আখ্‌বারকে ন্যাংটো

কয়েল-স্প্রিংয়ের উপরে গঁদের আঠা দিয়ে চমৎকারভাবে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। তাই না দেখে, আপনা থেকেই আমার মুখ-নিঃসৃত হল : ইয়া আল্লা !

বিপদের শেষ সেখানেই হল না। গাড়ি যখন শহর পেরিয়ে ফাঁকা রাস্তায় পড়ল তখন দেখা গেল যে, গাড়ির হেডলাইট দুটি টলটলায়মান মাতালের মতো ব্যবহার করছে। মাথা নাড়াচ্ছে এধারে ওধারে। ক্রমাগত। একবার এদিক আরেকবার ওদিক।

মনে হল, "স্বয়ংসিদ্ধ" করিম সাহেবের নেশাই বোধহয় ঘুষে গেছে হেডলাইট দুটোর মধ্যে। এই ঘুষ-ঘাষের দেশে কোথাওই কিছু ঘুষে যাওয়া বিচিত্রই বা কী !

গপু সেনের ট্রাউজারও কয়েল স্প্রিংয়ে সেঁটে গেছিল। তবে উনি এতই বড়লোক যে, দশপুরুষ খরচা করেও জমানো টাকা শেষ করতে পারবেন না। তাঁর ট্রাউজার না ফাটলে দর্জিগলির দর্জিরাই বা খাবে কি ? উনি, উনি ; আমি, আমি !

তবুও উনিও রাগতস্বরে বললেন, ঈ ক্যা বাত ? অব্ তো লাগ্তা প্যায়দল্হি যানে সে আচ্ছা থা।

করিম সাহেব অপত্যস্নেহে বললেন, আর্রে, ছঁওড়াপুত্তান্। এ যে হাজারীবাগেরই গাড়ি ! শিকারকা গাড়ি ! চারদিকেই জঙ্গল। তাওকি জানা নেই ? তাই হেডলাইট সেইরকমই। একদফে জঙ্গল ; একদফে রাস্তা। একদফে ইধির, একদফে উধির। তব্হি না মজা আ যায়েগা !

গপু সেন চুপ করে রইলেন। উত্তর দিলেন না।

রাস্তা এই ল্যাপে, মানে বনা দাগ থেকে সীমারিয়া পর্যন্ত আগাগোড়াই কাঁচা। কিন্তু পাথুরে। এবং করোগেটেড।

টুটিলাওয়ার কাছে এসে হঠাৎই করিম সাহেবের ভাতিজা বছর ষোলো-সতেরোর শাকলু মিঞার মাথাটা একবার উঁচু একবার নিচু হতে লাগল। শাক্লু বসেছিল সামনের সীটে। বাঁদিকে।

গপু সেন বললেন, ফিসফিস করে ; হলটা কি ? অর্যমা স্যার ?

আমি শুধোলাম করিম সাহেবকে, ওয়াক্ত কিত্না হুয়া মিঞা সাব ?

ভূতে-প্রেতে, জিন-পরীতে, কিচিং-দারহাতে ধরল না তো সকলকেই ! রাতের জঙ্গল বলে কতা !

ভাবছিলেন, গপু সেন।

করিম সাহেব ড্রাইভার সাহেবকে গাড়ি থামাতে বললেন।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে, সামনের দিকে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে বোঝা গেল যে, না, দারহা বা কিচিং ভূতের ভয়ের কিছু নেই। যেখানে যেখানে হা-ভাতে আদেখলা ছুঁচোরা ভীষণ ভালবেসে সলিড রাবারের টায়ার থেকে খাব্লে-খাব্লে খেয়ে গেছিল এবং অন্য উৎস থেকে সলিড রাবার সংগ্রহ করে যেখানে-যেখানে পেরেক দিয়ে সাঁটা হয়েছিল তারই নতিজা এই উৎকট উল্লম্ফন। অর্থাৎ সেই অজীর্ণ যন্ত্রযানের চাকা যেই-না সেই দলা-পাকানো জায়গাতে আসছে ঘুরে, অমনি টেনিস বল বলছে : "আম্মো আচি"। আর সঙ্গে-সঙ্গে শাক্লু মিঞার মাথা "তোম্মা" হয়ে যাচ্ছে এবং যেই সেই গোম্মা নড়ে যাচ্ছে আবারও 'ফোম্মা" হয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে আবার বিপদ ! আরও বিপদ ! এতদিন "পারফেক্ট রেস্ট"-এ থাকাতে বনেটের নিচে···

না, যোজনগন্ধা, তুমি যা ভাবছ তা নয়। "নট আ বী আন্ডার দ্যা বনেট।" বাট

ওলমোস্ট। না স্যার! না মাদাম! "বী" নয়, মধুকরী নয়; নেংটি ইঁদুর। ধাড়ি মাদী; বাচ্চা। অগণ্য। হ্যামলিনের বাঁশিঅলাও ফেল। ন্যাংটো; লাল লাল। গাড়ি রেস্ট-পীরিয়ড-এ থাকাকালীন বনেটের পরম নিরাপত্তার নিচে ঘরকন্না করে ফ্যামিলি-প্ল্যানিং-এর মুখে হিসি করে এতই সংখ্যাধিক্য ঘটিয়েছিল তারা যে, এঞ্জিন গরম হতেই, তাদের গরম লাগতেই বনেটকে ডুবন্ত নৌকোর মতো পরিত্যাগ করে তারা "পিসেঞ্জারদের" সর্বঅঙ্গময় দৌড়াদৌড়ি করতে নেইগেচেল।

গপু সেন বললেন, এ কী কেলো রে বাবা!

ইতিমধ্যে গাড়ি একটি কজওয়ের উপরে প্রায় এসে গেছে। গরমের দিন। শুকনো পাহাড়ী নদীর বালিময় বুক, পথের উচ্চতা থেকে বড় জোর দু'হাত নিচে। কজওয়ের ঠিক উপরে গাড়িটা উঠে আসতেই হঠাৎ ড্রাইভার "ইয়া আল্লা!" বলেই, হাত-পা ছুঁড়ে এক বিকট চিৎকার করে উঠলো। তারপর ঠিক কী যে হল তা বোঝার আগেই করিম সাহেবের পেয়ারী বাঈজীর পেয়ার-সম্পৃক্ত গাড়ি কজওয়ে থেকে "গিড়কে", কাত হয়ে পড়ল বালির উপরে।

নিপাতিত অবস্থা থেকে বহু কষ্টে "হিজ হিজ হুজ হুজ" চেষ্টাতে নিজেদের উত্থিত করে যখন একে অন্যর দিকে প্রত্যেকে তাকালাম, তখন দেখা গেল; কারোই কিছু হয়নি।

নক্কী গাড়ি।

গপু সেন বললেন।

করিম সাহেব রোষকষায়িত নেত্রে ড্রাইভার সাহেবকে বললেন, পইলেহিসে শক্ থা। তয়াল্‌চি কভ্‌ভি ডেরাইভার বন্‌না শক্‌তা হ্যায়?

আফিং-এর নেশা ছুটে-যাওয়া ড্রাইভার সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "লেঃ লট্‌কা। হামারা ক্যা কসুর বা? ইক্ খতরনাক্ চুহে ঘুষ গ্যায়াথা হামারি আন্ডিরউয়ারমে!"

সত্যিই! এ দেশটাকে ঘুষ-ঘাষেই খেলো!

আমি ভাবলাম।

যদিও ওই গাড়িতে চড়েই সে-যাত্রা জৌরী যাওয়া হয়েছিল, নইলে করিম সাহেব দুঃখ পেতেন খুউবই কিন্তু অন্তর্জলিযাত্রার সঙ্গে সে-যাত্রার তফাত বিশেষ ছিল না।

এই ঘটনার পর থেকে করিম সাহেবের ওই গাড়ি আরও কয়েক মাস তাঁর মালিকানাতে থাকলেও গাড়ির প্রয়োজন আমার কখনও কালে-ভদ্রে পড়লে রহিমের গাড়িই ভাড়া নিয়েছি। করিম সাহেবের গাড়ি তারপরে আর চড়িনি। সুযোগও হয়নি। সাহস তো নয়ই!

কিন্তু এ নিয়ে করিম সাহেবের মনে গভীর দুঃখ ছিল। একদিন বলেছিলেন, গাড়ি কিনলেই বড়লোক হওয়া যায় না। মালিক বড়লোক না হলে, গাড়ির মতো একটা প্রাণহীন যন্ত্রও গরিব ইন্‌সানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। বুঝেছেন অমর্যাবাবু!

কথাটা ফ্যালনাও নয়। ভাববার মতো কথা। ক্যাপিটালিস্টদের হীন "চক্কান্ত" যে ইন-অ্যানিমেট অবজেক্টদেরও অ্যাফেক্ট করে তা জেনে দুঃখিত হয়েছিলাম!

চিঠিটি দুদিন ধরে লিখলাম। বড় হয়ে গেল খুবই। নিজেই যাব পোষ্ট করতে। বেশি টিকিট লাগবে তো!

তোমার ধৈর্য থাকবে কি না পড়ার সেই হল কথা!

ইতি—
অর্যমা

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
গ্রেটার কৈলাস ওয়ান
নিউ দিল্লি

দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা, কল্যাণীয়াসু,

মকবুল সাহেবের বাড়িতে গত রাতে আবার শুনলাম মুরতেজা খাঁ-এর গান। উস্তাদ মুরতেজা খাঁ নবীন যুবা। যুবক শম্বরের মতো তাঁর সুডৌল দৃপ্ত গ্রীবা। কিন্তু মুখশ্রী বেশ খারাপ। কুত্‌কুতে দুটি চোখ সিঁড়িঙ্গে শরীরের ওপরে। মাথার উপরে, ছবিতে দেখা আবদুল করিম খাঁ সাহাবের উত্তুঙ্গ পাগড়ির মতো বহুবর্ণ উত্তুঙ্গ পাগড়ি। ইঁদুরের মতো গোঁফ। অথচ দাড়ি বলতে তেমন নেই। মনে হয় মাকুন্দ। নিচের ঠোঁটটি ঝুলে পড়েছে "জুদা" হয়ে। পান-দোক্তা, বিরিয়ানী খাওয়া এবং শরাব-পীনা মুখগহ্বরের ঠিক ওপর থেকে আরশুলার শুঁড়ের মতো বাদামি-রঙা দাঁড়া নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। নাকের চুল।

কথায়ই বলে, "পহিলে দরশনধারী, পিছলে গুণবিচারী"।

নারী বিধাতার এক কিমতি সৃষ্টি। লাখো প্রাণীর মধ্যে এক। মানুষের মধ্যেও রূপেগুণে সর্বদিক দিয়েই সেরা। কিন্তু পুরুষের বেলা তার গুণ, তার যশই তার পরিচিতি। রূপ ও গুণের সমন্বয় ঘটলে তো নারী সৃষ্টির এবং কখনও-কখনও ধ্বংসেরও দেবী হয়ে ওঠেন। কিন্তু নির্গুণ রূপবান পুরুষ চিরদিনই "মাকাল ফল"-এর কুখ্যাতি অর্জন করেছে। গুণ থাকলে পুরুষের রূপের অভাবকে চিরদিনই অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা, এই শিরোপা দিতে নারীরাও কখনও কার্পণ্য করেন না।

উস্তাদ মুরতেজা খাঁ সাহাবকে প্রথমে দেখাতে, নয়ন-পীড়নকারী "গিদ্দর" বলেই মনে হয়েছিল। তাছাড়া, মানুষটির চোখের চাউনি, কথার বে-তাহ্‌জিব ছেড়-ছাড় দেখে একেবারে তমদ্দুন-হীন বে-আদব মানুষ বলেও মনে হয়েছিল। এও মনে হয়েছিল যে, মানুষটির মাথার গোলমাল আছে। ছিটিয়াল। সিড়ে।

উস্তাদ মুরতেজা খাঁ সাহাব গার্ন আরম্ভ করার আগে হঠাৎ বলে উঠলেন, "জিলাইবী, রাবড়ি ঈসব ক্যা হুয়া?"

সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সামনে গৃহস্বামী মকবুল মিঞার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। রসভঙ্গ হল সভার। উনি তাড়াতাড়ি হাত জোর করে বললেন, চলিয়ে চলিয়ে। গুস্তাকি মাফ্ কিজিয়েগা। বলে, তাঁকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। শ্রোতারা প্রথমে স্তব্ধ, তারপরে গুঞ্জরন করে উঠলেন।

আবদুল হলীম শরর্-এর বিখ্যাত বই "গুজিশ্‌তা লখনৌ" মানে, "পুরনো লক্ষ্ণৌ"তে এইরকম একজন ছিটেল গায়কের কথা আছে। ("গুজিশ্‌তা লখনৌ" : অনুবাদক মুনীরা খাতুন এবং গুরুদাস ভট্টাচার্য : (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লী।) লক্ষ্ণৌ-এর

নবাব গাজীউদ্দিন হায়দারের রাজত্বকালে গান বাজনার জগতে তিনি এক বিরাট আচার্য ছিলেন লক্ষ্ণৌ-এর। গায়কের নাম ছিল হায়দরী খাঁ।

সেই হায়দরী খাঁ ছিলেন ভারি ছিটগ্রস্ত। উর্দুতে, 'সিড়ে'। ছিটেল বলে তাঁর নামই হয়ে গেছিল "সিড়ে হায়দরী খাঁ"। থাকতেন লক্ষ্ণৌ শহরেরই গোলাগঞ্জে।

নবাব গাজীউদ্দিন হায়দরের খুব ইচ্ছে ছিল 'সিড়ে হায়দরী খাঁ'-র গান শোনার কিন্তু কখনওই সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তা একদিন তৃতীয় প্রহরে নবাব "হওআদার"-এ, মানে কাহারেরা যে পালকি বয়ে নিয়ে যায়, তাতে চড়ে তো গোমতী নদীতীরে বেড়াতে গেছেন! দেখা গেল, রুমী দরওয়াজার নিচে নিচে 'সিড়ে হায়দরী খাঁ' চলেছেন। আপন মনে, মন-মৌজী মানুষ।

বাদশার অনুচরেরা তাঁকে দেখামাত্রই বাদশাহকে বলল, "কিব্‌লা-এ আলম!" ঐ যে, ওই মানুষটিই সিড়ে হায়দরী খাঁ।

বাদশাহ বললেন, বুলাও।

নবাবের লোক, ধরে আনতে বললে, বেঁধে আনে। সঙ্গে-সঙ্গে উস্তাদকে ধরে এনে তো সামনে দাঁড় করিয়ে দিল।

বাদশাহ বললেন, আরে মিঞা আমাকে আপনার গান শোনাবেন না?

গায়ক বাস করেন সুরের জগতে, যেখানে স্বরই খুদাহ; তাল ব্রহ্ম, সরস্বতীর অঙ্গনে। লক্ষ্মীর বরপুত্রকে তিনি চেনেনই না। যেখানে ভাবের রাজপথ, তালের খিলান, লয়ের বুলান্দ দরওয়াজা, তানকারীর প্রস্রবণ, ফিরত তান আর চুটকি তানের নক্ষত্র; তিনি কেন খোঁজ রাখতে যাবেন কে নবাব আর কোথায় তাঁর প্রাসাদ?

সিড়ে হায়দরী খাঁ বললেন, শোনাব না কেন? বেশক্ শোনাব। তা মশায়, আপনার থাকা হয় কোথায়? আমি তো আপনার ডেরা চিনি না।

বাদশাহ মনে-মনে বিলক্ষণ চটলেন। ছিটেল গায়কের একি বে-আদবী! যে রাজ্যে বাস তার নবাবকেই চেনে না! এ কেমন লোক! বদতমিজ প্রজা।

তবু উনি বললেন, তা আমার সঙ্গেই চলো। আমি নিজেই তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব।

"বহুত খুব" বলে কোনওরকম শিষ্টাচারের পরোয়া না করেই তো সিড়ে হায়দরী খাঁ নবাবের সঙ্গে চললেন। নবাব গাজীউদ্দিন হায়দরের প্রাসাদ "ছত্তর মঞ্জিল"-এর কাছে পৌঁছতেই হায়দরী খাঁর মেজাজ গেল বিগড়ে। বললেন, যাচ্ছি তো! কিন্তু রাবড়ি মালাই খাওয়াবেন তো? তা না হলে কিন্তু গাইব না।

বাদশাহ বললেন, হবে হবে।

"ছত্তর মঞ্জিলে" পৌঁছোবার পরে নবাবের অনুচরেরা তাকে রাবড়ি মালাই খাইয়ে দেওয়ার পর বাদশাহ বললেন, এবারে গাও।

সিড়ে হায়দরী গান শুরু করলেন। নবাব তো গান শুনে মোহিত। একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন।

এক সময় গান থামল।

সিড়ে হায়দরী নবাবের আলবোলা দেখিয়ে বললেন, আরে অ মশাই! আপনার "পেচওয়ানে" (নলে) যে তামাক ভরা আছে তা তো খাসা বলে মনে হচ্ছে। কোন দোকান থেকে তামাক কেনেন আপনি? অ্যাঁ?

নবাব গাজীউদ্দিন হায়দার নিজেও ছিলেন "সিড়ে"। রাস্তা থেকে নিজের সঙ্গে ঈজ্জত

দিয়ে যে পথের মানুষকে, একজন গানেওয়ালাকে নিয়ে এলেন তারই এমন থার্ড ক্লাস প্রশ্ন শুনে তো তিনি একদম নারাজ হয়ে গেলেন। ভীষণই ক্ষমতাবানেদের কাছে শুধুমাত্র মোসাহেবদেরই কদর। মাথা উঁচু করা, কুর্নিশ না-করা মানুষদের তাঁরা অপছন্দ করেন।

"এ ব্যাটা সিড়ে জানেই না আপনি কে ? এটা একটা উন্মাদ।"

মোসাহেবরা বলল।

তারা তো পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে আবার রাবড়ি মালাই খাওয়াল সিড়ে হায়দরী খাঁকে। তামাক খাওয়াল। সিড়ে হায়দরী খাঁ একপো পুরী, আধপো মালাই, এক পয়সার চিনি কিনিয়ে আনিয়ে তাঁর বিবির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এই ছিল সিড়ের নিয়ম।

এদিকে যতক্ষণ এইসব কাণ্ডমাণ্ড চলছিল পাশের ঘরে ততক্ষণ নবাব "খুম্-পেখুম" ভরকে শরাব চড়াচ্ছিলেন। নেশা, মাথায় চড়ে গেল। সিড়ে হায়দরী খাঁর কথা যখন তাঁর মনে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গেই ডেকে পাঠালেন তাঁকে।

বললেন, দ্যাখো হে বাপু, যা বলি, তা কান খুলে শোনো। তুমি যদি এবারে গান গেয়ে শুধু আনন্দই দিতে থাকো, কাঁদাতে না পারো ; তবে কিন্তু মনে রেখো, গোমতী নদীর জলে তোমাকে আমি চুবিয়ে মারব।

এইবারে সিড়ে হায়দরী খাঁর রাবড়ি-মালাই-এর খুশি উত্‌রে গিয়ে আক্কেলগুড়ুম্ হয়ে গেল।

বললেন, হুজৌর, আল্লা মালিক !

তারপর গাইলেন সেই গুণী। গাইলেন, সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে। অচিরেই বাদশাহর উপরে সেই যাদুকরী গানের প্রভাব ছড়াতে লাগল। খুদাহ্‌র কুদরত্ ছিল অথবা সিড়ে হায়দরীর তখনও আয়ু শেষ হয়ে যায়নি। নবাব গাজীউদ্দিন হায়দর সিড়ে হায়দরী খাঁ-র গান শুনে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন।

গান শেষ হলে, বেশক্ খুশি হয়ে নবাব বললেন, শোনো হায়দরী খাঁ, তোমার গান শুনে আমি খুউবই খুশি হয়েছি। তুমি কী চাও বলো আমার কাছে ? যা চাইবে, তাই দেব আমি। আমি শপথ করছি।

যা চাইব তা-ই দেবেন ?

সিড়ে হায়দরী বললেন।

হ্যাঁ। যা চাইবে তাই দেব।

সিড়ে হায়দরী তিন সত্য করিয়ে নিলেন নবাবকে দিয়ে, যা চাইবেন তাই দেবেন নবাব।

গায়ক বললেন, তা হলে শুধু এই চাই আপনার কাছে যে, হুজৌর আমাকে আর কখনওই ডাকিয়ে পাঠাবেন না। গানও শুনতে চাইবেন না।

তাজ্জুব বনে বাদশাহ্ বললেন, কেন ? এ আবার কী কথা ?

সিড়ে হায়দরী খাঁ বললেন, আপনার আর কী ! আপনি মরে গেলে আরেকজন হায়দর তখুনি বাদশাহ বনে যাবেন। কিন্তু আমাকে মেরে ফেললে আমার মতো আর একজন গায়ক হায়দরী খাঁ আর কখনওই জন্মাবে না।

জবাব শুনে নবাব ব্যাজার হয়ে, মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

আর সিড়ে হায়দরী সটান প্রস্থান করলেন স্বগৃহে।

শেষ করলাম এখানে। উস্তাদ মুরতেজা খাঁ-এর গানের কথা পরে।

যে শিল্পীর, যে সাহিত্যিকের, যে চিত্রকরের, যে গায়কের গর্ব নেই, অভিমান নেই ;

তিনি শিল্পীই নন)
(এই গর্ব, তাঁর শিল্পেরই গর্ব ; নিজস্ব গর্ব নয়।)

ইতি—
অর্যমা

পুনশ্চ : গপু সেন সে রাতে চলৌনের জঙ্গলে চিতাবাঘটি মেরেছিলেন।

দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা,
কল্যাণীয়াসু,

রোজই লিখব লিখব করে এতদিন লিখে উঠতে পারিনি। চিঠিপত্র-র গোলমালও হচ্ছে আজকাল খুবই। তোমার বা ওদেরও কারো চিঠি পাইনি। বহুদিন পরে লিখছি।

তোমরা হাজারীবাগ থেকে সকলে চলে যাওয়ার পরই ভারি ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে। একাকিত্বতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম যে, আমার জীবনযাত্রায় এক ভীষণ নাড়া কিংবা সাড়া যা-ই বলো, পড়ে গেছিল) এবং (এই নাড়া-সাড়ার পরই, উত্তেজনার পরের শ্রান্তির মতো এক শ্রান্তি আমাকে পেয়ে বসেছে।)

মেয়েরা পুরুষের জীবনের শূন্যতা যে কতখানি পূরণ করে সেই সত্য তোমরা এবারে এসে বিশেষ করে প্রমাণ করে দিয়ে গেলে।

যা কখনও পাইনি, তা স্বল্পসময়ের জন্যে পেয়েই, হঠাৎই এক অভাববোধও জন্মে গেছে। জানিনা, এই স্থায়ী শূন্যতা কী করে পূরণ করব।

তোমরা থাকাকালীন মকবুল সাহেবের বাড়ি যেদিন মুরশেদের গান ছিল সেদিন তো প্রায় শ'খানেক মানুষ গেছিলেন তাঁর বাড়িতে। অর্ধেক পুরুষ, অর্ধেক নারী। এত মানুষের মধ্যে আমি শুধু একজনকেই দেখেছিলাম বা দেখছিলাম। সেই নারীর নাম যোজনগন্ধা।

তুমি বেশি শাড়ি হাজারীবাগে সঙ্গে আনোনি। অথবা জানি না, তোমার বেশি ভাল শাড়ি হয়তো নেইও ; কিন্তু যে সাধারণ নীলাভ সিল্কের শাড়িটি তুমি পরেছিলে তাতেই তোমাকে সকলের থেকে একেবারেই আলাদা করে দেখেছিল আমার চোখ। অনেক মহিলা, অনেক মহামূল্য অলংকারে সেজে এসেছিলেন। অনেকে মহার্ঘ শাড়িতেও। কিন্তু তোমার দীর্ঘ পদ্মডাঁটার মতো শরীরে কোণারকের মন্দিরগাত্রের মিথুনমূর্তির নারীর খোঁপার মতো খোঁপাতে, বাঁ কানের পাশে অসময়ের একটি হলুদ চন্দ্রমল্লিকা ফুলে, তুমি সবাকার সব সাজ ম্লান করে দিয়েছিলে।

তোমার দীঘল আনত চোখ দুটি, তোমার আশ্চর্য ঘুম-ঘুম আঁখিপল্লব ; তোমার বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখের মণি—দুটি তোমাকে আমার চোখে বিশ্বের সর্বোত্তমা সুন্দরী করে তুলেছিল। এ আমার মনগড়া কথা নয়।

বানিয়ে বানিয়ে কিছু গল্প-উপন্যাস যে লিখি না তা নয়! কিন্তু আমার এই কথার মধ্যে এক ফোঁটাও মিথ্যে নেই।

সেই ছেলেবেলার ফ্রক-পরা-তুমি আর মকবুল সাহেবের বাড়ির স্বপ্নিল সেই-তুমির মধ্যে যে-ক'টা বছর গলে গেছে সেগুলোর জন্যে আমার বড়ই দুঃখ হচ্ছিল। তোমার এই বড়-হয়ে ওঠার পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস আমার চোখের দস্তাবেজে কেন যে ধরা রইল না, তা ভেবেই ভারি মন খারাপ করে।

হাজারীবাগে এখন ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। তোমরা শরতে এসেছিলে। হেমন্তে বা শীতে না এলে হাজারীবাগকে উপভোগই করা যায় না। আর আসতে হয় বর্ষাতে। সুখ ও দুঃখের সব অভিজ্ঞতা জাবর-কাটার, স্মৃতি-রোমন্থনের সময় এখানে, বর্ষা। খিচুড়ি খাও আর কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকো। হাজারীবাগের বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের বা পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টির মতো নয়। এখানের বৃষ্টি ফিস্‌ফিস্ করে পড়ে। বোঝাই যায় না যে, বৃষ্টি পড়ছে। লাল মাটি থেকে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ ওঠে। মোরব্বা ক্ষেতে খরগোস আর তিতিরেরা তখন দৌড়াদৌড়ি করে। মন্থর গতিতে চলে যায় বড় সাপ, অসাবধানী পাখি মুখে নিয়ে। বাতাসে ভিজে ইউক্যালিপটাস-এর আর অ্যাকাসিয়ার গন্ধ ভাসে। সঙ্গে নিম আর করমের গন্ধ। নিমগাছের ডালে মসৃণ, কোমল-গ্রীবার সুন্দরী ভেজা-কাক চুপ করে বসে কত কী ভাবে।

নিজেকে ফিরে পেতে হলে, বর্ষাতে অথবা শীতে ফিরে এসো হাজারীবাগে।

তুমি কি জানো যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই হাজারীবাগকে কী সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন? হয়তো তুমি জানো।

কবি অমিয় চক্রবর্তীকে (তখন তাঁর কবি পরিচয় এতখানি ছিল না) লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঐ স্তুতি করেছিলেন। ছাত্রাবস্থাতে অমিয় চক্রবর্তী যখন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন হাজারীবাগে চলে আসেন এবং এখানেরই সেন্ট কলম্বাস কলেজে ভর্তি হন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "তুমি ঠিক জায়গাতেই গেছ (হাজারীবাগে)—প্রকৃতি জীবনের ক্ষতস্থানে হাসপাতালের মতো ব্যান্ডেজ বাঁধাবাঁধি করে না : সে মন্ত্র পড়ে চুম্বন করে দেয়। তার আদরের অ্যান্টিসেপটিকে না আছে জ্বালা, না আছে কড়া গন্ধ।"

অতএব, নারী যোজনগন্ধা, প্রকৃতির চুম্বন চাও অথবা প্রকৃতির মধ্যে চুম্বন ; হাজারীবাগে চলে এসো। যখনই তোমার খুশি। যতবার খুশি।

গতরাতে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই নীল শাড়ি আর হলুদ চন্দ্রমল্লিকার তুমি, আমার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে কী যেন বলছ। হাওয়া এসে, উত্তরের হাওয়া ; কথাগুলি উড়িয়ে নিয়ে গেল।

ধড়মড়িয়ে ঘুম ভেঙে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। ঘড়িতে তখন রাত পৌনে দুটো।

তুমি গত রাতে, রাত পৌনে দুটোর সময়ে দিল্লিতে কি করছিলে?

জেগে ছিলে, না ঘুমিয়ে ছিলে?

খুব জানতে ইচ্ছে করে।

উত্তর দিও।

ইতি—
অর্যমা

শ্রীঅর্যমা রায়
দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ
বিহার

নিউ দিল্লি

অর্যমাদা,
শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠিটি, বড় সুন্দর চিঠি ; আজই পেলাম।

হাজারীবাগ থেকে এসে অবধি লিখব লিখব করে এতদিন হয়ে গেল অথচ আপনাকে একটিও চিঠি লেখা হল না। জানি না, আপনি কী মনে করেছেন ! খুবই লজ্জার কথা। অকৃতজ্ঞতারও !

হাজারীবাগে গিয়ে বড়ই প্রকৃতিহত হয়ে গেছি। আমূল বদলে গেছি মানুষ হিসেবে। আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপিত হয়েও। এত বছর পরে আর আপনার সঙ্গে দেখা না হলেই হয়তো ভাল ছিল। "প্রকৃতির চুম্বনের" ঘোর এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছি না। মন্ত্রও অবশ্যই পড়ে দিয়েছেন প্রকৃতি। শুধু চুম্বন দিয়েই ক্ষান্ত হননি।

আজ শনিবার। পর পর তিন দিন ছুটি থাকাতে এই প্রথম এই অবশ্য-করণীয় কর্তব্য করতে পারছি জেনে একটু স্বস্তি বোধ করছি।

কী ভাল যে কাটল ক'টা দিন হাজারীবাগে তা কী বলব ! ইলাবিলা আর সিনিবালির কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই এই কারণে যে, আপনার কাছে যাওয়াটা ঘটে গেল মুখ্যতঃ ওদেরই তীব্র উৎসাহে। এবং আপনার মাধ্যমে হাজারীবাগের সঙ্গেও আলাপটা ভালই হল। হাজারীবাগে না গেলে, "দ্যা জ্যাকারান্ডার" অনুষঙ্গে, পটভূমিতে, আপনাকে নতুন করে আবিষ্কার না করলে আমার পুরনো মাস্টারমশাইটি একটি কিশোরীর অর্ধ-উন্মোচিত মস্তিষ্কের আধ-ভোলা স্মৃতি হয়েই থেকে যেতেন।

এমন পুজোর ছুটি কখনও কাটাইনি। এমন হরিষেতো নয়ই। বিষাদেও নয়।

আপনার সঙ্গে পরিচয়টা নবীকৃত না হলে আমার জীবন সম্পূর্ণ অন্য খাতেই হয়তো বয়ে যেত। যে-জীবনের সারাৎসার সম্বন্ধে, গন্তব্য নিয়ে, আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না, ভেবেছিলাম যে, ছিলো না ; সেই জীবনই এক সম্পূর্ণ অন্য মাত্রা পেল। আপনার কাছে না গেলে, মানুষের জীবন যে মানুষেরই জীবন ; নির্জনতা যে মানুষকে মানুষ হয়ে উঠতে সত্যিই সাহায্য করে, তার জীবনের গতিপথের আঁক-বাঁক, তার নানাবিধ

মূল্যবোধের অলকা-পলকা রকমগুলি সম্বন্ধে অবহিত করে ; তাও জানা হত না।

এখন কি লিখছেন ? যে বড় লেখাটির কথা বলছিলেন, তা কি আরম্ভ করতে পেরেছেন ? না, এখনও ভাবাভাবিই চলেছে ?

ভালো থাকবেন। যতই দেরি হোক, দু' লাইন হলেও হোক, আমার চিঠির উত্তর দেবেন। নিজের চোখেই দেখে এসেছি আপনার চিঠির পাহাড় ! আপনি আমার মতো অগণ্য অনুরাগীদের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠি পান প্রতিদিন। জানি আমি। তবুও আপনার কাছ থেকে উত্তর না পেলে খুবই দুঃখ পাব। শরীরের লজ্জাস্থানের মতো, প্রত্যেক মানুষেরই মনেরও দু'-একটি গর্বস্থান থাকে। তা, সে মানুষ যত সাধারণই হন না কেন ! সেই গর্বে আঘাত লাগলে তা তার বুকে চিরকালীন ক্ষত এবং ক্ষতি হয়ে থেকে যায়। আশা করি, চিঠির উত্তর না পাবার মতো মন্দভাগ্য হব না।

কাল রবিবার ছিল। সারা দুপুর হাজারীবাগের অ্যালবাম খুলে ছবিগুলি বারবার দেখলাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। সিনিবালি সত্যিই ভাল ফটোগ্রাফার। পোট্রেট ফোটোগ্রাফারও বটে। "কার্শ অফ অটাওয়ার" ছোট্ট সংস্করণ। এবং ও নেচার ফটোগ্রাফারও।

আপনাকে পাঠানো ছবিগুলি পেয়েছেন তো ? জানিয়ে নিশ্চিত করবেন।

আপনার কত ছবিই যে তুলেছে ও কতরকম ভাবে। আপনার ঘরে, লেখার টেবলে, বারান্দায়, বেতের চেয়ারে, বাগানে, জাপানীজ গার্ডেন-এর পাশে। জ্যাকারান্ডা গাছের তোরণের নিচে আপনি দাঁড়িয়ে। পেছনে পথের দু'দিকে চলে গেছে গাছের সারি। দারুণ ছবিটি ! তবুও তো ফুল ছিল না একটিও গাছে ঐ সময়ে। জ্যাকারান্ডা কখন ফোটে ? কোথাকার গাছ এগুলো ?

আরেকটা ছবি আছে। সেটা আমার পছন্দর বলে সিনিবালি এনলার্জ করে দিয়েছে আমাকে। হারহাদ বাংলোর বারান্দায় তোলা।

সবাই করবেট, কান্হা-কিসলি, বান্ধবগড়, রানথাম্বার, পালামৌ, কাজিরাঙ্গা, জলদাপাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি ন্যাশনাল পার্কের নাম করতে অজ্ঞান হয়ে যায়, আমার কিন্তু হাজারীবাগ বা রাজডেরোয়া ন্যাশনাল পার্ক খুবই ভাল লাগল। জন্তু-জানোয়ার কত ও কতপ্রকার দেখা গেল, সেটা আদৌ বড় কথা নয়, জঙ্গল ; নিজেও যে নিজস্ব গুণেই অত্যন্ত দর্শনীয় ও মনোমুগ্ধকর, তার নিজের ব্যক্তিত্বও যে স্বরাট, মহিমাময় ; তা আপনার সঙ্গে জঙ্গলে না গেলে সত্যিই জানতাম না কখনও এই জীবনে।

আসলে, বেশিরভাগ মানুষই "মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার" গোছের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জঙ্গলে যান তো ! জঙ্গলেই গেলাম, অথচ হাতি দেখলাম না, বাঘ দেখলাম না বা গণ্ডার দেখলাম না তা হলে আর লাভ কি হল গিয়ে ? এমনই একটি ভাব আর কী ! আপনার কাছেই প্রথমে জানলাম যে, জঙ্গল যে ভালোবাসে, সে পথপাশের ঘাসফুলটিকেও ভালোবাসে। ভালোবাসে, শীতের ভোরের শিশির বিন্দুতে প্রথম আলো পড়ায় জ্বলতে-থাকা লক্ষ লক্ষ হীরেকে।

"অ্যামেরিকান ডায়মন্ড নয় ; আসল ডায়মন্ড !"

বলেছিলেন !

মাকড়সার জালের মধ্যে যখন সাতরঙা আলো, ডিবজোর ; ছড়িয়ে যায় ; তখন মনে হয়, ম্লান হয়ে গেল সাতরাজার ধন।

বলেছিলেন, আসল কথাটা হচ্ছে, প্রকৃতিকে ভালোবাসা !

কিন্তু এই ভালোবাসাটা গড়ে তুলতেও তো সময় লাগে। প্রকৃতিকে ভালোবাসা ও

প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসাটাও বোধ হয় মানুষকে ভালোবাসারই মতো ধীরে মনের মধ্যে গড়ে ওঠে। এই প্রসেস বা ক্রিস্টালাইজেশানের সময়টা ঠিক কতখানি দীর্ঘ তা বোধহয় নিজের পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়। সকলের পক্ষে তা সমানও নয়।

মোটে তিন দিন থাকাতে এবং আপনার সঙ্গেই সর্বক্ষণ থাকাতে হাজারীবাগ জায়গাটা সম্বন্ধে পুরোপুরি জানা হল না তেমন করে। কারণটা খুবই স্পষ্ট। আপনার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য যে আমাদের তিনজনেরই হাজারীবাগ সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের চেয়ে অনেকই বেশি ছিল।

বড় দিনের সময়ে প্রতি বছর কলকাতাতেই যেতাম। এবার ঠিক করেছি হাজারীবাগেই যাব। অবশ্য আপনি যদি তখন থাকেন সেখানে। যদি না থাকেন, তো পত্রপাঠ জানাবেন। এবারে, কিন্তু আমি একলাই যাব। সিনিবালি আর ইলবিলা আমার স্কুলের বন্ধু। কিন্তু প্রত্যেকের জীবনেই একটা সময় আসে, যখন একটু একা থাকতে ইচ্ছে করে। অথবা শুধুমাত্র একজনের সঙ্গে একা। তখন ভিড়, হি-হি, হা-হা, কোনও কিছুই ভাল লাগে না। তাছাড়া, জীবনের পথ বেয়ে যেতে যেতে, সময়ের অভিঘাতে প্রত্যেক মানুষের পথই আলাদা আলাদা হয়ে যায়, মানসিকতাও ; আমরা মানুষ বলেই। তাই স্কুল-কলেজে থাকাকালীন বন্ধুত্বটা যেমন অভেদ্য আত্মার থাকে তেমনটা পরে আর কখনওই থাকে না। না-থাকাটাই প্রত্যাশার।

আবারও যদি যাই হাজারীবাগে তাহলে আপনার কাছে একাই থাকব, থাকতে চাই।

এখন দু'জনে দু'জনের কাছে থাকাটাই বড় কথা। আর বাইরে থাকবে নির্জন প্রকৃতি। বাকিটা পুরোপুরিই ছাড়া থাকবে বিধাতার হাতে।

আমি জানি না, আপনি এই চিঠি পেয়ে আমাকে কি ভাববেন। নিজের সম্বন্ধেই বা কি ভাবছেন! কিন্তু অনেক অনেকদিন নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে, নিজের সঙ্গে নিজে ঝগড়া করে তারপরেই এই ক'টি লাইন লিখে ফেলার সাহসই বলুন, আস্পর্ধাই বলুন, নির্লজ্জতাই বলুন ; করে ফেলেছি।

অন্ধ দান চেলে দিয়েছি।

এখন দেখি, কী পাই ; কি পাই ?

ইতি—
মুগ্ধা, যোজনগন্ধা

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
নিউ দিল্লি

দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা, কল্যাণীয়াসু,

আমি এখন বারান্দায় বসে আছি। তোমার চিঠিটি সামনের টেবলে খোলা পড়ে

boiRboi.net

আছে। এ চিঠির উত্তর কথায় বা লেখাতে দেওয়া যায় না। মনে মনে বুঝে নিও। সব কথা বলার বা লেখার নয়।

এখুনি সন্ধে হবে। আমাদের বাগানের মালী পিটুলের বাড়ি যে গাঁয়ে, সে গাঁয়ের নাম সিংহানি। সেই গাঁয়ের দিকেই হাট ছিল আজ।

ও! তোমাকে জানানো হয়নি যে, তোমাকে পিটুল-এর খুব ভাল লেগেছে। সবসময়ই তোমার গল্প করে। কী যাদু করে গেছ ওকে তুমিই জানো!

মোটা বকশিশ দিয়েছো বুঝি?

দলে দলে মেয়ে-পুরুষ রঙিন জামাকাপড় পরে হাট থেকে ফিরছে। এখন বসন্ত বা গ্রীষ্ম নয়। যদি হত, তবে দেখতে পেতে যে, বাগানের কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া আর অমলতাসেরা যেন রঙের হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছে। দেখতে পেতে, ড্রাইভের দু'পাশের জ্যাকারাণ্ডা গাছগুলিতে ফিকে বেগুনি ফুলেরা কিশোরীর শেষ রাতের স্বপ্নর মতো স্তবকে স্তবকে নীরব উৎসারে ফুটে থাকত। জ্যাকারাণ্ডারা দেখবারই জন্যে। ছোঁয়ার জন্যে নয়।

হেমন্তর প্রকৃতির রূপ এক অন্য রূপ। প্রোষিতভর্তৃকা নারীরই মতো। স্নিগ্ধ, কিন্তু থমথমে, বিধুর। শীতের প্রতীক্ষাতে পথ চেয়ে থাকে তখন বিশ্বপ্রকৃতি। সেই শীতের রুখু মৌনী তাপসের আকর্ষণ যে কী, তা শুধু হেমন্তই জানে!

পশ্চিমাকাশে আজ কিসের যেন ষড়যন্ত্র চলছে। নিঃশব্দে। দিন শেষ হয়ে রাত আসার আগের মুহূর্তটিকে অনেক নামেই ডেকেছে মানুষ বিভিন্ন দেশে। কিন্তু তবু যেন এই মুহূর্তটির এখনও মনোমত নামকরণ করতে পারেনি। ঊষাকাল হচ্ছে দিনশিশুর জন্মসময়। আর এই সায়াহ্ন, প্রদোষ, অর্যমা সবই হচ্ছে একটি পরিণত দিনের পূর্ণতার শেষে শূন্যতার দিকে ধীর পায়ে হেঁটে যাওয়া। স্পষ্টতা থেকে অস্পষ্টতায়; আলো থেকে অন্ধকারে। এ দুইয়ে তফাত আছে বই কী!

হাজারীবাগ যখন এতই ভালো লেগেছে তখন তোমার যখনই ইচ্ছে হবে তুমি হাজারীবাগে আসতে পারো। মালী পিটুল, ধানিয়া আর বুধিয়া তো আছেই। অতএব আমি না থাকলেও তুমি যখন খুশি এসে থাকতে পারো। যে-ঘরটি আমার স্টাডি-কাম-শোবার ঘর, আমার নিজের সেই একটিমাত্র ঘরটি ছাড়া, তুমি অন্য সব ঘরগুলিরই দখল নিতে পারো। ওই ঘরে আমার বইপত্র, রেকর্ড, ক্যাসেট, ইজেল, ছবি আঁকার সরঞ্জাম, লেখার জিনিসপত্র এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে যে তাতে অন্য কারোকেই থাকতে দেওয়া সম্ভব হয় না। ওই ঘরে থাকার অধিকার আজ অবধি কাউকেই দিইনি। জীবনের বেলা পড়ে আসছে। আর কাউকে যে দিতে পারব এ-জীবনে, তাও মনে হয় না।

যদি কখনও কোনো নারীর সঙ্গে সহবাসও করি তবুও ওই ঘর আমার একারই থাকবে। তোমাকেও যদি দিতে না পারি, তা হলে বুঝতেই পারো আর কাউকেই দিতে পারব না।

আমি বড়ই অগোছাল যোজনগন্ধা। শরীরে, মনে, ভাবনাতে। আমার অগণ্য, টুকরো-টুকরাকে কুড়িয়ে নিয়ে জড়ো করে সুন্দর করে জোড়া লাগানোর মতো সৌন্দর্যজ্ঞান, ধৈর্য, আন্তরিকতা এবং গরজ আজ অবধি কারোই হয়নি। হয়তো হবেও না। বেশ আছি। সত্যি বলছি, বেশ আছি।

একা থাকায় যে কী আনন্দ তা অন্য কেউ না বুঝুক, তুমি তো বোঝো!

জীবনের পথে যতই এগোচ্ছি, এ-কথাটা বুঝতে পারছি যে, রক্তসূত্রের "আত্মীয়তা"টা কোনও মানুষেরই আসল আত্মীয়তা নয়। আসল আত্মীয়তা জন্মায় মানসিকতার নৈকট্যে, দৃষ্টিভঙ্গির মেলবন্ধনে ; মূল্যবোধের সমতায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আত্মার যিনি কাছে থাকেন, তিনিই আত্মীয়।" এও বলেছিলেন যে, রক্তসূত্রে যে আত্মীয়তা আমরা পাই তাতে কোনওই বাহাদুরি নেই। দৈন্যও অবশ্য নেই। জন্মসূত্রে কেউ রাজা হন, কেউ দীন দরিদ্র। কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ শূদ্র। যে আত্মীয়তা, জীবনের পথে চলতে চলতে আমরা ব্যবহারিক সূত্রে গড়ে তুলি তাতেই বাহাদুরী। সেই আত্মীয়তাই আসল আত্মীয়তা। গর্বের ধন !

সেই সুবাদে আমার অগণ্য পাঠক-পাঠিকারাই আমার আত্মীয়। তাঁরাই আমার মৃত্যুতে দুঃখ পাবেন। শবযাত্রাতে যোগ দেবেন। হয়তো !

আমার আত্মার এতো কাছে, পাঠক-পাঠিকাদের মতো আর কারাই বা আছেন ?

আর তুমি তো পরমাত্মীয় !

এখন অন্ধকার হয়ে গেছে একেবারেই। আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী। চিঠি লেখাও শেষ হল। চারধার কালো হয়ে এলো। সব রঙ মুছে গেল। এখন ঘরের আলো জ্বালবার সময়। হয়তো মনের আলোও। প্রতিদিনই শীত বাড়ছে এখন। বাইরের শীত, ভিতরের শীত।

"দ্যা জ্যাকারাণ্ডা"র বাগানের এক কোণে একটি শিউলি গাছ আছে, যাতে বারোমাসই ফুল ফোটে। পাশের বাড়ির মিসেস সেন বলেন, "বারোমাস্যা"। যখন তোমরা এসেছিলে তখন হয়তো লক্ষ করেছিলে তুমি। গাছেদেরও প্রাণ আছে। তারা প্রত্যেকেই আলাদা ব্যক্তিত্ব। তাদের না-দেখা, না-ইম্পর্টট্যান্স দেওয়াটা অমানুষিক। অভদ্রতা। যেখানেই যাবে, সেখানেই গাছেদের সঙ্গে পরিচিত হবে। বলবে, হাই। নাইস মীটিং উ্য ! বলবে, টেক কেয়ার !

"তুমিও" দ্যা জ্যাকারাণ্ডার "বারোমাস্যা" শিউলি গাছেরই মতো অন্য 'বারোমাস্যা' গাছ হয়ে সকাল-সন্ধে প্রতিদিন আমার উত্তরের প্রত্যাশাহীন চিঠির ফুলে-ফুলে আমাকে স্নিগ্ধ কোরো, ভরে দিও ; সুগন্ধি কোরো।

উত্তর অবশ্যই দেবো। তবে, না-পেলে নিজগুণে মার্জনা কোরো।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি

প্রীতিধন্য, অর্যমা রায়

boiRboi.net

শ্রীঅর্যমা রায়
দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ
বিহার

নিউ দিল্লি

অর্যমাদা, শ্রদ্ধাস্পদেষু,

এবারে কোজাগরী পূর্ণিমাতে দিল্লি থেকে হরিয়ানার পথে এক ভদ্রলোকের ফার্ম হাউসে গেছিলাম।

গেছিলাম, আসলে আগের রাতেই।

কী আশ্চর্য জ্যোৎস্না যে দেখলাম তা কী বলব।

উত্তর ভারতীয়দের চেহারাতে যেমন, জীবনযাত্রাতে যেমন, উত্তরভারতের প্রকৃতিতেও তেমনই এক রুক্ষতা আছে। যা সময়ে সময়ে ভাল লাগে, আবার সময়ে সময়ে খারাপও লাগে। ওদের জ্যোৎস্নাও যেমন ডাইনী-জ্যোৎস্না ওদের মানসিকতাও তেমন দানো-মানসিকতা। নানা বিজাতীয়দের আক্রমণ ওদের সহ্য করতে হয়েছে। মেয়েরা ধর্ষিতা হয়েছে যুগে যুগে নানা পুরুষদের দ্বারা। অনেকে পরিণীতাও হয়েছে। তাই ওদের সন্তান-সন্ততিদের চরিত্রেও একধরনের পাঁচমেশেলি, পাঁচফোড়নের গন্ধ মাখামাখি হয়ে গেছে। সেটা ভাল কী মন্দ, তা বলতে পারিনা। বলতে পারি, তীব্র গন্ধবাহী।

রিশিকেশ-এ এসেছি কাল রাতে। আজ "কাড়োয়া-চৌথ"। কোজাগরী পূর্ণিমার পরই কৃষ্ণা চতুর্থীতে এই উৎসব হয়। বিবাহিত তরুণী এবং মধ্যবয়সীরা হিমালয় থেকে নেমে আসা গঙ্গাতে প্রদীপ ভাসান আজ স্বামীর মঙ্গল কামনা করে। আমার দুই বান্ধবীর সঙ্গে এসেছি এখানে দিল্লি থেকে। একজনের বাড়ি দেরাদুনে। অন্য জনের চণ্ডীগড়ে।

আজ সন্ধেবেলাতে রিশিকেশ-এর ত্রিবেণী ঘাটে যে কী মেলা লেগেছিল, কী বলব। বিয়ের সাজে সেজে, গয়না পরে, মেয়েরা সকলে বিরাট চওড়া ঘাটে এসে পাহাড়ের "তাড়" পত্রে তৈরি ছোট্ট ভেলাতে, এক বিশেষ ধরনের মিষ্টি দিয়ে, ফুল সাজিয়ে ধূপকাঠি আর তার মধ্যে দিয়া, প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। দ্রুতগামী জলবাহিত হয়ে চলে যাচ্ছে অগণ্য দিয়া নদী বেয়ে হরিদ্বারের দিকে। জলের মধ্যে শত শত আলোর ফুল ফুটে আছে যেন!

কী ভাল যে লাগছিল দেখতে! মন্ত্রমুগ্ধের মতো নদীর দিকে, সুবেশা, সুগন্ধি-সালঙ্কারা বিবাহিতা মহিলাদের দিকে চেয়ে ছিলাম।

চেয়ে থাকতে থাকতেই কেন জানিনা, হঠাৎই দু চোখ আমার জলে ভরে এলো।

দিয়া ভাসাবো 'কড়োয়াচৌথ'-এ কারো মঙ্গলকামনায়; এমন তো আমার কেউই নেই!

মাঝে-মাঝে আপনার উপরে খুব অভিমান হয়। রাগও।

ভারী খারাপ আপনি অর্যমাদা !

এখানে থাকব আরও দু'দিন। পরশু রুদ্রপ্রয়াগ অবধি যাওয়ার ইচ্ছা আছে। জিম করবেট, আমার কাছে, আরেক ঈশ্বর। তাই রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতার কারণেই সে জায়গা আমার কাছে অন্য তীর্থ।

লক্ষ্মীপূর্ণিমাটা হাজারীবাগেই কাটিয়ে আসার ইচ্ছা ছিল। পরে কখনও যাব। একা। সিবা আর ইলার জন্যে আপনাকে এবারে একা পাওয়াই হলো না। ভীষণ রাগ হচ্ছিল।

হাজারীবাগ সত্যিই আমার মনের ক্ষততে "মন্ত্র পড়ে চুম্বন করে দিয়েছে"। সব দাহেরই প্রলেপ এ পর্যন্ত পেয়েছি তাতে। কোনো সাজারীরই প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ফেরার পর থেকেই আমি যে জরজর। আবার জ্বরজ্বরও বটে !

মানুষের জ্বরের কতরকম হয় আপনি জানেন কি ? মানুষী জ্বরের ?

স্কুলে না যেতে ইচ্ছে করলে, বগলতলিতে রসুন রেখে রোদে বসে যে জ্বর আনতাম ছেলেবেলায় ; সেই মিছিমিছি জ্বর। যে জ্বর, এই আসে আর এই ছেড়ে যায়, সেই ভালুকি-জ্বর। আর রাধা যে জ্বরে জরজর ছিলেন সেই জ্বর। কাম-জ্বর।

কোন জ্বরে ধরেছে আমায় কে জানে ! যে জ্বরেই ধরুক আমি যে জরজর তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

ভালো থাকবেন। নিজের জন্যে না হলেও আমার জন্যেই আপনাকে ভালো থাকতে হবে।

ইতি—
রোগিণী যোজনগন্ধা

শ্রীঅর্যমা রায়
দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ/বিহার

নিউ দিল্লি

অর্যমাদা, শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রেক্ষিতে আপনি আমাকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। একটি নয়, দুটি। মনে আছে কি ?

সেই দুটি চিঠিতে আপনি শিল্পী বিনোদবিহারী মুখার্জির কথাও লিখেছিলেন। নিশ্চয়ই, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদিদের কথাও। তাতেও যে আমার বিশ্বাস জন্মায়নি ঈশ্বরে সে কথাও সম্ভবতঃ আপনাকে জানিয়েছিলাম।

জানিয়েছিলেন যে, আপনার ঈশ্বর কোনো শক্তি, Super Power; যে-শক্তি এই ব্রহ্মাণ্ড চালনা করছেন, পৃথিবীর ভাল-মন্দ শুভাশুভ যাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন। মনে নেই, ঠিক এমনটিই বলেছিলেন কি না ! ঠিকমতো বলতে হলে চিঠির ঝাঁপি

থেকে সেই চিঠি দুটিকে বের করতে হয়। কিন্তু আপনার চিঠিতো ঝাঁপিতে নেই। এই মাত্র সেদিনই আপনার চিঠিগুলি যত্ন করে আমার লকারে রেখে এসেছি। শেষ দুখানি চিঠিমাত্র আছে হাতের কাছে।

সময় সুবিধামতো এ প্রসঙ্গে আরও যদি কিছু জানানতো খুশি হব।

উত্তর দেবেন।

ইতি—
যোজনগন্ধা

"দ্যা জ্যাকারাণ্ডা"
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা,

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠির উত্তর কী দেব ?

ঐ প্রসঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী শ্রীমতী সুরমা ঘটকের 'ঋত্বিক' বইতে উল্লিখিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা চিঠির বক্তব্যর কথা মনে পড়ে গেল। বিভূতিভূষণ শ্রীমতী ঘটককে লিখছেন :

"দেশে ফিরে এসেছি, ঘেঁটুফুল আর নেই, তবে পানকলম শেওলার সুগন্ধি কুচোকুচো সাদা ফুল ফুটেছে নদীজলে আর শিরিষ ফুল ফুটেচে আমাদের আমবাগানের পেছনে—নক্ষত্রমালা ও জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর পুঞ্জে পুঞ্জে নবনবরূপে যিনি বিদ্যমান, তিনিই কখনও ঘেঁটুফুলের শুভ্রদলে, কখনও কুঁচকাঁটার সোনালিফুলে আমাদের ঘরের পেছনে এসে ধরা দেন। নিতে পারলেই হল।

তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতিঃ

তিনি আছেন, তাই সব কিছুই আছে। তাঁর আলোতেই জগৎ আলো"।

এই "নিতে পারা" ব্যাপারটাই হচ্ছে আসল। নিতে পারার ক্ষমতা যাঁর এসেছে তিনিতো ভাগ্যবান।

বিজ্ঞানের চোখ-ধাঁধানো অন্ধ গরিমা ছেড়ে "যাঁর আলোতে জগৎ আলো" তাঁকে হৃদয়ে একটু বোঝার চেষ্টা কোরো।

ভালো থেকো।

ইতি—
অর্যমা

boiRboi.net

শ্রী অর্যমা রায়
দ্যা জ্যাকারাণ্ডা,
বিহার

হোটেল মন্দাকিনী
ইন্টারন্যাশনাল
হরিদ্বার রোড
রিশিকেশ

অর্যমাদা,

আজই লাঞ্চ-এর পরে এখান থেকে ফেরার কথা। দিল্লিমুখো বেরিয়ে পড়ব। আমার পাঞ্জাবী বন্ধু কমলেশ কৌর, এর মামারা খুব ধনী। হরিদ্বার রোডে কীসব কারখানা-টারখানা আছে। এয়ার-কন্ডিশনড কন্টেসাতে করে এসেছিলাম দিল্লি থেকে। সেই গাড়ি নিয়েই কাল গেছিলাম রুদ্রপ্রয়াগে।

কী বলব, এখনও যেন এক ঘোরের মধ্যেই আছি।

আমার অনেক বন্ধু, পুরুষ এবং মেয়ে ; বলেছে আমাকে আগে অনেকবারই যে, একবার পাহাড়ের প্রেমে যে পড়েছে, তার আর রক্ষে নেই। কথাটা শুনেছি, বার বার ; বিভিন্ন জনের মুখে। কিন্তু কথাটার তাৎপর্যর কিছুমাত্রও বুঝিনি। এতদিনে বুঝলাম।

এপ্রিলে মে'তে এলে রডোডেনড্রন ফুলের শোভা দেখা যেত। উপত্যকা আর ঘন জঙ্গলাবৃত গিরিখাদে গিরিখাদে তখন কাউফলও পাকতো। আর কাউফল-পাক্কৌ পাখি ডেকে ফিরত "কাউফল-পাক্কৌ" ! "কাউফল-পাক্কৌ" ! করে।

এই সবই শোনা আমার কমলেশ-এরই কাছ থেকে।

কিন্তু নেই নেই করেও এই শেষ অক্টোবরেও শোভা নেহাৎ কম কী !

আমাদের পূর্ব ভারতের হিমালয় দেখেছি, দেখেছি তিস্তা, রঙ্গিত, তোর্ষার সৌন্দর্য, পশ্চিম প্রান্তের কুমায়ুনী হিমালয় ও কোশী নদীর সৌন্দর্যও দেখেছি কিন্তু গাড়োয়ালী হিমালয়ে গঙ্গা, অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনীয় বেশি কিছু এই পৃথিবীতেই আছে বলে মনে হয় না আমার।

অ্যামেরিকার গ্রান্ড-ক্যানিয়নের ছবি দেখেছি। দেখেছি, ইতালীর পীরিনিজ পর্বতমালা, সুইটজারল্যাণ্ড এবং অস্ট্রিয়ার আল্পস ও স্পেন-এরও। আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো, মাউনটেইন অফ দ্যা মুন, (চাঁদের পাহাড়) রুয়েঞ্জোরী রেঞ্জ-এ। জাপানের মাউন্ট ফুজি। কিন্তু গাড়োয়ালী হিমালয়ের ভয়-মিশ্রিত, শ্রদ্ধা-মিশ্রিত গা-ছমছমে সৌন্দর্যর সঙ্গে কোনো কিছুই তুলনীয় বলে মনে হয় না আমার। দেব-দেবতাদের আবাসস্থল হওয়ার যোগ্য জায়গাই বটে !

দেবপ্রয়াগে, যেখানে অলকানন্দা এসে মিশেছে গঙ্গার সঙ্গে, গিরিখাতের মধ্যে ; সেখানে প্রয়াগের উপরের কালো পাথরে খোদাই করে যে চাতাল আর খাঁজকাটা বসার জায়গা, তা দেখলেও অবাক হতে হয়। হাজার ফিট নিচু দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নীল অলকানন্দা আর কালচে সবুজ গঙ্গা।

দেবপ্রয়াগের পরেই যেন অলকানন্দার রূপ খুলে গেছে। দেবপ্রয়াগে সে গিরিখাতের মধ্যে বন্দিনী। সেখানে তার গভীরতা আছে ; বিস্তৃতি নেই। গাম্ভীর্য আছে, প্রাণোচ্ছলতা নেই। তার রূপের মধ্যে থেকে রাশভারী ভাবটুকু উবে গিয়ে, যে সামান্য প্রগলভতা সুন্দরীর সৌন্দর্যে অন্য এক মাত্রা যোগ করে, সেই মাত্রা যুক্ত হয়েছে তার সৌন্দর্যে দেবপ্রয়াগের পরে। যেমন নীল রঙ জলের, তেমনই পেলব সাদা, (কত্তরকমের "ফর্সা"ই যে হতে পারে নদীর চর !) চরের রঙ। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। ইচ্ছে করে, অলকানন্দার পারে কুঁড়ে ঘর বানিয়ে থেকে যাই বাকি জীবনটা। শকুন্তলাও তো এমনই কোনো জায়গাতেই ছিলেন। সম্ভবতঃ রিশিকেশের কাছাকাছি কোথাও। কণ্বমুনির আশ্রম তো ছিল এই অঞ্চলেই। এমন জায়গার কোনো আশ্রমে থাকলে একদিন না একদিন রাজা দুষ্মন্তর দেখা পাওয়া যাবেই ! এখান থেকেই না হয়, সব আশ্রমবাসীকে, আশ্রমমৃগকে কাঁদিয়ে পতিগৃহে যাত্রা করা যাবে !

রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে, জিম করবেট অলকানন্দার পারে আমগাছে বসে যেখানে রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতাটিকে মেরেছিলেন উনিশশো ছাব্বিশের এক গ্রীষ্ম রাতে, সেই জায়গাটিও দেখলাম। একটি কুৎসিত-দর্শন বেড়াল-মার্কা চিতাবাঘের ছবি ক্যাঁটক্যাঁটে রঙে, টিনের বোর্ডের উপরে এঁকে, সেটি লোহার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে জায়গাটিতে। পাশেই একটি আম গাছও দেখলাম। তার বয়স কম করে সত্তর-আশী হবে। কিন্তু এই আমগাছটিই সেই আমগাছ কি না তার কোনো উল্লেখ নেই।

ভারতীয় হিসেবে, ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর অনীহা ও ঔদাসীন্য, সাধারণ রুচিবোধ ও ন্যূনতম যত্ন এবং সৌন্দর্যবোধের অভাব আমাকে বড়ই পীড়িত করে। বিদেশীরা মুখে কিছু বলেন না কিন্তু কী না কী ভাবেন, কে জানে !

ইদানীং সবচেয়ে যা বেশি আতঙ্কিত করে আমাকে তা এই সত্য যে, দিনে দিনে আমাদের এই দৈন্য এক প্রকট রূপ নিচ্ছে। তাতে আমাদের কোনো লজ্জাও নেই। লজ্জাবোধ ব্যাপারটাও যেন দেশ থেকে ক্রমশঃই অতি দ্রুত উবে যাচ্ছে। কী নেতাদের স্তরে, কী সাধারণ মানুষের স্তরে।

রিশিকেশ জায়গাটার নোংরা পরিবেশ, ট্রাক, বাস, ট্যাক্সি, এবং হেলিকপ্টারের মতো আওয়াজ-করা অগণ্য থ্রী-হুইলারের ভিড়, ধুলো, দোকান-বাজার, চিৎকার, আওয়াজ, চরম পরিবেশ দূষণ দেখে কারো পক্ষে কল্পনা করাও মুশকিল যে, রিশিকেশের অন্য প্রান্ত লছমনঝুলা থেকে এক কি.মি. উপরে উঠে এলেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা যাবে।

কিন্তু রিশিকেশে এসে অনেকেরই ইচ্ছাই হবে না আদৌ হয়তো উপরে উঠবার। ওপরটা এখনও অকলুষিত আছে। তবে যে ভাবে অ-পরিকল্পিত দোকানের সারি বাড়ছে, টিভির অ্যানটেনা ও ভিডিও ক্যাসেটের দোকান বাড়ছে, তাতে কতদিন এই পরিবেশ অব্যাহত থাকবে তা বলা যায় না।

ভিয়াসী, রিশিকেশ থেকে আঠাশ কি·মি·। ফেরার পথে, ভিয়াসীতে এক কাপ করে বেশি-দুধ বেশি-চিনির (সব পাহাড়েই এই রেওয়াজ) চা খেয়ে যখন আমরা রিশিকেশের দিকে রওয়ানা হলাম তার কিছুক্ষণ পরেই গাড়িটা হঠাৎ একটা বাঁক নিতেই হঠাৎই দেখলাম শিশুকাল থেকে অগণ্যবার দেখা লাল গোলাকার অস্তগামী সূর্যটা গঙ্গার ও-পারের পাহাড়চূড়োর উপরে স্থির হয়ে রয়েছে।

যাঁরা বলেন, সূর্যাস্ত-বর্ণনা, সূর্যাস্ত-বর্ণনার ফোটোগ্রাফী "ক্লিশে" হয়ে গেছে (আমি নিজেও তাই বলতাম।) তাঁদের সকলকেই অনুরোধ করব এই গাড়োয়ালী হিমালয়ে এসে

সূর্যাস্ত দেখতে। এমনিই কি আর ধার্মিকেরা বিশ্বাস করেন যে এই সব পর্বতকন্দরে তাঁদের দেব-দেবতাদের বাস ! এমনিই কি প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষে এখানে এসে মুগ্ধ, স্তম্ভিত, মন্ত্রবিদ্ধ প্রকৃতি-ঋদ্ধ হয়ে যান ! এই হিমালয়ের মতো, এই সব গিরিখাতের মতো সম্ভ্রম ও ভীতি জাগানো, শ্রদ্ধা জাগানো দৃশ্য ও বোধ অন্য কোথাওই দেখেছি বা অনুভব করেছি বলে মনে হয় না।

একটু পরেই সূর্য চলে গেল সুউচ্চ পাহাড়ের আড়ালে। সমতলে সূর্যাস্ত হতে এখনও কম করে আধঘন্টা দেরি।

দৃষ্টির অগোচরে যাওয়ার পরে বহুক্ষণ, প্রায় পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট কমলাভা ঐ পাহাড়শ্রেণী এবং গঙ্গাকে আভাসিত করে রাখল।

কমলেশ, ড্রাইভারকে বললো, গাড়ি দাঁড় করাতে। এয়ারকন্ডিশনার বন্ধ করতেও বললো। কাঁচও নামিয়ে দিতে বললো। কমলেশ এর মধ্যে কিছু ব্যাপার আছে। প্রকৃতি-প্রীতি, গভীরতা ; যা দিল্লির অন্য অনেক পাঞ্জাবীদের মধ্যেই দেখিনা। আমাদের বন্ধুত্বর মূল সূত্রটাও সেটাই। বই-চালাচালি করি আমরা নানা বিষয়ে। কমলেশ আপনার ও আপনার লেখার কথা আমার কাছ থেকে এতোই শুনেছে যে, আপনার সঙ্গে আলাপিত হবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু আমার বড় ভয় হয়। ও যে আমার থেকে সবদিক দিয়েই ভালো। রূপে, গুণে, আর্থিক অবস্থায় ; বংশমর্যাদায়। তবে আমার একটিই প্লাস-পয়েন্ট যে, আমি বাংলা পড়ি, আপনার পাঠিকা। আর ও নয়। 'পজেসিভনেস' সাধারণতঃ নিন্দনীয়। কিন্তু আপনার ব্যাপারে আমার মনে একধরনের পজেসিভনেস্ যে গড়ে উঠেছে তার জন্যে আমি লজ্জিত নই।

গাড়ি থেকে নামতেই এক অমোঘ, প্রায় প্রাগৈতিহাসিক নিস্তব্ধতা আমাদের ক্ষণিকের জন্যে গ্রাস করে ফেললো। কিন্তু অর্দ্ধপল মতো পরেই বোঝা গেল যে, না, নিস্তব্ধতারও শব্দ আছে। হাওয়া বয়ে যাচ্ছে গিরিখাত দিয়ে নদীর জলের মাথায় আশীর্বাদের মতো হাত ছুঁইয়ে, না জানি কোন দেবতার আশিস বয়ে। শব্দ এতো উপরে এসে পৌঁছচ্ছে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সেই হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে সুগন্ধি বনরাজি। এখানে পর্বত এতোই খাড়া ও এতোই উঁচু যে তার গা বেয়ে কোনো মানুষ বা প্রাণীর পক্ষেই নামাতো দূরস্থান পা-রেখে দাঁড়ানোও সম্ভব নয়। হয়তো বৃক্ষ বা লতাগুল্মেরাও সেই কারণেই তাদের বর্জন করেছে। বৃক্ষরাজি, লতা-গুল্ম যা আছে সব নিচে, নদীর উপত্যকাতে, যেখানে উপত্যকা আছে ; নয়ত অগণ্য সংকীর্ণ গভীর সব গিরিখাতে, যে-সব খাত গিয়ে মিশেছে নদী যে গিরিখাত দিয়ে বইছে, সেই গিরিখাতেই। এগুলি বর্ষার জলবাহী।

দু' তিন হাজার ফিট নিচু থেকে শব্দ উঠে আসছে। চুকোর ডাকছে সূর্যবন্দনায়, ব্রেইনফিভার, রেডওয়াটেলড ল্যাপউইগ, তিতির, বুলবুলি, আরও কত পাখি। কিন্তু অত উপর থেকে অস্পষ্ট শোনাচ্ছে তাদের ডাক। তবু সেই ডাকে কেঁপে কেঁপে উঠছে যেন পথপাশের ঝোপের লাল রঙা "কাবাসি" ফুল, ফিকে হলুদ "কালারাসা" ফুল অথবা বিভিন্ন রঙা "লানটায়েন" ফুল। এগুলি সবই ঝাড়ের ফুল।

কতরকমের যে গাছ এখানে। এদের মধ্যে কিছু কিছু গাছ নিশ্চয়ই সমতলেও হয় কিন্তু চেহারা বদলে যায়, মানুষের চেহারারই মতো। প্রাণী ও পাখিদের চেহারাও বদলায় একই কারণে।

যতক্ষণ সেই কমলাভা আর পাখিদের অস্ফুট কলকাকলী শোনা গেল ততক্ষণ আমরা

সেখানে অনড় প্রস্তরমূর্তির মতোই দাঁড়িয়ে রইলাম নির্বাক। বুঝলাম, মুনি-ঋষিরা কেন হাজার হাজার বছর ধরে এই পাহাড়শ্রেণীতে তপস্যা করতে আসেন !

তারপর অন্ধকার নেমে এলো। আমরা আবার রওয়ানা হলাম। যতই নিচে নামতে লাগলাম ততই শীত করতে লাগল। গাড়ির কাঁচ তুলে দিতে হল।

এখন ঘনান্ধকার। কৃষ্ণপক্ষ। হেডলাইটের আলোই একমাত্র আলো। পনেরো কি.মি. মতো যাওয়ার পর কমলেশ আবার গাড়ি দাঁড় করাতে বললো।

ড্রাইভার মৃদু আপত্তি করে বললো, এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, এখন দু'ধারেই গভীর জঙ্গল, আমরা নেমে এসেছি প্রায় নিচে। জানোয়ার আছে নানারকম।

কিন্তু কমলেশ তবু বললো, রোক্কো গাড়ি।

গাড়ি থামতে আমরা আবার নামলাম। ড্রাইভার হেডলাইট জ্বালিয়ে রাখলো। কমলেশ তাও বন্ধ করতে বললো। তারপর ড্রাইভার ড্যাশবোর্ডের আলো আর সাইড লাইটের আলো জ্বালিয়ে রেখে বন্ধ করে দিল হেডলাইটের আলো। কমলেশ তাও বন্ধ করে দিতে বাধ্য করল ড্রাইভারকে।

বিড়বিড় করে আপত্তি জানিয়ে কথা মানলো সে।

যখন আলোর সব রেশ মুছে গেল তখনই কমলেশকে চুমু খেতে ইচ্ছে করলো। কী জমাটবাঁধা নিকষকালো অন্ধকার ! পাহাড়ী ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। নদীর চলার শব্দ আগে উপর থেকে শোনা যায়নি একটুও কিন্তু সেই নদীর শব্দই এখন এমন যে মনে হচ্ছে, গাড়ির মধ্যে দিয়েই বুঝি বা বয়ে যাচ্ছে নদী। আর যে-হাওয়াটা গিরিখাতের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল বলে বোঝা যাচ্ছিল উপর থেকে সেই হাওয়াটাই এখন নদীর ঝরঝরানি শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হরজাই বনের মধ্যে ঝরনার শব্দ তুলে বনের আর পাতার আর ঘাসের আর ফুলের আর পাহাড়ের আর নদীর গায়ের গন্ধ বয়ে তুমুল শোর তুলে বয়ে যাচ্ছে, যেন নদীরই প্রতিযোগী হয়ে।

উপরে তাকিয়ে দেখলাম, নীলাভ কৃষ্ণপক্ষর নীলাভ আকাশের অন্ধকার চন্দ্রাতপ। তাতে অগণ্য গ্রহ-নক্ষত্র। মহাবিশ্বে, মহাকাশে ; মহাকাল-মাঝে। কালো আকাশ নীলাভ হয়েছে নক্ষত্রজ্যোৎস্নায়। সেই সুরভিত, নদীর হাওয়া-বন্দিত, নক্ষত্রখচিত ঘনান্ধকার রাতে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে, পাহাড়ী ঝিঁঝির ঐকতানের মধ্যে দাঁড়িয়ে কমলেশ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতাতে নুয়ে এলাম।

অধিকাংশ মানুষেই যেমন যান বা আসেন, গাড়িতেই যান বা ট্যাক্সিতে বা বাসেই, তাঁদের মধ্যে কেউই হয়তো কমলেশ-এর মতো জানেন না যে, গতি সার্থক হয় যতিরই মাধ্যমে। কোনো গন্তব্যর মধ্যেই গন্তব্য থাকেনা, গন্তব্য থাকে পথেরই দু'পাশে ছড়ানো-ছিটানো। তাকে দুটি হাতের সব আঙুল দিয়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয়র সমুদয় তীব্রতা দিয়ে শুষে নিতে হয়। যিনি তা পারেন তিনিই যথার্থ পথিক।

আমরা যদি সেই পর্বতশৃঙ্গে সূর্যাস্তবেলাতে আর এই ঘনান্ধকারের নদীতীরবর্তী বনমধ্যে নক্ষত্রখচিত কৃষ্ণা আকাশের চন্দ্রাতাপের নিচে ক্ষণকালের জন্যে না দাঁড়াতাম তাহলে আসা-যাওয়া অবশ্যই হতো কিন্তু এমন তাৎপর্যময়, বাঙ্ময় হয়ে উঠতো না তা।

প্রকৃতিকে আমিও ভালোবাসি। আপনিতো বাসেনই। কিন্তু ভালোবাসাই বোধহয় সব নয়। ভালোবাসতে জানা অনেক কষ্ট করে যত্ন নিয়ে শিখতে হয় ; সে মনকে ভালোবাসাই হোক, কী বনকে ভালোবাসা।

কমলেশ-এর কাছে শুধু গতরাতের অভিজ্ঞতার কারণেই চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

আমরা আজই চলে যাব, যেমন বলেছি। ধীরে সুস্থে গেলে, পথে চা-টা খেয়েও, হোপফুলি আটটার মধ্যেই আরামে পৌঁছে যাব দিল্লি।

ভালো থাকবেন।

—যোজনগন্ধা

দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

আমার
অনেক দূরের
যোজনগন্ধা,

দূরত্ব কমবে এবারে। আমার সঙ্গে পরপারের। দূরত্ব বাড়বে এই পরম সুন্দর, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ'র, আমার বড় ভালোবাসার এই পৃথিবীর সঙ্গে। পাখি, প্রজাপতি এবং যোজনগন্ধাও থাকবে না কাছাকাছি। কিন্তু যে দেশে যাব, যে দেশে সকলকেই যেতে হয় ; সেই দেশটি যে কেমন তা যদি জানা থাকত !

সময় হয়ে এসেছে। যোজনগন্ধা, তোমার সব সুগন্ধ পাঠাও এবার আমার জন্যে।

তোমার চিঠিটি আজই পেলাম। খুবই সুন্দর ! আমার দেখা হয়নি। আর হবে না।

এখন গভীর রাত। শীতের রাত। ডি·ভি·সি'র মোড়ে কুকুর ডাকছে কঁকিয়ে কঁকিয়ে। যদিও কুকুরদের উষ্ণতা খোঁজার দিনগুলি শেষ হয়ে গেছে কার্তিক মাসেই। তবুও উষ্ণতাই যে সমস্ত প্রাণীর জন্মলগ্ন থেকে সবচেয়ে বেশি কামনার ধন ! উষ্ণতার উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গেই যে তার প্রাণেরও উন্মেষ ! উষ্ণতাই যে জীবন !

জাগতিকার্থে যাকে আমরা "শীত" বলে জানি, যে-শীতকে কোনও নারী বা পুরুষের পরশে অথবা লেপ, কাঁথা, হিটার বা কাঙরী বা ফায়ার-প্লেসের নৈকট্যে বশে আনা যায় ; সেই শীত তো অতি সামান্যই শীত ! কিন্তু যে সুপ্ত-শীতকে আমাদের প্রত্যেকেরই বুকের মধ্যে আমরা অনুক্ষণ বয়ে বেড়াই, সেই শীত অনুভব সকলে করে না। করতে পারে না। অধিকাংশ মানুষই পারে না। যারা পারে না, তারা ভাগ্যবান। এই শীত, প্রখর গ্রীষ্ম-দিনেও যেমন অনুভূত হতে পারে, তেমনই হতে পারে এমনই রাতে ; যখন তাপমাত্রা বেশ নিচে নেমে যায়। আর যখন সেই শীতের দাঁত-চোয়াল কাউকে তেমন করে কব্জা করে, তখন জাগতিক কোনও প্রাপ্তিই সেই বিপন্নতাকে নিরাপত্তা দিতে পারে না। আর ঠিক এমন এমন মুহূর্তেই মস্ত সাহসী দৃঢ়চেতা পুরুষ অথবা নারীও ভেঙে পড়েন। আত্মহত্যা করতে যান। ইতালীয় চিত্রপরিচালক আন্তোনিওনির নায়ক-নায়িকাদের মতো। আমেরিকান ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো।

এই সব শৈত্য, হতাশা, ব্যর্থতার যন্ত্রণার কথা সকলের বোঝার নয় কোনোদিনই !

কোনও মানুষেরই প্রকৃত-কাছে, অন্য কোনও আপন-জানা মানুষই কখনওই থাকতে পারেন না। থাকেনও না। তাঁকে বুকে জড়িয়ে থাকলেও পারেন না। সেই চিরন্তন একলা মানুষের একাকিত্ব যখন তাকে পেয়ে বসে তেমন করে, সেই সব মুহূর্তে তার তীব্র অসহায়তাই তার সহায় হয়ে এসে এই শীতার্ত পৃথিবী থেকে উদ্ধার করে তাকে তার শেষতম গন্তব্যর কাছে নিয়ে যেতে পারে।

আজই মতিভাবী আমার কাছে এসেছিলেন। সন্ধেবেলায়। রাত এগারোটা অবধি ছিলেন। আগেই জানিয়েছিলেন, আসবেন বলে।

আশ্চর্য লাগে ভাবলে! একেকজন মানুষ এক এক রকম রিপুতাড়িত। কেউ অর্থ, কেউ লোভ, কেউ যশ, কেউ মদ, কেউ ঈর্ষা, কেউ বা কাম। বেচারী মতিভাবীরই মতো।

প্রত্যেক রিপুতাড়িত মানুষকেই আমি অনুকম্পা করি। ঈশ্বর তাঁদের সহায় হোন।

একটু আগেই উনি বিশ্বস্ত রিকশাওয়ালার সাইকেল-রিকশাতে চড়ে, মহামূল্য কাশ্মিরী মলিদায় মহার্ঘ, তৃপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে ক্যাঁচোর-কোঁচোর করে চলে গেছেন তাঁর বাড়িতে। আমার বিছানাতে এখনও দলিত হয়ে পড়ে আছে তাঁর বেণীতে-জড়ানো জরি-দিয়ে-বাঁধা হলুদ গোলাপ। জড়িয়ে আছে তাঁর শরীরের ফিরদৌস আতরের তীব্র গন্ধ। বালিশে লেগে রয়েছে, সুর্মার কালো ছাপ, পায়ের মেহেন্দির লাল ; বিছানার চাদরে।

বিছানা এখনও গরম আছে।

কিন্তু তবুও আমি ভীষণই শীতার্ত বোধ করছি।

তবে এটুকু জেনেছি যে, তিনি হয়তো উষ্ণ হয়েছেন। কিন্তু আমি তো চাইনি তাঁকে। একদিনও নয়। তাই আমার শীত আমার বুকেই রয়ে গেছে। আমার এই মুহূর্তের শীত, শরীরের শীত নয় যোজনগন্ধা।

আজকে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। একটু আগেই আমি বারান্দাতে রজাই-মুড়ে ইজিচেয়ারে বসে, মাথায় টুপি চড়িয়ে ভাবছিলাম, যে-গল্পটি আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি, অথচ যেটি লেখবার জন্যে আজও বেঁচে আছি, সেইটি কি আজই রাতে লেখা হবে ? শুরু হবে কি আজ ?

যোজনগন্ধা, তোমাকে বুকে নিয়ে এমন একটি রাত কাটাবার খুবই ইচ্ছা ছিল মনে মনে। হয়তো ছিল তোমারও। কিন্তু যা হয়েছে ভালই হয়েছে।

পুরিত-ইচ্ছার মতো মৃত ব্যাপার আর দুটি নেই। ইচ্ছাটা বাঁচুক। বেঁচে থাকুক দু'জনেরই মনে।

ভাবছি, আজ কলমের বদলে গুলি-ভরা পিস্তলটিই ব্যবহার করব। ব্যারেটা। স্প্যানিশ ! আজ শব্দ করেই লিখব। লিখব with a bang! একেবারে অন্যরকম লেখা। কিছুই যে হল না যোজনগন্ধা ! "কিছুই তো হল না ! সেই সব, সেই সব, সেই অশ্রু, হাহাকার রব... ।"

যাই পেলাম, তার কিছুই তো চাইনি তেমন করে। আর যা চাইলাম তার কিছুই তো পাওয়া হলো না।

প্রতি রাতে, ভোরের আজান আর রনমোরগ ডাকার আগে যে নারীকে চাই তাকে যে আজ অবধিও চিনে উঠতে পারিনি আমি ! সে কি তুমি ? জানিনা। তার হাতে হাত রাখিনি। তাকে চুমু খাইনি একটিও। আমার সেই স্বপ্নের নারী একদিনও আমার স্বপ্নে

দেখা দেয় না।

যারা স্বপ্নে আসে, তাদের মধ্যে কেউ আসে নীলের উপরে সাদা বুটি-দেওয়া ঢাকাই শাড়িতে সেজে, সাদা-ব্লাউজে শরীর মুড়ে। যেন এখুনি সে পদ্মাতীরের কোনও গ্রাম থেকে নদীর গন্ধ মেখে, কুয়াশার সিক্ততা নিয়ে, শ্লথগতি শামুকের শিশিরভেজা পথ বেয়ে উঠে এলো!

কোনওদিন-বা সে আসে সাপের ফণার মতো তার জরি আর ফুলে-বাঁধা বেণী চমকাতে চমকাতে। স্বর্ণচাপা রঙের সালোয়ার কামিজে। তার গায়ের উপরে ওড়না থাকে। পাতলা, ম্যাজেন্টা-রঙা, বোগোনভিলিয়ার ফিনফিনে পাপড়ির মতো।

কোনওদিন-বা সে আসে, বিবসনা হয়ে। হাঁসা-হাঁসীর শিহর-তোলা ডাকের মধ্যে যখন শীতের ভোর আসে, সেই সময়কার নতুন খড়ের গন্ধ, শিশিরের গন্ধ, হাঁসেদের আর গরুদের গায়ের গন্ধ, শিউলির গন্ধ ; বাংলার ভোরের গন্ধ গায়ে মেখে এক ঝলক দেখা দিয়েই সে যেখানে খেজুর-গাছে রসের হাঁড়ি বাঁধা, সেই দিকে ভোরের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে নীলাভ কুয়াশাকে তার পরনের বাস করে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেই নগ্ন নারী, কোনওদিনও সামনে ফেরে না। মুখ দেখায় না আমাকে। দেখায় না করমচার গন্ধ-মাখা স্তন-সন্ধি। কদম্বগন্ধী নাভিমূল। কেয়াগন্ধী উরুমূল। এমনকি চন্দনগন্ধী পায়ের পাতাও। গোড়ালি আর নিতম্বর অস্পষ্ট আভাস দিয়ে পরিবেশে খোলা চুল আর বেণীর প্রলেপ বুলিয়ে সাইবেরিয়ার রাজহংসীরই মতো তার বিভাময় গ্রীবা তুলে কুয়াশায় ভেসে ভেসে সে মিলিয়ে যায়।

যারা স্বপ্নে আসে, তারা সবাই সুন্দরী, সুগন্ধি ; কিন্তু আমার সেই নারী তো এরা নয়! না, এরা কেউই নয়। মতিভাবীও নয়।

সে কি তবে তুমি?

যাকে আমি চাই, সে হয়তো পুরোপুরি নারীও নয়। মানে, তার নারীশরীর না থাকলেও চলত। সে কোনো আদুরে কাকাতুয়া বা বেড়ালনী হলেও চলে যেত আমার ; যদি সে শান্তি দিতে পারত ; একটু শান্তি। সমস্ত প্রাপ্তির পরেও আমার হাহাকারের কোনও ব্যাখ্যা আমাকে দিতে পারত, বলতে পারত, সুখ কিসে? সুখ কোথায়? জীবন সার্থক কিসে? মানবজন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য অথবা গন্তব্য কি? কোথায় যাচ্ছি আমি? কোথায় যাবার ছিল?

এসবের উত্তর মাথার উপরের স্তব্ধ উজ্জ্বল তারাভরা আকাশ আর নিচের জমাট-বাঁধা অন্ধকারের রাত কখনওই দেয় না।

দূরের টাড়ে টি-টি পাখি ডেকে ফেরে অন্ধকার আকাশের নিচে, হট্টি-টি, হুট্-টি-টি-টি-হুট্, টি-টি-টি-হুট্।

কান্‌হারী পাহাড়ের গা থেকে ফেউ ডাকে। বারবার।

আমি একটা থার্ড-ক্লাস মানুষ।

"মূর্খ বড়ো! সামাজিক নই।"

এই যূথবদ্ধ শত্রুদের সঙ্গে নীচতায়, খলতায় আমি কখনও সমান হতে পারব না। এই চক্রান্তকারীদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের মধ্যে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই চলে যাওয়াই ভাল।

তুমি শুধোবে, ওঁরা কারা? যাঁদের কথা আপনি প্রায়ই বলেন? যে অগণ্য শত্রুদের কথা আপনি আভাস ইঙ্গিতে উল্লেখ করেন, যাঁদের উপরে আপনার এতো অভিমান, সেই

"ক্যালচারাল ব্যারনস"রা কারা ? কারা এই সমসময়ের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংগীতের নিয়ন্ত্রক যূথবদ্ধ কোটারির নিয়ন্ত্রক ?

আমার খুবই জানতে ইচ্ছে করে।

তোমার প্রশ্নর উত্তরে আমি বলব, আমি জানি না। সত্যিই জানি না। আমি ওঁদের চিনি না। চিনব কি করে ? ওঁদের কারোই যে মুখ নেই। ওঁরা প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আঁকা গুহাগাত্রের অশুভ, ক্ষতিকারক, অচেনা, ভয়াবহ জানোয়ারের অস্পষ্ট ছবিরই মতো। শুধুই মুখোশ। ওদের ছায়াদের দেখেছি বহুবার। তারা রণ-পায়ে চড়ে আমার চারপাশে নিঃশব্দে ঘোরে। অবিরাম আমাকে তারা পদাঘাত করে। আমাকে নির্জন পথে পেলেই আমার গলা টিপে ধরে। চকচকে চাকু বের করে আমার বুকে বসাতে চায়। কিন্তু ওরা মুখ দেখায় না অন্ধকারে। এবং আলোতে ওরা হাসে। আহা ! যেন দারুণ ভালবাসে !

পরম মিত্রর মুখোস পরে ওরা চারধারে ভিড় করে থাকে।

মাঝেমাঝে মনে হয় যে, আমি পাগল হয়ে গেছি।

এই এখুনি আবারও একটা তারা খসে গেল নৈর্ঋত কোণে ! আজও খসলো। সবুজ রঙের তারাটি ! দিগন্তরেখায় মিলিয়ে যাবার মুহূর্তে তার মধ্যে থেকে যেন সাদা আর কমলা-রঙ হঠাৎই জ্বলে উঠে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল। আগুনে পুড়ছে তারাটা। কত কষ্ট হচ্ছে তার। বর-পণ দিতে না-পারা তরুণী বধূরই মতো জ্বলে যাচ্ছে সে !

তা, মরবার সময় তো একটু কষ্ট হবেই। সকলেরই হয়।

বড় কষ্ট হয় আমার কোনও তারা খসে গেলেই। মনে হয়, সে তো তারা নয় ; আমারই বুকের মধ্যের একটি টুকরো যেন খসে গিয়ে জ্বলে উঠল ; তারপর মিলিয়ে গেল এই মহাবিশ্বের মহাকাশের নিকষ কালো বোবা অন্ধকারে।

না কি বলব, বোবা নয়, বাঙ্ময় অন্ধকারে ?

ভোর কি হবে না ? যোজনগন্ধা ? ভোর কি হবে না ?

আলো ফোটো, আলো। বড়া ইমাম, আজান দাও। পাখিরা সব জেগে ওঠো। ওঠো। ওঠো।

চাঁপা ! অ চাঁপা !

রেশমা ! রেশমা ! রেশমা ! নাও এবারে মুখ-টুখ ধুয়ে রিওয়াজে বোসো। গান ধরো। পায়রার পাখার ঝটপটানির শব্দের সঙ্গে তোমার সুরের শব্দ পাখসাট-এর শব্দর মতো, যারা ঘুমোচ্ছে তাদের ঘুম ভাঙাক।

গান ধরো রেশমা ! গান ধরো ! গানই প্রাণ ! কী রাগ ?

যা খুশি। যে কোনো প্রভাতী রাগ। যোগিয়া, বা ভাটিয়ার, দেশকার বা কুকুভ বিলাওল।

ধরো ধরো, রেশমা। আর দেরি কোরো না !

তুমি কোথায় গেলে কলকাতার সেই রামছাগলওয়ালা ? অতগুলো সাদা-কালো রামছাগল কোথা থেকে পেলে তুমি ? এসো এসো। ভোর হল। তোমার ছাগলদের আনো। তাদের নিয়ে এসো। গলার ঝুমঝুমি বাজাতে বাজাতে তারা ভোরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসুক। আর, ওগো বড়লোকের বাড়ির নাম-না-জানা গাছের সেই বেগুনিতে ফিকে-লালে মেশানো গন্ধহীন ফুলেরা, তোমরা ঝরো, ঝরো ; ঝরতে থাকো নিঃশব্দে। গন্ধহীন হলেও আমি তোমাদের ভালোবাসি। এসো, ঝরো ; ঝরনার মতো

ঝরো।

আমি আমার গন্তব্যে চলেছি যোজনগন্ধা।

মানে, বলতে পারো ; গন্তব্য খুঁজতে। দোয়া চাইতে হবে। চাইতে চাইতেই চলতে হবে।

কোথায় যাব জানিনা।

ভোরের যাত্রা, নিরুদ্দেশে হলে ; মন বড় খারাপ লাগে।

ইতি—

অর্যমা

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
নিউ দিল্লি

দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা,

আজ সকালে হেমন্তের অনতিদীর্ঘ তপস্যা সফল করে জাঁকিয়ে শীত এসে পৌঁছল হাজারীবাগে। শিশিরে চান করেছে প্রকৃতি সারারাত। এখন ঘাসপ্রান্তর গাছপালা সব জায়গাতেই রোদ পড়ে লক্ষ লক্ষ হীরে চমকাচ্ছে। শীতের পায়ে পায়ে।

এমনই নিঃশব্দ চরণ ফেলে আসোয়াও এল। কুসুমভা থেকে। কুসুমভার কথাতো তোমাকে আগেই বলেছি।

এর পরের বার তুমি এলে তোমাকে নিয়ে যাব কুসুমভাতে। দলিলের মাধ্যমের মালিকানা গপু সেনের আছে কি না জানি না সেখানে, জমির মালিক কি না জানি না, তবে কুসুমভার মানুষের হৃদয়ের মালিক যে গপুবাবু তা জানি।

প্রতি বছর গপুবাবু সেখানে কম্বল বিতরণ করেন। পুজোর পরে পরেই ধুতি ও শাড়ি দেন। সারা বছর খিদমদ্‌গারি করেন। আমি একবার সেই সময়ে ছিলাম। মানে, দিওয়ালির সময়ে।

আমাদের দেশের বন-জঙ্গলের অধিকাংশ গরিব মানুষই যে কত সৎ, কত ভালো, কত কৃতজ্ঞ, কত সহজে খুশি তা নিজে ওদের সঙ্গে না মিশলে জানতেও পারবে না। সামান্য কোনও দান পেলেও ওরা যেমন করে হাসে, শহরের মানুষেরা লক্ষ টাকা পেলেও তেমন করে হাসতে পারে না। আমার মনে হয়, এই প্রকৃতির বুকে বেড়ে উঠেছে বলেই ওরা এখনও অনাবিল আছে। ওদের চাহিদা খুবই সামান্য ! তাই ওরা সুখী।

আমরা আমাদের চাহিদাকে বাড়াতে বাড়াতে এমন এক অবিরত প্রসারিত প্রতিসরিত আলোর মতো করে তুলেছি যে, চাহিদার মরুভূমিতে মরূদ্যান খুঁজে বেড়ানো তৃষিত পথিকের চোখে মরীচিকা হয়ে এই আছে, এই নেই, হয়ে গেছে আমাদের সব সুখ।

বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর "কনকোয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস" বইতে সেই কবে লিখেছিলেন যে, "উই ডু নট স্ট্রাগল ফর এগজিস্টেন্স, উই স্ট্রাগল টু অউটশাইন আওয়ার নেবারস্"।

কথাটা আজ অবধিও আমরা কেউই খতিয়ে দেখলাম না।

কেন জানি না, তোমাকে চিঠি লিখতে বসলে কত বিষয়ই যে কলমের ডগাতে এসে যায়। যে সহজ সরল একটি কথাই বলব বলে কাগজ নিয়ে বসি সেই কথাটিই ক্রমশঃ চিল্কা-হ্রদের ঝাঁকের পাখিরই মতো সমান দূরত্ব বজায় রেখে সরে সরে যেতে থাকে বন্দুকের পাল্লারই মতো, কলমের পাল্লারও বাইরে।

ভালো থেকো।

ইতি—
অর্যমাদা

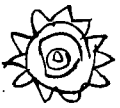

কল্যাণীয়াসু,
যোজনগন্ধা,

"দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ

এমন হিমেল রাতে দোর-বন্ধ ঘরের মধ্যে বসে গান শুনতে হয়, ভাল বই পড়তে হয়; নয়তো ফায়ারপ্লেসের সামনে কার্পেট বিছিয়ে মনোনীত নারীকে আদর করতে হয় ঘরের সব আলো নিবিয়ে দিয়ে ফায়ারপ্লেসের আগুনের লাল অসমান শিখার কম্পমান ঔজ্জ্বল্যের দাপাদাপির মধ্যে। কিন্তু ফায়ারপ্লেসের সামনে না বসে, গান না শুনে, আমি বারান্দাতেই বসে ছিলাম এই একটু আগেও।

শীতার্ত অন্ধকারে অনেকক্ষণ বসে থাকার প্রভাব আলো-জ্বলা উষ্ণ ঘরের মধ্যে ঢোকার পরও রয়ে গেছে আমার ভেতরে। এখন বাইরে প্রচণ্ড শীত। অন্ধকার রাত। উপরে অগণ্য তারাভরা আকাশ। তারাদের আলোও যে কিছু কম আলো নয়, তা যারা বনের গভীরে অথবা বন্য পরিবেশে বাস করেন বা করেছেন তাঁরাই জানেন। এই তারাদের আলোও চারধারের শিশিরসিক্ত গাছপালায় বিকীরিত হয়।

অন্ধকারে বসে বসে ভাবছিলাম অনেকই কথা। আমার এই একার সংসারেও একা-হওয়াটা, একা-থাকাটা; বড়ই কঠিন। আসলে প্রত্যেক মানুষের নিজের মনের মধ্যেও অনেক ভিড় জমে। সেই অন্য অন্তঃপুরের ভিড় সরিয়ে নিজের কাছে নিজে একলা হতে পারাটাও বড় কঠিন কাজ।

তুমি এর আগেও একদিন আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে, কেন লিখি? কাদের জন্যে বা কার জন্যে লিখি? আমি জানিয়েছিলাম, না-লিখে পারি না; তাই লিখি।

লেখালেখি প্রসঙ্গে তোমার যে অনেকই পড়াশোনা আছে তাও বুঝেছিলাম তোমার একখানি চিঠি পড়ে।

এই সব কথাই ভাবছিলাম একা বসে বসে। কেন যে লিখি এ কথার জবাব বোধহয় এক কথায় দেওয়া যায় না। তবে আবারও বলব যে, না লিখে পারি না বলেই লিখি। পাতা-ভরাবার বা টাকা রোজগারের জন্যে কোনওদিনও লিখিনি যে, একথা সত্যি।

একটি মত আছে সাহিত্য জগতে, সেই মতের পথিকেরা বলেন যে, পুরো দেশে মাত্র শ-পাঁচেক পাঠক-পাঠিকা আছেন, তাঁরাই আসল বিচারক। তাঁদের দেওয়া প্রচারহীন পুরস্কারটাই আসল পুরস্কার।

সেই মুষ্টিমেয় পাঠকেরা যে কোথায় থাকেন ? কেমন তাঁদের দেখতে ? কী তাঁদের জীবিকা তা লেখকদের জানারও সাধ্য নেই।

তাঁদের মধ্যে কেউ হয়তো কোনও স্টেশনারি দোকানের সেলস্‌ম্যান। দুপুরে যখন ভিড় কম থাকে তখন চোখে কার-বাঁধা নড়বড়ে চশমাটি লাগিয়ে, তিনি চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে সাহিত্য পড়েন। কেউ হয়তো কোনও মোটামুটি শিক্ষিতা গৃহবধূ। তিনি দুপুরের অবসরে অথবা গভীর রাতের অবসরে পড়েন। কেউ-বা ছোট্ট নির্জন স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। কেউ-বা অত্যন্ত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি। প্রচণ্ড ঘোরাফেরার মধ্যেও প্লেনের সিটে, ট্রেনের বাঙ্কে, সার্কিট হাউসের বারান্দাতে বসে তিনি পড়েন।

"ঈশ্বরবোধ" ব্যাপারটারই মতো "সাহিত্যবোধ" ব্যাপারটাও ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না। বাংলায় পণ্ডিত হলেই বা বৈয়াকরণ হলেই যে তিনি সাহিত্য বুঝবেন অথবা সাহিত্যিক হবেন এমন কথা নেই কোনও। "সাহিত্যবোধ" ব্যাপারটা কারো কারো মধ্যে থাকে। এই মুষ্টিমেয় সাহিত্যবোধসম্পন্ন ক'জন পাঠকই নাকি যুগে যুগে কালে কালে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মান নির্ধারণ করে আসছেন।

এই মতাবলম্বীদের মধ্যে আমাদের অগ্রজ সাহিত্যিকরাও আছেন। তাঁদের মতটাই হয়তো ঠিক।

সাহিত্যবিচারে মহাকালই সব, না বর্তমানকালটাও প্রণিধানযোগ্য সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎবাবুর কিছু চিঠি লেখালেখি হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ যে বড় তা আমরা সকলেই জানি। এবং মানিও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বড় করতে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে নস্যাৎ করার যে প্রবণতা অনেকেরই ছিল এবং আজও আছে তা আমার মনে হয়, অন্যায়। আমরা বাঙালীরা চিরদিনই একজনকে ভগবান বানাতে গিয়ে অন্যজনকে ভূত বানাতে সিদ্ধহস্ত।

শরৎবাবু সম্বন্ধে আমরা এতোই কম জানি এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এতোই বেশি যে, দু'জনেরই প্রতি অন্যায় করাটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, বঙ্গভূমে চিরদিনই "হীরো-ওরশিপিং চলে এসেছে। কাউকে নায়ক বানালে আমরা মাত্রাজ্ঞান প্রায়ই হারিয়ে ফেলি। একজনকে শিব বানাতে গিয়ে অন্যদের চিরদিনই বাঁদর বানাই। এই মানসিকতাটা, আমার মতে ; প্রাপ্তবয়স্কদের মানসিকতা নয়। আমার মত ভুলও হতে পারে।

শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথকে, রবীন্দ্রনাথের চিঠির উত্তরে একবার লিখেছিলেন (২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩৪, সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাওড়া থেকে) :

> "...তা ছাড়া সাহিত্যের বর্তমান কালটা যত বড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়। নর-নারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এতকাল এত কাব্য লেখা হয়েছে, মানুষে এত তৃপ্তি পেয়েছে, এত চোখের জল ফেলেছে, সে-ও হয়তো একদিন হাসির ব্যাপার হয়ে যাবে। অন্তত অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে আজ তাকে কল্পনাতেও গ্রাহ্য করা চলে না।"
>
> .....
>
> "...পরিশেষে আপনি আমার শক্তি উল্লেখ করে লিখেছেন "তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভীড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তা হলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে।"
>
> আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভারী ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই

জিনিসটা ঠিক মত জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে সেও যে শাস্তি দেয়।"

লেখালেখির "প্রেক্ষিত" সম্পর্কেও শরৎবাবুর নিজস্ব এবং জোরালো মতামত ছিল যে, সে সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকারা তো বটেই, সেকাল একালের অনেক সাহিত্যিকও হয়তো অবহিত নন। রবীন্দ্রনাথকে লেখা ওই চিঠিতেই শরৎবাবু অন্যত্র লিখছেন রবীন্দ্রনাথকে :

"এক সময়ে আমি শুধু ছবি আঁকতাম।"

শরৎবাবুর ছবি সব কোথায় গেল বল তো!

নিজের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসার অভাব, নিজের সৃষ্টির প্রতিও ; হয়তো প্রকৃত আর্টিস্টেরই লক্ষণ!

শরৎবাবুর ছবি সম্বন্ধে আমাদের পূর্বসূরীদের কোনও উৎসাহই দেখা যায়নি কেন যে, তা ভাবলেও অবাক লাগে।

আমার কি মনে হয় জানো? বাঙালীদের মধ্যে যাঁরাই সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত এবং চলচ্চিত্র-এর ক্ষেত্রে বড় হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই শুধুমাত্র নিজেদেরই লাগাতার প্রচার ও প্রসারে ব্যাপৃত থেকেছেন। দেশ বিদেশের পুরস্কার আর জয়মালার সন্ধানে বেলা গেছে তাঁদের, স্বদেশের সমসাময়িকদের প্রতি তাকানোর অবকাশ বা ইচ্ছা হয়নি। এই মনোভাবটি স্বাস্থ্যকর কী না, তা বিচার করার সময় বোধহয় এসেছে।

আগামীকালের মানুষ এই বিচারে অবশ্যই বসবেন।

শরৎচন্দ্র বলছেন :

"ছবিতে এর মুণ্ডু, ওর ধড়, তার পা এক করে চমৎকার জিনিস দাঁড় করানো যায়। কারণ সে কেবল বাইরের বস্তু, চোখে দেখেই তার বিচার চলে। কিন্তু সাহিত্যের চরিত্র সৃষ্টির বেলায় তা হয় না। মানুষের মনের খবর পাওয়া কঠিন।

.....

আপনি পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করেছেন। ছবিতে আঁকায় এতে দূরত্বের পরিমাণে বড় জিনিস ছোট, গোল জিনিস চ্যাপ্টা, চৌকো জিনিস লম্বা, সোজা জিনিস বাঁকা দেখায়। কতদূরে, কোন সংস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কিরূপ এবং কতটা পরিবর্তন ঘটাবে তার একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম আছে। এ নিয়ম ক্যামেরার মতো যন্ত্রকেও মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু সাহিত্যের বেলা তো এর তেমন কোনও বাঁধাধরা আইন নেই। এই সমস্তই নির্ভর করে লেখকের রুচি এবং বিচারবুদ্ধির উপরে। নিজেকে কোথায়, কতদূরে যে দাঁড় করাতে হবে তার কোনও নির্দেশই পাবার যো নেই। সুতরাং ছবির Perspective আর সাহিত্যের Perspective কথার দিক দিয়ে এক হলেও কাজের দিক দিয়ে এক নয়।"

শরৎবাবুকে অনেকেই "মেয়েদের লেখক", "জোলো", "সেন্টিমেন্টাল লেখক" বলে চিরদিনই নস্যাৎ করে এসেছেন। আজও করেন। আমার কিন্তু মনে হয় ওঁকে এত সহজে ডিসমিস করাটা অত্যন্তই অনুচিত। উনি অন্য কারো ডিসমিসালের উপরে ভরসা করে কোনোদিন বসেও থাকেননি। ওঁর লেখা যে আজও সমান জনপ্রিয় এটাই ওঁর জোরের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ইতি—
অর্যমা

পুনশ্চ : এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ; এই দুই শক্তিমান ঔপন্যাসিকের কথা। প্রাসঙ্গিক বলেই সেই ঘটনার কথা উল্লেখ না-করে পারছি না।

"দেশ" সম্পাদক সাগরময় ঘোষের "হীরের নাকছাবি" (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ) বইতে পড়েছি যে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক দুপুরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাড়িতে বসে দ্বিপ্রাহরিক খাওয়া-দাওয়ার পর বিভূতিবাবুর লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার পরে, সৎ বন্ধুর মতোই বললেন : দেখো বিভূতি, তুমি কিন্তু একটি ভুল করছ। তুমি তোমার গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারছ না। দেখছ না আমাদের সমাজে কত পরিবর্তন ঘটে গেল। দাঙ্গা, মন্বন্তর, অত বড় যুদ্ধের আঁচড় তো আমাদের গায়েও কম লাগেনি, যার ফলে সমাজের চেহারাটাই রাতারাতি পালটে দিলে। জীবনের মূল্যবোধ কীভাবে বদলে যাচ্ছে তা কি তুমি বুঝতে পারছ না ? যে বিশ্বাস নিয়ে আমরা বড় হয়েছি, সে-বিশ্বাস আজ কীভাবে ভেঙে পড়ছে সে তো তুমি তোমার চারপাশে দেখতেই পাচ্ছ। তোমার কি উচিত নয় তোমার সাহিত্যে এসব তুলে ধরা ?

অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তারাশঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বিভূতিবাবু বললেন, তুমি কি বলতে চাইছ তারাশঙ্কর ? আমি যা লিখেছি, তাহলে সেগুলি কি কিছুই হচ্ছে না ?

তারাশঙ্কর বললেন, আমি তা বলতে চাইছি না বিভূতি। আমি যা বলতে চাইছি, তোমার সাহিত্যে তুমি এখনও সেই গ্রাম আর নদী, সাঁই বাবলার জঙ্গল আর অরণ্য, এই নিয়েই পড়ে আছ। এর থেকে তোমাকে বৃহত্তর পটভূমিকায় বেরিয়ে আসতেই হবে।

তারাশঙ্করবাবুর অবশ্য একথা বলবার অধিকার ছিল। উনি তখন খ্যাতির তুঙ্গে। "হাঁসুলিবাঁকের উপকথা", "মন্বন্তর", "গণদেবতা" এইসব উপন্যাস তখন অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ওঁর বইয়ের কাটতি তখন যে-কোনো সাহিত্যিকের কাছেই ঈর্ষার কারণ।

বিভূতিবাবু কিন্তু তারাশঙ্করবাবুর যুক্তি মেনে নিতে পারলেন না। বললেন, আমি যে কোনো বড় ঘটনায় বিশ্বাসী নই তারাশঙ্কর। দৈনন্দিন ছোট-ছোট সুখ-দুঃখের মধ্যে দিয়ে যে জীবনধারা ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর মতো মন্থর বেগে অথচ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও আনন্দের সঙ্গে চলেছে— আসল জিনিসটা সেখানেই। আমি আমার গ্রামের চারপাশের প্রকৃতি আর মানুষদের মধ্যে এই জীবনটাকেই দেখি, আর বুঝি। আমার কথা তাদের নিয়েই। কোনো কৃত্রিম প্লট-সাজানো, প্যাঁচ-কষা, কৃত্রিম সিচুয়েশান তৈরি করা ও-সব আমি জানি না। সেই জন্যেই বোধহয় আমার কিছু হল না।

তারাশঙ্কর আবার সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, না বিভূতিভূষণ, তোমার মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা আছে। শুধু যুগের সঙ্গে, কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হবে। তা যদি না পারো, পিছিয়ে পড়বে তুমি।

আলোচনা যখন এই খাতেই গড়িয়ে চলেছে, তখন শিশুর মতো সরল, বিভূতিভূষণ হঠাৎ উঠে পড়ে তারাশঙ্করের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সোজা চলে গেলেন কবিশেখর কালিদাস রায়ের বাড়ি। কলকাতার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে টালা থেকে টালিগঞ্জে। কালিদাসদার সাহিত্যিক বিচারবোধের উপর বিভূতিবাবুর অসীম শ্রদ্ধা।

কবিশেখর সেদিন বাড়িতেই ছিলেন। উত্তেজিত বিভূতিভূষণকে দেখে বললেন, কী হে বিভূতি ? আবার কি হল ? হঠাৎ এ-সময়ে আমার কাছে ?

তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয়েছে তা সবিস্তারে কালিদাসদার কাছে পেশ করার পর বিভূতিভূষণ বললেন, আচ্ছা দাদা, আপনিই বলুন, আমি কি ভুল পথে চলেছি ? আমার লেখা কি সত্যিই মুছে যাবে ?

কালিদাস রায় স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চিন্তান্বিত বিভূতিভূষণের অসহায় মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

পরে ধীরকণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন, শোনো বিভূতিভূষণ ! দেবী সরস্বতীকে তারাশঙ্কর গা-ভরা সোনার গয়না দিয়ে যতই সাজান, তুমি দেবীর নাকের নাকছাবিতে যে হীরেটি বসিয়েছ তা দেবীর সারা অঙ্গের গয়নার জৌলুসকে ছাপিয়ে চিরটাকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তুমি যে-পথে চলেছ সেইটিই ঠিক পথ। সেইটিই তোমার ধর্ম। কখনও ধর্মচ্যুত হয়ো না।

বিভূতিভূষণ শান্ত হয়ে, সহসা চেয়ার ছেড়ে উঠে কালিদাস রায়ের পা ছুঁয়ে বললেন, চলি দাদা। আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি।

.....

সবচেয়ে বড় দুঃখটা কি জানো যোজনগন্ধা ? আজকের সাহিত্য জগতে কবিশেখর কালিদাস রায়ের মতো কোনো অগ্রজই নেই যাঁকে বিচারকের আসনে বসিয়ে, যাঁর পায়ের কাছে বসে ; বুকের কথা শুধোতে পারি ?

কালিদাস রায়, মোহিতলাল, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দদের দিন শেষ হয়ে গেছে। সেদিনের সব অগ্রজেরা আজ দুর্লভ। এখন কিছু ক্ষুদ্র-মনা, ঔদার্যহীন, স্বার্থপর, অর্থ ও যশ পিপাসু মানুষ ; সবার্থেই বামনেরা ; জবরদখল নিয়েছেন এই একদা-সম্মানিত জাতের।

শরৎবাবু রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে Perspective-এর কথাও উঠেছিল আবারও। তোমার মতো সাহিত্যানুরাগীর হয়তো সেই সব প্রসঙ্গ ভাল লাগলেও লাগতে পারে, জানলে।

শরৎবাবু লিখছেন :

"এ জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক অনেক জিনিস। আপনি যাকে বলেছেন, এদেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভাল কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না, হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধহয় এই বইখানাও (ষোড়শী) তার একটি উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে। সেই জানাই হল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃতও করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধহয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা ঘটছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না।"

এখানে আমি যোগ করব যে ইতিহাসও হতে পারে, সাংবাদিকতাও হতে পারে ; কিন্তু যাকে "ক্রিয়েটিভ লিটারেচার" বলে, তা হয় না।

শরৎচন্দ্রর এই চিঠিগুলি মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত শরৎ রচনাবলীতে

আছে।

"সাংবাদিকতা" আর "সাহিত্যে"র মধ্যে যে ব্যবধান তা সাম্প্রতিককালের খুব বেশি সাহিত্যিক বোঝেন বলেও আমার মনে হয় না। যা এখন লেখা হচ্ছে এবং তোমরা পড়ছ তার অধিকাংশই সাংবাদিকতাই ; সাহিত্য আদৌ নয়।

"ক্রিয়েটিভ" শব্দটি ব্যবহারের জন্যে আমাকে কম শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তির শিকারও হতে হয় না। কিন্তু আমি মনে মনে হাসি। কারণ, আমি কী করছি বা করেছি এই ক্ষেত্রে সে বিষয়ে আমার পূর্ণ সচেতনতা আছে।

আগামী প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকারা হয়তো বিচার করবেন, আমার বক্তব্য ঠিক, না ভুল। বিচার সেদিনই হবে। যদিও বিচারের ফল জানার জন্যে, তাঁদের পুরস্কার বা সম্মান গ্রহণের জন্যে আমি সেদিন এই পৃথিবীতে উপস্থিত থাকব না। তবু, এ কথা প্রমাণিত হবে যে, কোনো অন্যায়ের রাজত্বই চিরকালীন নয়!

শরৎচন্দ্র লিখছেন :

"কিন্তু সাহিত্যর চরিত্রসৃষ্টির বেলাতে ছবির মতো হয় না। মানুষের মনের খবর পাওয়া কঠিন। সেখানে নিজের খেয়াল বা প্রয়োজন মতো এর একটু, তার একটু, কতক সত্য, কতক কল্পনা জোড়া দিয়ে উপস্থিতমতো লোকরঞ্জন করা যায় কিন্তু কোথায় মস্ত ফাঁকি থেকে যায় এবং উত্তরকালে এই ফাঁকটাই একদিন ধরা পড়ে। কি জানি! হয়তো এই জন্যেই আজকাল প্রখর বাস্তব সাহিত্যর চলন শুরু হয়েছে। তাতে দলে দলে লোক আসে, সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারও কোনও বিশেষত্ব নেই, অর্থাৎ যেমনটি সংসারে দেখা যায়। অথচ সমস্ত বইখানা পড়ে মনে হয় এতে লাভ কি? কেউ হয়তো বলবে, লাভ নেই। এমনি। মাঝে মাঝে হয়তো অত্যন্ত সাধারণ মামুলী বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও নিপুণ বর্ণনা থাকে— তার ভাষাও যেমন আড়ম্বরও তেমনি, কিন্তু তবুও মন খুশি হয় না। অথচ ওরা বলে, এই তো সাহিত্য।"

(শরৎ রচনাবলী, মিত্র ঘোষ প্রাঃ লিঃ)

এই চিঠি পড়ে ধাঁধায় পড়ে যেতে হয়। তাই না? কী যে সঠিক সাহিত্য তা বোঝা ভারী মুশকিল। যদিও কোনওকালেই তা বোঝা সোজা ছিল না এবং কোনওদিনও 'সাহিত্য কি' এই প্রশ্নর সরল জবাব মিলবেও না।

তবু, ভাবতে হয় বৈ কি!

আমার এক বন্ধু বলেন, রবীন্দ্রনাথও শরৎবাবুর জনপ্রিয়তাকে ঈর্ষা করতেন। আমার তা মনে হয় না। ঈর্ষা ব্যাপারটা হয়তো রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল না। থাকলেও, তাঁর আত্মবিশ্বাস ও রুচির জন্যে তার প্রকাশ কখনও না হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। তবে শরৎবাবুর আত্মবিশ্বাসেও কোনও ফাঁকি আদৌ ছিল না। তিনি বিলক্ষণই জানতেন তিনি কী করছেন, কী লিখছেন এবং বর্তমানকালের দাবি পুরোপুরি মেটানোর পরও ভবিষ্যৎকালের উপরও যে তাঁর দাবি অবশ্যই থাকবে এ কথাটাও তিনি বেশ ভালো করেই জানতেন।

আমি তো মনে করি "বিপ্রদাস"-এর মতো একটি উপন্যাস লিখে উঠতে পারলেও বুঝতাম এ জীবনে কিছু করলাম। কী সংযম। প্রেম কথাটি একবারও উচ্চারণ না করেও কী অসাধারণ এক প্রেমকাহিনী!

আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই বলেন, "মেয়েরাই তো যুগে যুগে সাহিত্য সংগীত শিল্পকলা এই সবকিছুরই প্রকৃত কদর করেছেন এবং মূল্যায়নও করেছেন। তাঁদের মতটাই

তো আসল মত। তাছাড়া সেন্টিমেন্টের কথাই যদি বলিস তা'লে বলব সেন্টিমেন্ট তো গরু, গাধা, কুকুর, বেড়ালকে দিয়ে পাঠাননি ঈশ্বর! সে তো একমাত্র মানুষেরই প্রেরোগেটিভ। মানুষের সৃষ্ট সাহিত্যে সেন্টিমেন্ট থাকাটাই তো স্বাভাবিক।"

জানি না। আমি আঁতেল নই। এমনকি ফাঁকা-আঁতেলও নই। এই সব বিষয়ের বিচার করার ক্ষমতা আমার মতো দীন ও অজ্ঞজনের নেই। তোমার বিবেচনার বিষয় বলেই তোমাকে লিখলাম। তোমাদের দিল্লির আঁতেলদের সঙ্গে আলোচনা কোরো।

ভালো থেকো।

ইতি—
অর্যমা

শ্রীঅর্যমা রায়,
দ্যা জ্যাকারান্ডা,
হাজারীবাগ

গ্রেটার কৈলাস,
নিউ দিল্লি

অর্যমাদা,

আপনার চিঠি পড়ে কত কিছু জানলাম।

আমি কিন্তু 'মহাকাল'-এর বিচারে বিশ্বাস করি, শরৎবাবু না করলেও। বিশ্বাস না করেও তো উনি মহাকালের বিচারে স্থায়ী আসন পেয়ে গেছেনই!

আমার মনে হয়, আসলে পাঠকদের মধ্যে অনেক স্তরের পাঠকই থাকেন। মনে হয়, প্রত্যেক লেখকই ইচ্ছা করেন যে, উচ্চতম স্তরের পাঠকে তাঁকে স্বীকৃতি দিন। অথচ তাঁদের আবার জনপ্রিয় হবার বাসনাও থাকে। এতেই বোধহয় গোল বাধে।

তাছাড়া, এ কথাও ঠিক যে, বর্তমানকালে কোনো লেখকের পক্ষেই (তা তিনি যত বড় লেখকই হন না কেন) সমবয়েসী এবং সব স্তরের পাঠককে একই সঙ্গে সুখী করা কার্যত অসম্ভব। কোনও-কোনও লেখক হয়তো আছেন যাঁরা দ্বি-স্তরের লেখা লিখতে পারেন। একটি নিটোল গল্প থাকে সাধারণ পাঠকদের জন্যে এবং সেই গল্প ছাপিয়ে অন্য কোনও বক্তব্যও থাকে, যা সকলের জন্যে নয়। যাঁরা "বীটউইন দ্যা লাইনস" পড়তে জানেন সেই বক্তব্য শুধু তাঁদেরই জন্যে।

জানি না, ঠিক বললাম কি না।

সম্ভবতঃ আপনারই কোনও চিঠিতে পড়েছিলাম একসময়ে যে, একজন মানুষের মধ্যে অনেকই মানুষের বাস। কথাটা যে কতখানি সত্যি তা মাঝে-মাঝেই হৃদয়ঙ্গম করি। একজন লেখকের মধ্যেও অনেক লেখকের বাস। একজন পত্রলেখকের মধ্যেও অনেক পত্রলেখকের বাস। যে-"আমি" আপনাকে চিঠি লিখি সে "আমি"র সঙ্গে ইলাবিলা আর সিনিবালিকে "যে-আমি" চিঠি লিখি তার কোনওই মিল নেই। যে-আমি মিলওকিতে

নির্জনকে অথবা রানাঘাটে আমার ছোট পিসিমাকে চিঠি লিখি তার সঙ্গেও আপনাকে চিঠি-লেখা আমির বিন্দুমাত্র মিল নেই।

আপনার এই অ্যানালিসিস যে ঠিক তা নিজের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে থেকেও বুঝতে পেরে খুবই খুশি হই।

আচ্ছা, আপনারা লেখকেরা কি সত্যিই সাইকিয়াট্রিস্ট ? মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে, মনোজগৎ সম্বন্ধে এমন সব কথা আপনারা বলেন কি করে ? জানেন কি করে ?

এসব বিষয়ে কি পড়াশুনো করেন আপনারা ?

জানতে খুব ইচ্ছে করে।

ইতি—
যোজনগন্ধা

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
গ্রেটার কৈলাস ওয়ান
নিউ দিল্লি

দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা,

আজ দুপুরে বারান্দায় বসে লিখছিলাম।

লিখতে-টিখতেও আর ভাল লাগে না। একজন লেখকের জীবন তো একলাই। একাকিত্ব কাম্য হলেও মাঝে মাঝে হঠাৎই মন সঙ্গর জন্যে বড় কাঙাল হয়ে ওঠে। তবে এসব কষ্টই একজন লেখককে মেনে নিতে হয়ই। লেখকের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, যদি থাকে ; তবে বড়ই মূল্য দিতে হয় সে জন্যে। "দেয়ার ইজ নো মর‍্যাল কনসেপ্ট দ্যাট ডাজ নট হ্যাভ সামথিং ইনকনভিনিয়েন্ট বাউট ইট।"

লেখক হতে চাইবেন কেউ আর তার জন্যে যে মূল্য ধরা আছে তা ধরে দেবেন না, তা কি হয় ? বিনামূল্যে কি কিছুই পাওয়া যায় ? তবে নৈতিকতা ব্যাপারটা আপেক্ষিক। তা ছাড়া একেকজন লেখকের নৈতিকতা একেকরকম হওয়ারই কথা। লেখকের বিশ্বাস-অবিশ্বাসও।

"রাইটিং অ্যাট ইটস বেস্ট ইজ আ লোনলি লাইফ। অর্গানাইজেশনস ফর রাইটার্স প্যালিয়েট দ্যা রাইটার্স লোনলিনেস বাট আই ডাউট ইফ দে ইম্প্রুভ হিজ রাইটিংস।" এ আর্নেস্ট হেমিংওয়েরই কথা।

"অ্যাট ইটস বেস্ট" কিনা বলতে পারি না, তবে এ কথা মান্য বলে গণ্য করি।

এ কথাও বুঝি যে, একা-মানুষের অনেকেই বিপদ। বিষাদগ্রস্ততা তাঁদের প্রায়ই গ্রাস করে। এমনভাবেই করে যে, আমার তো মাঝে মাঝেই মরে যেতে ইচ্ছা করে।

এই মুহূর্তে আমি খুব সুখী ; পরক্ষণেই দুখী। এই ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছা করে তো

পরক্ষণেই ভীষণ মরতে ইচ্ছে করে।

তোমাকে বলিনি যোজনগন্ধা, একথা কাউকে বলারও নয় ; একবার মরতে গেছিলামও গোটা পঞ্চাশেক ঘুমের বড়ি খেয়ে। মাঝে, বছর তিনেক আগে। খুবই লজ্জার কথা, সন্দেহ নেই।

লজ্জার কথা, ভীরুতার কথা ; তা তুমি বলতে পারো। কিন্তু যে-মানুষটা এমন সুন্দর পৃথিবী থেকে চলে যেতে চায়, এমন রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শর দুর্মর ভালোবাসার পৃথিবী ছেড়ে ; তারও যে কিছু বলবার থাকে, ব্যাখ্যা হিসেবে ; এ কথা কেউই বোঝে না।

তিন ঘন্টা পরে অজ্ঞান অবস্থা থেকে হঠাৎ বমনবেগে জ্ঞানে ফিরে এসেছিলাম। ওষুধে কি ভেজাল ছিল ? নির্বিঘ্নে মানুষ কি মরতেও পারবে না এখানে ? ধন্য দেশ আমাদের এই স্বাধীন ভারত। এখানে প্রাণদায়িনী ওষুধেও ভেজাল, প্রাণঘাতিনী ওষুধেও ভেজাল। সত্যিই অভাবনীয় অবস্থা।

বিধাতার এ কোন রসিকতা আমার সঙ্গে জানি না ! না-মরার কোনও কারণই ছিল না। কিন্তু মরলাম তো না ! আর কী কষ্ট ! কী কষ্ট ! সাত-সাতটি দিন ঘোরের মধ্যে কাটল। লিভার জখম হয়ে গেল চিরদিনের মতো। মস্তিষ্ক, স্নায়ু, সব কিছুকেই লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল মরার অফলপ্রসূ চেষ্টা। এখনও সেই দিনরাতের কথা ভাবলে আতঙ্কিত হই।

গপুবাবু যা করেছিলেন তখন তা বলার নয়। সে ঋণ এ জীবনে শোধারও নয়। অনেকবার জন্মাতে হবে সেই ঋণ শোধ করতে।

তবুও মৃত্যু-ইচ্ছা বারেবারেই কেন যে জাগে ! ফিরে ফিরে আসে। অথচ আত্মহত্যার এই পৌনঃপুনিক ইচ্ছাটা কোনও বিশেষ রোম্যান্টিক কারণে আদৌ নয়। এই বিষাদকে বলা চলে, জার্মানরা যেমন বলেন : "Weltsmerz"।

বাংলায় তাকে কি বলা যায় ? অসীম বিষণ্ণতা ? বা বিশ্ববিষাদ ?

"বিশ্ববিষাদ" শব্দটা কবি নরেশ গুহ কোথাও ব্যবহার করেছিলেন। হয়তো কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই। ঠিক মনে নেই।

না যোজনগন্ধা, আমি ভীতু আদৌ নই। জীবনের কোনও যুদ্ধেই আমি লড়তে কোনওদিনও ভয় পাইনি। কিন্তু মানুষ হিসেবে, প্রতিপক্ষ যদি অত্যন্ত ছোট হয়, নীচ হয়, ইতর হয় ; তখন লড়াইয়ের ভাবনাটাই আমাকে বড় ক্লিষ্ট করে।

যে-কোনও লড়াইতেই প্রতিপক্ষের সমতলে অথবা উচ্চতায় যুযুধানকে নেমে অথবা উঠে আসতেই হয় ! উঠতে আপত্তি ছিল না কোনওই কিন্তু চিরদিনই নামতে বড়ই আপত্তি আমার। এই গহ্বরে নেমে যাওয়ার চেয়ে প্রতিপক্ষকে ওয়াক-ওভার দিয়ে দেওয়াও ভালো। আজেবাজে মানুষের সঙ্গে লড়ে নিজেকে ছোট করার চেয়ে সহজ-জয়ের ক্লেদাক্ত গৌরবও অনুকম্পারই সঙ্গে তাদের দান করে দেওয়া ভালো। তাদের জানানো ভালো, এই রৌরবের মধ্যে এখনও, তবুও এখনও বেঁচে আছি, নিজস্ব কাজ বলে যা জেনেছি, তাই করে যাচ্ছি।

এখনও অনেক কবি দারুণ কবিতা লেখেন। কোনও কোনও লেখক চমৎকার উপন্যাস লেখেন। শিল্পীরা নানা রঙের আগুনে মনকে নাড়িয়ে দেন। বেঁচে আছি, কারণ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ তারাপদ রায় অথবা তরুণ অরুণ নাগের নির্মল রসবোধসম্পন্ন লেখা পড়তে পাই। এখনও ভীমসেন যোশীর গান সামনে বসে শুনতে পাই। বেঁচে আছি, জয় এবং আরও অগণ্য তরুণ কবিরা এমন ভালো কবিতা লেখে বলেও, শঙ্খদা কবিতা

লেখেন বলে, দেবেশ রায় গদ্য লেখেন বলে। বেঁচে আছি, সুভাষদা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, তারাপদ রায় এবং সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর উদাত্ত কণ্ঠের হাসি এখনও শুনতে পাই ; তাই। এমন হাসি আজকাল কম মানুষেই হাসেন।

> "হেসো না দোয়েল, আমি বরাবর বাগানের লোক, আমি নানা রকমের কাজ জানি। যেমন এই ঘাস তোলা বীজ রাখা হাতে হাতে ফুলগাছ লাগানো, তুমি হেসো না দোয়েল আমি প্রথম দিনেই তোমাকে চিনেছি গাছে বসবার সময়—কারণ আমি চিরকাল গাছেদের লোক। এ সবের মধ্যে আমি যাব না ভেবেছিলাম, কিন্তু তুমি প্রথমদিনেই বললে, 'আমাকে পছন্দ মালী' ? পছন্দ, পছন্দ। আর কতবার বলতে হবে আজ খুঁদকুড়ো যা পেয়েছি কুড়িয়ে বাড়িয়ে জোগাড় করেছি তুমি চালেডালে যা হোক একটা কিছু শিগগির চাপিয়ে দাও আমি গিয়ে বন্ধুদের খেতে বলে আসি..."

জয় গোস্বামীর কবিতা।

তুমিই বলো ? যোজনগন্ধা, এক্ষুনি কি মরা চলে ? বন্ধুদের খেতে বলে দিয়েছি, এমন সোনালি রোদ চারিদিকে, এমন বোগোনভোলিয়া আর চন্দ্রমল্লিকা, যে চন্দ্রমল্লিকা ছিঁড়ে নিয়ে তুমি তোমার ফিনফিনে মিহি চুলের ঢলে গুঁজতে, যখন এখানে ছিলে।

বলো মেয়ে ? তুমিই বলো ? মরা কি উচিত এখুনি ?

ইতি—
অর্যমা

পরমহংসদেব রোড
চেতলা, কলকাতা

যোজা,

এই চেতলা থেকে হাওড়া, হাওড়া থেকে ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরের কলেজ এবং সেখান থেকে চেতলা ফেরা আর পারি না রে। এই "ডেইলি পাষণ্ডগিরি" আর সহ্য হয় না। বয়স হয়ে যাচ্ছে তো। সিনিবালিও আর বাচ্চা ঠ্যাঙাতে পারে না। ক্লান্ত। তারপরে রান্না। আর রাঁধবেই বা কি ?

আহা ! হাজারীবাগের টাটকা তরিতরকারি কী স্বাদ রে ! পুজোর সময়েই ওই ! আর শীতের সময়ে না জানি কেমন হবে ! শীত তো অবশ্য জাঁকিয়ে এসেছে।

তুই হাজারীবাগে গিয়ে থিতু হয়ে বোস, অর্যমাদার স্ত্রী হয়ে তার পর আমরা তোর দুই সখী অথবা বাঁদী হয়ে ওখানেই গিয়ে থেকে যাবো। প্রতি মাসে যা পারি তাই দেব তোকে খরচ বাবদ। বাকি জীবনটা তোর কাছে এবং আমাদের প্রিয় লেখকের কাছে তো থাকা

হবে। বই পড়ব, গান শুনব, আর তোদের সবরকম দেখাশোনা করব।

রাজি থাকিস তো জানাস।

সমরেশ বসুর একটি বই ছিল না। কী যেন! "বিকেলে ভোরের ফুল।"

তোর জীবনে দেখি তাই প্রায় সত্যি হতে চলেছে!

হয়তো তার চেয়েও বেশি।

ইতি—
ইলবিলা

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
গ্রেটার কৈলাস ওয়ান
নিউ দিল্লি

ইলবিলা কুণ্ডু,
পরমহংসদেব রোড
চেতলা

নিউ দিল্লি

ইলবিলা ফাজিল,

ইয়ার্কি মারিস না।

তোদেরই মতো, কোনও পুরুষমানুষকেই আমি বিশ্বাস করি না।

যদি হাজারীবাগে থাকিও সত্যি-সত্যিই তবে তোরা হাজারীবাগে যতবার খুশি বেড়িয়ে যেতে পারিস কিন্তু পার্মানেন্টলি থাকা মোটেই চলবে না। খাল কেটে কুমির আনতে কে আর চায় বল?

তা ছাড়া, মেয়েদের ব্যাপারে পুরুষমানুষদের রুচি বলে কোনও বস্তুই নেই। মেয়ে হলেই হল। লেখকই বল, গায়কই বল, খেলোয়াড়ই বল; বড় সাহেবই বল সবই দেখা আছে আমার।

আসলে আমাদের যেটা বল, সেটাই পুরুষদের দুর্বলতা।

বিধাতা আমাদের অবলা করে রাখলেও ওদের কল-কাঠি আসলে আমাদেরই হাতে।

বুঝেছিস রে বোকাইটা!

ভাল চিন্তা করো। মনকে সুপথে চালনা করো। আমার পাকা ধানে মই দিতে এসো না।

ইতি—
যোজা

পুনশ্চ: এসব নিয়ে লিখিতভাবে এমন সব ইয়ার্কি কি করতে আছে? অর্যমাদা জানতে পেলে আমাদের তিনজনকেই কী ভাববেন বল তো!

শ্রীঅর্যমা রায়,
দ্যা জ্যাকারান্ডা,
হাজারীবাগ

নিউ দিল্লি

অর্যমাদা, শ্রদ্ধাস্পদেষু,

গত রাতে আপনাকে খুবই "মিস্" করলাম।

জওহরলাল নেহরু ট্যানিভার্সিটিতে আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক, ইকনমিকস্-এর প্রফেসর ; পরমেশ্বর সেনগুপ্ত আমার অফিসের এক কলিগের দাদা, একটি গানের অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করেছিলেন। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী, পরমেশ্বরদা আর লীলাদি দু'জনেই জে· এন· ট্যুর অধ্যাপক-অধ্যাপিকা। গান বাজনা দু'জনেই খুব ভালবাসেন।

আপনি কি কখনও রাজা দাস-এর বাজনা শুনেছেন ? তবলিয়া রাজা দাস-এর ? রাজারই মাসতুতো অথবা পিসতুতো ভাই, চকোর বোস। রাজা এবং চকোর দু'জনেরই কাটা কাটা চোখ-নাক-চিবুক। এবং মুখে দাড়ি। ঘাড়ের চেয়েও নিচে নেমে আসা ঘন চুল। দু'জনকেই নাক-চিবুক দাড়ির দৌলতে শিখ বা অন্য উত্তর ভারতীয় বলে অবলীলায় চালিয়ে দেওয়া যায়।

পরমেশ্বরদা চকোর বোসের গান শোনাবার জন্যই দিল্লির কিছু বন্ধুবান্ধবকে ডেকেছিলেন।

চকোর-এর বয়স ত্রিশের কোঠাতেই হবে। হয়তো শেষের দিকে। এত রোগা ভদ্রলোক যে, দেখে কষ্ট হয়। গাল দুটি ভেতরে ঢুকে গেছে। বোধহয় ত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি।

কিন্তু প্রথমে যখন 'সা' বললেন, গলা শুনে মনে হল, প্ল্যানচেটের ডাকে উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবই স্বয়ং চলে এসেছেন হঠাৎ। এই রকম ভরাট আওয়াজ, এরকম জুয়ারি, বহুদিন শুনিনি। তবে অত ছোট জায়গাতে মাইকের বড়ই আধিক্য ছিল। আসল গলাটি কেমন তা বোঝাই গেল না।

গায়ক এতই রোগা যে, তান বিস্তার করার সময়ে, ভয় হচ্ছিল, ওঁর দু'পাটি দাঁতই বুঝি একসঙ্গে খুলে আসবে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নানা আঙ্গিকেই গান করেন। গলায় দাপট আছে এবং মিষ্টত্বও।

শুনে গেছিলাম যে, উনি নাকি শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের প্রিয় ছাত্র আই· টি· সি--র "অলডীন"-এর অজয় চক্রবর্তীর চেয়েও আজকাল ভাল গাইছেন। অজয় চক্রবর্তীর গান আমি কলকাতায় একবার এবং দিল্লিতেও একবার শুনেছিলাম। সে এক মধুর অভিজ্ঞতা। সঙ্গে অজয়ের স্ত্রী চন্দনাও ছিলেন। তবে উনি গাননি। চন্দনা নিজেও অত্যন্ত ভাল গায়িকা। শুনেছি।

গায়ক নিজেই হারমোনিয়ম বাজিয়ে গাইছিলেন। কিন্তু অবাক লাগল এই দেখে যে,

সঙ্গে একটিও তারের বাজনা ছিল না। কী এস্রাজ, কী সারেঙ্গী ; কী দিলরুবা। এমনকি তানপুরাও নয়! প্রথম দিকে সুর সামান্য নড়ে যাচ্ছিল এবং স্বর কোনও পর্দাতেই স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছিল না। ঠাণ্ডার জন্যেও হতে পারে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই গলা গরম হয়ে উঠতেই সেইসব প্রাথমিক অসুবিধা কেটে গেল।

দাদ্‌রা দিয়ে শুরু হল। তারপর ইমন্। তারপর বাগেশ্রী।

পঞ্চমের কাজে মন ভরে গেল।

এই শেষোক্ত মন্তব্যটি কি ইদানীংকালের কোনো কোনো পত্র-পত্রিকার সঙ্গীত-সমালোচকদের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্যের মতো হয়ে গেল?

একটি দরবারী তারানাও গাইলেন। 'অসাধারণ'! আর সেই তারানারই মধ্যে সপাট দুনী আর ছুটতানের ফুলঝুরি উড়িয়ে দিলেন চকোর। গায়ের সব রোম খাড়া হয়ে উঠল। মনে হল, ঘরের মধ্যে একদল জংগী বুলবুল ঢুকে গেছে যেন। তারা এমনই হুটোপাটি-লুটোপাটি করতে লাগল যে, মনে হল গৃহস্বামীর ঝাড়লণ্ঠনটিই বুঝি তানের দাপটে ফুটিফাটা হয়ে আমাদের মাথা-গা-ময় ঝুরুঝুরু করে ঝরে পড়বে।

সত্যি অর্যমাদা! ভাল গানের মতো দুঃখহারী এবং হয়তো দুঃখেরও আর বেশি কিছু নেই। ভাল গান শোনা এক দারুণ অভিজ্ঞতা। গায়ক যখন ভাল গান করেন, তখন তাঁর গানের লুৎফ্ আর দরদও ফুটে ওঠে শ্রোতাদের প্রত্যেকের মুখে মুখে। এও বড় ছোঁয়াচে রোগ। সেই গায়কের কাছকাছিও যাঁরা থাকেন তাঁদের মধ্যেও সঙ্গে সঙ্গেই এ-রোগ সংক্রামিত হয়।

সবচেয়ে যা অবাক করেছিল আমাকে তা ঐ দুবলা শরীরের মধ্যে এমন মেঘগর্জনের মতো স্বর। কী করে যে বেরুচ্ছিল!

মিঞাকি মল্লার গাইবার সময়ে একটি সপাট্ হলক্ তানে আমাদের সকলের চোখই কপালে উঠে গেল। যাঁরা মাথা নাড়ছিলেন, তাঁদের মাথা নাড়াও বন্ধ হয়ে গেল তালের বুলন্দিতে।

কোন রাগ গাইবেন তা বোঝার আগেই চলতা লয়ের গান আরম্ভ করে দিয়েছিলেন চকোর। ছোট ছোট রঙ্গিলা ফিকর্‌বন্দী তান আর ফিরত্-এর খেলা দিয়ে।

সকলেই বললেন, ওয়াহ্! ওয়াহ্!

মিঞাকি মল্লার রাগের বহুমুখী মূর্তিটিকে সুরের আলপনা বুলিয়ে বুলিয়ে যখন কায়েম করে ফেললেন চকোর বোস তখন সে রাগের রূপ দেখে কে! আহা!

রাজা দাস-এর আঙুলগুলি এমন দীর্ঘ, টেপারড্ ও সরু যে তা দেখবার মতো।

এত চমৎকার তবলার হাত ভদ্রলোকের!

বলতে ভুলে গেছিলাম, চকোর বোস হারমোনিয়মও বাজান অনবদ্য। সেই কারণেই তবলা ছাড়া অন্য কোনও যান্ত্রিক অনুষঙ্গ হয়তো বর্জন করেছিলেন। যাতে, হারমোনিয়মই প্রধান্য পায়। তালের উপর দখলও দেখবার মতো। কিন্তু জায়গায় জায়গায় সুর একটু কম লাগছিল এবং কোথাও কোথাও অনুপল-এর জন্যে হলেও, গলা বেসুরো হচ্ছিল। আমার মনে হয়, সেটা হচ্ছিল দাপটের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়াতে। দাপট, গানের পৌরুষ ; নিঃসন্দেহে মস্তবড় গুণ! কিন্তু গানকে সুর লয়, তাল, ভাব সমস্ত কিছু মিলিয়েই যে গান হয়ে উঠতে হয়! গানের মধ্যে এই সম্পূর্ণতা যে মস্ত বড় জিনিস। এ থেকেই সাবলীলতা আসে। তাই না? বিধাতার সৃষ্ট পাখির অবলীলায় উড়ে যাওয়ার সুন্দর ছন্দরই মতো!

গায়কমাত্রই তো বিধাতাও ! যদি তিনি সত্যিই গায়ক হন !
আপনি কি বলেন ? আপনিও তো ভালো শ্রোতা। এবং সখের গায়কও !

ইতি—
অনধিকারী যোজনগন্ধা

পুনশ্চ : চকোর বোস-এর গান কিন্তু অজয়ের গানের মতো ভালো লাগল না।

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
গ্রেটার কৈলাস ওয়ান
নিউ দিল্লি

দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা, কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠি পেয়ে ভাল লাগল।

চকোর বোস-এর গানের কথা আমিও শুনেছি গান-বাজনার ম্যাগফিলে। রাজা দাস-এর মাসতুতো ভাই বলেই নামটি দ্রুত ছড়াচ্ছে। আশা করি, ভবিষ্যতে তার জীবনে দাদার ভূমিকা সে অস্বীকার করবে না।

অজয় চক্রবর্তী এবং চকোর বোস-এর গান সম্বন্ধে তুলনামূলক যেসব কথা তুমি বলেছ তাতে মতামত দেওয়া আমার সাজে না। কারণ চকোর বোস-এর গান আমি শুনিনি। অজয় চক্রবর্তীর গান যদিও বহুবার শুনেছি। ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে অজয়ের উপরে। আশা করব সেই আশীর্বাদ বহন করার যোগ্যতা, ধৈর্য এবং সংযমও ঈশ্বর ওঁকে দেবেন।

তবে তোমার দেওয়া তুলনা শুনে আমার একটি গল্প মনে পড়ে গেল। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মশায়ের "স্মৃতির অতলে" বইতে পড়েছিলাম। এই বইটির প্রকাশক "জিজ্ঞাসা"।

সংগীতজ্ঞ এবং সুরসিক অমিয়বাবু (শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল) এবং তাঁর 'কাজিন' ডাক্তারবাবু "নিকুন" একদিন সকালে হঠাৎ ট্রামে দেখা হয়ে যাওয়াতে উস্তাদ কালে-খাঁ সাহেবের পিছু পিছু চললেন ওঁর ডেরা দেখতে। তারপর কালে-খাঁ সাহেবের সেই ডেরায় গিয়ে, "কে রে ? কে রে ?" বলে-ওঠা বা "ঠিক্ ঠিক্" বলে ওঠা তক্তপোষ-এর উপরে বসে ওঁর "আসাওরি" শুনতে পেয়েছিলেন ওঁরা দু'জনে। সৌভাগ্যবশে।

সেই অনবদ্য আসাওরী শোনার পরই নিকুনবাবু বলেছিলেন ওস্তাদ কালে-খাঁকে, যে এর পরে যদি কেউ আমাকে আসাওরী শোনাতে আসে তখন তাঁকে প্রথমেই বলব যে, কালে-খাঁ সাহেবের "আসাওরী" কি শুনেছেন ? না শুনলে, আগে সেই "আসাওরী" শুনে আসুন গিয়ে তারপরই না হয়, আপনার "আসাওরী" শোনাবেন।

কথাটা বলা হয়েছিল অবশ্যই কালে-খাঁ সাহেবকে খুশি করার জন্যে।

কিন্তু এ কথা শুনে উস্তাদ কালে খাঁ বলেছিলেন, গভীর বিনয়ের সঙ্গে এবং হয়তো

কিঞ্চিৎ ব্যথিতও হয়ে যে, "নহী বাবুসাব, এ্যয়সা মত কহিয়ে।"

কিন্তু সে যুগে তো চালাকির দ্বারা মহৎ কর্মে বিশ্বাসী মানুষের ভীড় আজকের মতো এমন ছিল না। প্রত্যেক গুণীই পাদপ্রদীপের আলোর সামনে এসে দাঁড়ানোর আগে তাঁদের পেছনে থাকত দীর্ঘদিনের সাধনা, সংযম ; তালিম। গুণের সঙ্গে বিনয়ের সাযুজ্য ছিল সেই সব দিনে। অবশ্যই ছিল।

তারপর ব্যথাতুর গলাতে উস্তাদ কালে-খাঁ সাহেব বলেছিলেন, "গুণীওমে একসে এক হ্যায়। আল্লাহি জানে, হরেক ইনসানকে দিমাগ কিস কদর লায়েকিসে ভরা হুয়া হ্যায়। ফির, হমারে আপকে কহনেসে ক্যা হক্ হ্যায় ?"

কথাটার মানে হল, এক গুণীর সঙ্গে অন্য গুণীর কখনও তুলনা করতে নেই। এ ভাল গায়, ও খারাপ গায়, এই রকম আলোচনা করাটাই মূর্খামি। কারণটা হচ্ছে এই যে, একের থেকে বড় অন্য গুণী অবশ্যই আছেন। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, কোন মানুষের মধ্যে কতখানি "লায়েকি" অর্থাৎ গুণ ও কর্মের যোগ্যতা আছে। ঈশ্বর এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ। আমি তুমি তো তা নই!

তুমিই বলো, তুমি বা আমি কি ভারতের সমস্ত গুণীর গান শুনেছি যোজনগন্ধা ? না, সব লেখকের লেখা পড়েছি ? কেউ হয়তো দরবারী কানাড়াতে কাঁচা অথচ তিলোক কামোদ পাকা। কী বলবে ?

দেখেছ তো ? ঈশ্বরের কথা এসে যায়ই ! বুঝেছ। আমরা সর্বজ্ঞ নই বলেই ঈশ্বরের কথা এসে পড়েই। এক একজন একেকরকম।

প্রত্যেক ক্ষেত্রের প্রত্যেক গুণীকেই ওজন করে তুলনা করতে যাওয়াটা অত্যন্তই অনধিকার চর্চা। প্রতিভার কাছে আসতে পারাটা, তাঁকে সম্মান করতে পারাটাই হচ্ছে সবচেয়ে সেরা কাজ। "ময়ূরের শুঁড় নেই, হাতি পেখম ধরতে পারে না," এ-রকমের বিচার করাটা শিল্পকলার সমালোচনা নয়।

তবে, তোমাকে দোষ দিই না। সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা, গান ইত্যাদির সমালোচনা ব্যাপারটা পুরোপুরিই আজকাল কুরুচিসম্পন্ন, অসৎ, কুচক্রী, দুষ্ট-বুদ্ধির কিছু মানুষের কুক্ষিগত হয়েছে। আজকালকার কাব্য-সাহিত্য-শিল্পকলার টেইলরড ক্রিটিসিজম্-এর ধুলোর ঝড়ের মধ্যে পাঠকদের, শ্রোতাদের কাছে যা সত্য, তা হয়তো প্রতিভাতই হয় না। সে কারণেই, "কাগুজে" সমালোচনার "কাগুজে বাঘ"দের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসও সাধারণের পুরোপুরিই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

জানি না, কবে আবহাওয়া নির্মল হবে, শুভবোধ, রুচিবোধ, এই জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

কোনো খবরের কাগজ এবং কোনো পত্রিকাই কোনো গুণীর জন্মও দিতে পারে না, তাঁর মৃত্যুও ঘটাতে পারে না।

যাঁরা উল্টোটা মনে করেন বা বিশ্বাস করেন, তাঁরা প্রকৃত গুণীদের জানেন না।

যাই হোক, ভবিষ্যতে এক গুণীর সঙ্গে অন্যের কখনওই তুলনা কোরো না।

ভালো থেকো।

ইতি—
অর্যমা

boiRboi.net

শ্রী অর্যমা রায়
দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ
বিহার

জি. কে. ওয়ান
নিউ দিল্লি

অর্যমাদা, শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি পেলাম। পেয়ে, শিখলাম অনেক কিছুই।

চিঠিতে সমালোচকদের কথা তুলেছেন সেই সমালোচনা প্রসঙ্গেই বলি যে, আমাদের এখানে একজন সঙ্গীত-সমালোচক আছেন তাঁকেও আপনার চিঠিটি দেখাব ভাবছি।

খবরের কাগজ বা পত্র-পত্রিকা আজকাল যেসব ব্যক্তিকে সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্রকলার সমালোচক হিসেবে নিয়োগ করেন তা দেখে, শুধু সমালোচকই নয় ; কাগজগুলি এবং পত্র-পত্রিকাগুলি সম্বন্ধেও গভীর অনুকম্পা জন্মায়।

এতে অবশ্য ক্ষতি হবে সেই সব কাগজেরই। পায়ের তলা থেকে যখন বালি সরে, তখন বোঝা যায় না। পাড় যখন ভেঙে নদীতে পড়ে, তখনই বোঝা যায়।

দেশটা মেরুদণ্ডহীন, স্বার্থপরায়ণ, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন ইন্‌টেলেকচুয়াল্‌স-এ ভরে গেছে অর্যমাদা।

আড়ালে সেই সমালোচক বলেন, কী বলব ! মালিক কি গান বোঝেন ? না সাহিত্য বোঝেন ? টাকা থাকলেই সব বোঝার ক্ষমতা এসে যায় ?

অথচ যখন কলম হাতে নেন তখন মালিকের মুখটি চোখের সামনে ভাসে। এবং তাঁদের বাড়ির কুকুর-মেকুরের প্রশংসাতেও পঞ্চমুখ হন।

যাই হোক, আপনার চিঠিটি তাঁকে দেখাব। যদি কিছু শেখেন। শেখারতো কোনো সময় নেই ! মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত শেখার সময়। যাঁর শেখার ইচ্ছা আছে। একটুও।

ইতি—
যোজনগন্ধা

boiRboi.net

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
নিউ দিল্লি

দ্যা জ্যাকারান্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা, কল্যাণীয়াসু,

আজই সকালবেলার এক আকাশ মন ভাল করা আলোর মধ্যে বারান্দাতে বসে বিয়ের কথা ভাবছিলাম। মন্দ হত না একটা বিয়ে করে ফেলতে পারলে।

তুমি কী বলো!

বাঙালী অনেক কিছুই করতে পারে না, বা করে না। যেমন, কাজ। যেমন, কলকাতার আড্ডা আর বন্ধুবান্ধব ছেড়ে বাইরে কাজ করতে যাওয়া। যেমন, নিয়মানুবর্তী হওয়া। কিন্তু একটি ব্যাপারে তার উৎসাহের এবং ক্ষমতার কোনও ঘাটতি দেখা যায় না আদৌ। তা হচ্ছে, বিয়ে-করা।

যা বলছিলাম, মাঝে-মাঝেই যে বিয়ে-পাগলা হয়ে উঠছি ইদানীং তাও সত্যি। বিশেষ করে তোমার মতো কেউ যদি খোঁচাখুঁচি করে।

মন যে দুর্বল হচ্ছে এটা অত্যন্তই ভয়ের কথা।

কিন্তু শঙ্খদার (কবি শঙ্খ ঘোষ) সেই কবিতা আছে না?

"হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়
সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়
এ কথা খুব সহজ, কে না জানে
সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।"

বুঝেছ?

কী বুঝেছ?

ইতি—
অর্যমা রায়

boiRboi.net

অর্যমা রায়
দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

গ্রেটার কৈলাশ
নিউ দিল্লি

অর্যমাদা,

অনেকদিন আপনার চিঠি পাই না কেন ?

হাজারীবাগের কথা কেন আরও বেশি করে লেখেন না ?

যখনই মনে হয় হাজারীবাগেই গিয়ে থাকবো তখনই মনে হয় যেই সেখানকারই বাসিন্দা হয়ে যাবো তখন হয়তো আমার মনের হাজারীবাগ আর সেই হাজারীবাগ থাকবে না। আপনার মনই যে বুঝি না।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আছে একটি, পড়েছেন কি না জানি না, নাম "শুধু দুদিনের জন্যে"। "যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো" শীর্ষক সংকলনে আছে।

"শুধু দুদিনের জন্যে ঘর ছেড়ে বাহিরে বেরুনো
দুদিনের জন্যে শুধু ঘর ছেড়ে পথের ওপরে—
বনের ভিতরে বাংলো, বাংলো থেকে দেখা যায় নিচে
কাকচক্ষু জলস্রোত ভেসে আছে নদীর পিরিচে
দুধার উধাও ঐ জঙ্গলের পাহাড়ের দিকে
দুধার নেমেছে নিচে রমণীর উরুর মতন
সানুদেশে, উপত্যকা জুড়ে এক দৃশ্যের সুষমা
দুদিনের জন্যে টানে, চিরদিন নয় !
চিরদিন ঘরে থাকা, পরে থাকা অন্তরে, গভীরে..."

গানের ক্লাসে যাবো। এখানেই শেষ করছি।

যোজনগন্ধা

পুনশ্চ:

জানুয়ারীর শেষে থাকব আপনার কাছে।

boiRboi.net

নারী বা পুরুষের পক্ষেই একথা বলা ভারি মুশকিল, ভারি লজ্জার যে, "আমি তোমাকে ভালোবাসি"। কত কষ্ট করে, নিজেকে কত ছোট করে যে, একথা বলতে হয় তা কী বলবো!

কিন্তু বলে ফেলার পরেও ছুঁড়ে-দেওয়া নৈবেদ্য বা অঞ্জলির ফুল যে সেখানেই রইলো। পুরুত মশাইয়ের টাকে গিয়েই আটকে গেল। দেবতার পায়ে আর পৌঁছলো না। আমার সেই হস্তচ্যুত নৈবেদ্য গ্রহণ করে অপমানকে মান দিলেন না এত দিনেও! আমার জীবনে সত্য হয়ে, স্পষ্ট হয়ে, আমার ভবিষ্যৎ হয়ে আসবেন বলেও কথা দিলেন না। কখনও কি ভেবেছেন, আপনি হলে কি করতেন? আমার জায়গাতে আপনি হলে?

আজীবনই কি এমনিভাবে নিজের ভবিষ্যৎকে জ্যৈষ্ঠর নাবাল জমির উপরে দৌড়ে-বেড়ানো অবাধ্য-ঘোড়ার পিঠের জিন করে ছেড়ে রাখা যায়? বলুন? কবে কেউ এসে বসবেন, সেই আশায়? যদি তা কখনও ছিঁটকে পড়ে যায়?

আপনি কি আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করেন না?

অর্যমাদা?

মাঝে মাঝে ভাবি, কেন যে আপনার সঙ্গে মুহূর্তের জন্যে কোডারমা স্টেশনে, থুড়ি, ঝুমরি-তিলাইয়াতে দেখা হলো!

সব মেয়েই কম বেশি রোম্যান্টিক। আমি তো ছেলেবেলা থেকেই খুবই রোম্যান্টিক। রোম্যান্টিসিজম, তা জীবনে বা সাহিত্যে বা অন্য কোনো ক্ষেত্রেই দোষের বলে জানিনি কোনো দিনই। পশুর যে সব বোধ নেই, শুধুমাত্র মানুষেরই আছে; সেই সব বোধের মধ্যে রোম্যান্টিসিজিম্‌ও অন্যতম। হয়তো আপনার ঈশ্বর-বোধও। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরেও হয়তো সম্পর্কটা এতদূর এগোতো না যদি না চিঠিতে লিখতেন আপনি, "ঝুমরী-তিলাইয়ার" কথা। শুধুই কি তাই? তারপর এলো সিতাগড়া কানহারী, সিলাওয়াড় পাহাড়ের কথা, কুসুমভা গ্রাম, সিঁদুর, সুলতানা, বনাদাগ, টাটিঝারিয়া, টুটিলাওয়া, সীমারীয়া, বনগাঁওয়া এমন সব ঋংকৃত প্রত্যশা-ভরা নামের সব অদেখা জায়গার কথা। জায়গার নাম শুনেই জায়গার প্রেমে পড়লাম। আপনার প্রেমে তো পড়েছিলামই বারো বছর বয়সে। সেই কিশোরীর মনের মধ্যে যে অস্পষ্ট ছবিটি ছিলো তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এই দারুণ পটভূমিতেই।

তারপর হাজারীবাগে সশরীরে গেলাম। আপনাকে দেখলাম নিজস্ব প্রেক্ষিতে। আপনার মনে। এবং বনে। লেখার ঘরে, ছবির ইজেল-এর সামনে। অর্গানের সামনের আপনাকে দেখলাম। গান শুনলাম। কথা শুনলাম। আলো-ছায়া প্রতিসরিত চিকন-সবুজ ফার্ন-এর মধ্যে দিয়ে বয়ে-যাওয়া পাহাড়ী ঝর্নার স্পষ্ট অথচ অনুচ্চ স্বগতোক্তির মতো। তারপর...

তারপর তো সব জানেনই!

আপনারও মুখোস আছে। হয়তো একাধিকই আছে। সেই মুখোস খুলে আপনার মুখটিকে কি দেখতে দেবেন আমাকে? একবারের জন্যেও?

এই চিঠির একটি সিরিয়াস উত্তর কি দেবেন? যদি না দেন, তবে কী যে করবো আমি তা ভেবেই পাই না।

পুরুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস প্রত্যেক নারীরই প্রত্যাশার। কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাস, এমন বাড়াবাড়ি রকমের থাকাটা আদৌ ভালো কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আমার নিজেকে বড় খেলো, সস্তা বলে মনে হচ্ছে কিছুদিন হলো। যে-ইডিয়ট

নিজেকে অতি সস্তাতে বিকিয়ে দিয়েছে আর কোনো উচ্চমূল্যর আশা তো সে আর করতে পারে না !

ভালো থাকবেন ।

—ইতি যোজনগন্ধা

শ্রী অর্যমা রায়
দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

গ্রেটার কৈলাশ
নিউ দিল্লি

অর্যমাদা,

নাঃ । ঠিক করেছি আপনাকে মাস্টারমশাই বলেই ডাকবো আবার ।

আপনি যদি আসেন তাহলে তো চমৎকার হয় ! আপনার আসা তো নয় ; সে যে আবির্ভাব !

আপনি এলেই এই ফুচকা আর ভেলপুরীর, ঘুষ-ঘাষ আর ফিস্‌ফিসানির ; স্কুটার আর অটোর আওয়াজে মস্তিষ্ক-বিকৃত শ্রীহীন দিল্লি শহর উৎসবমুখর হয়ে উঠবে । শীতের দিল্লিতে রজাই-এর চেয়েও উৎসব অনেক বেশি জরুরী । "তামাশা" এখানে লেগেই থাকে । উৎসবই দিল্লির হরওয়াক্ত-এর উষ্ণতা ।

আপনি না এলে আমিই যাবো । জানুয়ারীর শেষে যে ক'দিন ছুটি থাকে না প্রতিবছর ? সেই সময়ে । তারই সঙ্গে কঁদিন ছুটি নিয়ে চলে যাবো । দিল্লি থেকে পাটনা এবং সেখান থেকে প্লেনে রাঁচিও আসতে পারি । রাঁচি থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সেই গোটাপালু না ছোটাপালু কী ঘাট পেরিয়ে পৌঁছে যাবো আপনার কাছে ।

আমাকে নেতারহাট বেতলা—এ সমস্ত দেখাবেন তো ? এবারে ?

ফেরত ডাকেই উত্তর চাই কিন্তু । আগে থাকতে ছুটি নিতে হয় !

—যোজনগন্ধা

পুনশ্চ :

আমি অফিস থেকে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে আলাদা টাকা পাই ।

boiRboi.net

দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা,
কল্যাণীয়াসু,

তোমার সংক্ষিপ্ত চিঠি ছাড়াও আরও একটি চিঠি পেয়েছি গত পরশু। তুমি সত্যিই আসছো জেনে ভারী ভাল লাগছে।

চিঠিটি পাওয়ার পর থেকেই বড়ই অস্বস্তিতেও আছি। আফটার রীডিং বীটউইন দ্যা লাইনস তোমার ইদানীংকার কোনো চিঠির অর্থ প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে আমার কোনোই কষ্ট হয়নি।

মিথ্যা বলব না, চিঠিটা পড়ার পরই মন খুশিতে আপ্লুত হয়ে গেছিল এবং পরক্ষণেই দুঃখেও।

সেই ক্ষণ থেকেই বড় কষ্টে আছি।

তোমাকে তড়িঘড়ি কিছু কথা বলা দরকার যাতে তুমি আমাকে ভুল না বোঝো।

কখনও কখনও এমনও ঘটে যে অন্তরের অন্তরতম স্থলকে নিংড়ে দিয়ে করপুটে তাকে তুলে নিয়ে অঞ্জলিভরে নৈবেদ্য সাজিয়ে কারো পায়ে তা ঢেলে দিলেও তাৎক্ষণিক দেবতা-রূপী সেই মানুষ বা মানুষী চোখ মেলেন না। এমনটি কিন্তু দু'পক্ষের কারোই দোষ-গুণের কারণে ঘটে না। নেহাৎই ভবিতব্য বলেই ঘটে। কিন্তু এমন করেই নিজের অজানিতেই যেখান থেকে কিছুমাত্রই পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল না এবং হয়তো ঔচিত্যও ছিল না; সেখান থেকেই প্রথম বৈশাখের উদাসী, গন্ধ-জরজর কোনো বিকেলে কারো হৃদয়-মূল হঠাৎ-ঝড়ে উৎক্ষিপ্ত, উৎসারিত, মত্ততাবাহিত কোনো সুগন্ধি ফুলের মতো, অথবা শুক্লপক্ষের দুধলি রাতের লক্ষ্মীপেঁচারই মতো স্নিগ্ধ নরম ধবল শরীর নিয়ে উড়ে এসে যখন বসে মনের জীর্ণ ঘরের ছাদে তখন কেমন লাগে?

ধীরে ধীরে সন্ধে নামে। চারিদিক উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ গাছে গাছে পাতায় পাতায় চল্‌কে চল্‌কে চলে। সমস্ত বহিরঙ্গ প্রকৃতি এবং অন্তরঙ্গ মনকে রূপোঝুরি করে তোলে।

এইসব ক্ষণেই বোধহয় সাধারণের ঈশ্বর, আমার মৃতসখা আরুণির সেই "সুপার পাওয়ার" অথবা পরম-ব্রহ্মকে জানতে হয়।

তুমি মহৎ। তাই বলে আমি তো নীচ হতে পারি না যোজনগন্ধা! তোমার নিবেদিত নৈবেদ্য যথাস্থানে অবশ্যই পৌঁছেছে। কিন্তু এই নৈবেদ্য গ্রহণ করার যোগ্যতা এই অধমের নেই যে, তা আমার মতো আর কেউই জানে না।

তাই ক্ষমা ছাড়া, তোমার কাছে চাইবার কিছুই নেই আমার।

তোমাকে অদেয়ও আমার কিছুমাত্রই নেই। এবং নেই বলেই অন্য দশজনের মতো

সাধারণ করে তুলতে পারি না তোমাকে। তুমি যে আমার অনেক আদর-যতনের ধন। দৈনন্দিনতার সান্নিধ্যে তোমাকে নোংরা করার কোনো হীন ইচ্ছা আমার নেই। তুমি মহৎ, তা জানি ; আমি তোমার ক্ষমা পাব। তুমি তুমিই থাকো, আমি, আমি। এবং আমাদের চতুর্দিক ঘিরে বলয়ের পর বলয় হয়ে চিরদিন অটুট থাকুক যা দু'জনকে দু'জনের দেয় আছে তার সব কিছুই।

এইতো পরম পাওয়া। তোমার মত অসাধারণ যে নারী তার পাওয়াতো অসাধারণই হবে !

যাঁরা লেখা পড়েন, তাঁদের মধ্যে অসমবয়সী অনেকেই ভুল করে লেখককেও ভালোবেসে ফেলেন। এর চেয়ে বড় সম্মান একজন লেখকের জীবনে আর কীই বা থাকতে পারে বলো ? কিন্তু...

যোজনগন্ধা, আমার ভালোবাসার ধন, কিছু কিছু প্রাপ্তি থাকে এ সংসারে ; যা ফিরিয়ে দিলেই তার মর্যাদা অটুট, অম্লান থাকে। ভালোবাসার যোগ্য হতে হলে, কখনও কখনও পায়ের বা গলার মালাকে মাথায়ই তুলে রাখতে হয়। ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতা কি সবারই থাকে ? "ভালোবাসা" যে কাকে বলে, সে সম্বন্ধে ধারণাও যে খুব স্বল্প মানুষেরই আছে ! তোমার আছে। হয়তো আমারও আছে। তাইতো এত কষ্ট পাই।

দেবতা না হয়ে প্রায়ই মানুষ হতে ইচ্ছা করে ! কিন্তু মিথ্যে-দেবতা হওয়াতেও যে কী সুখ তা যিনি হয়েছেন তিনিই জানেন !

যখন বয়স কম ছিল, নিয়মিত খেলাধুলো করতাম, বনে-বনে ঘুরতাম, মনে-মনেও কম ঘুরিনি ; তখন মন এবং হয়তো শরীরও তৈরি থাকত অনেক কিছুরই জন্যে ! মন-শরীরের "অঘটন-ঘটন-পটীয়সী" ক্ষমতাও অনেকই বেশি ছিল তখন।

কিন্তু আজ ? বেলা পড়ে গেছে। তিতির-কান্নার মাঠের মধ্যে দিয়ে মনে-মনে দু' বেলা হেঁটে যাই। এই ধূসর সূর্যাস্তবেলায় তোমার মতো উজ্জ্বল চিকন হলুদ পাখিকে কী দিয়ে বরণ করবো বলো ? যদি করি, তোমাকে ঠকানোই হবে যে সবদিক দিয়েই। পরে, তুমিই আমাকে দোষারোপ করবে ; বলবে, তোমার সাহিত্য-প্রীতির, সঙ্গীত-প্রীতির, অরণ্য-প্রীতির "অ্যাডভানটেজ" নিয়েছি আমি। এই প্রৌঢ় লেখক। তোমার ছেলেবেলার মাস্টারমাশাই।

তোমাকে ভালোবেসেছি বলেই যে তা করতে পারি না যোজনগন্ধা ! একটা কথা প্রাঞ্জল করে তোমাকে বলা আমার দরকার যে, তোমাকে আমার খুবই ভালো লাগে। তোমাকে আমি ভালোবাসি। ভালোবাসার যতরকম অর্থ হয় ; সর্বার্থেই।

তোমাকে ভালোবেসেছিলাম যেদিন প্রথম তোমাকে পড়াতে যাই সেইদিন থেকেই। ভালোলাগা ভালোবাসা ব্যাপারটা অঙ্ক বা অ্যাকাউন্ট্যাসির এক্তিয়ারে পড়ে না। একটি ডেবিট হলে একটি ক্রেডিট যে অবশ্যই হবে, মানে হতেই হবে ; এমন স্থবির নিশ্চল সিদ্ধান্তে ভালোবাসার তো বটেই ; ভালোলাগারও প্রত্যয় নেই।

তখন আমার চালচুলো ছিলো না। ভবিষ্যৎ ব্যাপারটাতে আর পরম অনিশ্চয়তার মধ্যে তিলেকমাত্রও ফাঁক ছিলো না। আকাশকুসুম দেখিনি যে তাও নয়। তবে স্বপ্নকে স্বপ্ন করেই রেখেছিলাম। রাখতে চাইও বাকি জীবন। তাজমহলকে দূরের থেকেই দেখা ভালো। ত্বকের ছোঁয়ায় স্বপ্ন মরে যায়।

আমি ঈশ্বর নই যোজনগন্ধা। লক্ষ্মী মেয়ে, আমাকে ঈশ্বরের পরীক্ষাতে বসিও না। বিচ্ছিরিভাবে ফেল করে যাবো। আমি অতি সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ। তোমাদেরই

মতো অগণ্য মানুষের দাবিতে এবং অপাত্রে-নিক্ষিপ্ত সম্মানে অজানিতে ঈশ্বর ব'নে গেছি। ভগবান যিশুরই মতো তোমাদের ভালোবাসা আর সম্মানের ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে ঝুলে গেছি আমি। এখন আর সমতলে নেমে সাধারণ মানুষ হওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।

মিথ্যা ঈশ্বর হওয়ার মধ্যেও এক ধরনের উত্তেজনা আছে। আগেই বলেছি।

তবু অন্যকে ঠকানোর চেয়ে নিজেকে ঠকানো অনেক সহজ কাজ আমার পক্ষে। বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেলে বিয়ে করা প্রচণ্ডই সাহসের কাজও। অর্যমা রায়ের সাহস তেমন নেই। এই বয়সে পৌঁছে আর কোনোরকম বন্ধনেই জড়াতে রাজী নই নিজেকে।

তুমি বিয়ের বয়স থাকতে থাকতে বিয়ে করে ফেলো। সুখী হও।

"সব জিনিসেরই একটি সময়সীমা থাকে। তার মধ্যে সেরে না ফেলতে পারলে কোনোদিনই আর তা করা হয়ে ওঠে না।" মনে আছে?

তাছাড়া কেন জানিনা, কিছুদিন হল আমার আবার কেবলই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। আবারও বলছি, কোনো রোম্যান্টিক দুঃখজনিত কারণে নয়, সেই বিশ্ব-বিষাদ। জার্মান ভাষায় যাকে বলে "Weltsmerz"। এ বেদনা-বিলাসও নয়।

কেন যে এমন হয়, তা বলতে পারব না। কিন্তু হয়।

আমাকে বিয়ে করার কথা দুঃস্বপ্নেও ভেবো না। আমি কোনদিক দিয়েই তোমার যোগ্য নই।

তাছাড়া, তুমি কি এখনও বোঝোনি যে আমার মাথার ঠিক নেই। পাগলের সঙ্গে, অস্থিরমতি এমন একজন নির্গুণ মানুষের সঙ্গে তোমার জীবন জড়াতে যেও না। খুবই ভুল করবে তাহলে। পরে নিজেই অভিশাপ দেবে নিজেকে।

—ইতি
অর্যমা

যোজনগন্ধা জোয়ারদার
গ্রেটার কৈলাশ ওয়ান, নিউ দিল্লি

দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা,

ঠিক কবে আসবে জানিও। কোডারমাতেও নামতে পারতে, অথবা ধানবাদেও। সারিয়াতে তো নামতে পারতেই! যেখানে নামবে সেখানে গিয়েই নিয়ে আসবো। আর আগেই তো বলেছি, তুমি যখনই আসবে, তখনই সুসময়।

রহিমের গাড়িতে এই ঠাণ্ডাতে আসতে তুমি পারবে না। জমে যাবে। জানালার কাঁচ নেই, হুড নেই। তোমার জন্যে অন্য গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে যাবো। গপু সেনের গাড়িও নিতে পারি। কারণ উনি সেদিন নিজেই বলেছিলেন যে, "মেয়েচেলে" মাত্রই যদিও আমার দু' চোখের বিষ তবু আপনার বাড়িতে কিম্ভূত নামের যে তিনটি মেয়ে এসেছিলো তার মধ্যে দোদোনগন্ধা না-কী যেন, সেই মেয়েটি ভারি ভালো। আমার "সার্টিফিকেট"

পাওয়া "চাট্টিখানি" কতা নয়। তা, সে যদি আসে তো বলবেন, আমার বুইক্ বের করে আমরা দু'জনে মিলে গিয়ে নিয়ে আসবো তাকে। তাকে রহিম বা করিম সাহেবের গাড়িতে আবারও চাপিয়ে আপনি আমাদের হাজারীবাগের বে-ইজ্জতি করবেন না।

সাধারণত ফেমিনিন জেন্ডারের সিঙ্গিল নাম্বার বোঝাতে উনি "সাঁটুলি" কথাটা ব্যবহার করে থাকেন। তোমার উল্লেখ করতে যে, "মেয়েটি" বলেছেন এ তোমার অশেষ সৌভাগ্য বলেই জানবে।

অতএব জানিও কবে আসছো।

তবে আনতে গেলে, দু'জনেই যাবো। একা ওঁকে পাঠাবার ভরসা আমার নেই। জীবনে বহু নারীবিদ্বেষী ও সাধক-প্রকৃতির মানুষ দেখেছি। ("পাড়ার বখা ছেলেকে বিশ্বাস করিলেও করিতে পারো কিন্তু সাধু-সন্তদিগকে নারীর বেলাতে কদাপি বিশ্বাস করিবে না। কারণ তাহার সংযমের বাঁধে যে কখন ফাটল দেখা দিবে তাহা স্বয়ং বিধাতাও জানেন না। এবং সংযমের বাঁধে ফাটল দেখা দিলে মুক্তকচ্ছ হইতে কতক্ষণ ?")

ছেলেবেলায়, জামাইবাবুর আলমারি থেকে চুরি-করা বাংলা যৌনবিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছিলাম।

না। তোমাকে বেতলা বা নেতারহাট দেখাবো না। ক্রমশই ক্লিশে হয়ে যাচ্ছে ঐ সব জায়গা সূর্যাস্তর ফোটোগ্রাফেরই মতো। তোমাকে বরং নিয়ে যাবো হাজারীবাগ ন্যাশনাল পার্কেই। রাজডেরোয়াতে আবারও। নিয়ে যাবো, এমন এমন সব জায়গাতে, যে সব জায়গাতে কেউই যায় না। যে সব জায়গা কিশোরী বয়েসে তুমি শুধু স্বপ্নেই দেখেছো।

দেখার চোখ যার আছে, সে পথপাশের পুটুসের ঝোপের দিকে চেয়ে, কোনো কালো পাথরের চাঙড়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসে সারা দুপুর ছাতারে আর তিতির আর টিয়ার ডাক শুনেই কাটিয়ে দিতে পারে। কত কী ভাবা যায়! দৌড়ে-বেড়ানোর মধ্যে কোনো প্রাপ্তি সচরাচর থাকে না। এই দৌড়োদৌড়ি রোগ অ্যামেরিকান ট্যুওরিস্টদেরই দান এই পৃথিবীর তাবৎ মাথা-মোটা মানুষদের জন্যে। তাতে প্রতিবেশীর ঈর্ষা বাড়ানো যায় অবশ্যই আর বাড়ানো যায় নিজের নিজের মনের বিপুল বোকা-বোকা, ছাগলের গায়ের গন্ধর মতো দুর্গন্ধি ঘেয়ো "ঘামশু"!

পরে কখনও তোমাকে নিয়ে যাবো পালামৌ-এ—তাও যেখানে সকলেই যায় সেখানে আদৌ নয়। বেতলাতে নয়।

মহুয়ামিলন, কুমাণ্ডি, রিচুঘুটা, চাহাল-চুঙরু, রাংকা, নগর-উন্টারি, লাতেহার, টোড়ি, মারুমার, মহুয়াঁডার এই সব জায়গাতে। বুড়ি ছোঁওয়ার জন্যেও নয়। যে-কোনো জায়গাতেই যাও আমার সঙ্গে, সেখানেই তোমার খিতু হয়ে বসতে হবে। কোনো জায়গারই মাহাত্ম্য তেমন নেই ; যতখানি আছে, তোমার দুটি চোখের আর অনুভূতির। সেই পরশপাথর দিয়েই সাধারণকে অসাধারণ করে তুলতে হবে।

কবে আসবে জানাও। কী ভাবে আসছো, তাও। এই হলো, যাকে বলে, পুরোপুরি "কেজো" চিঠি। "পেজো" চিঠিও বলতে পারো।

—অর্যমা

boiRboi.net

শ্রী অর্যমা রায়
দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ
বিহার

নিউ দিল্লি

অর্যমাদা,

আজ শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেছিলো। আর ঘুম এলো না। এরকম প্রায়ই হচ্ছে আজকাল। কেন তা জানি না।

নানা কথা ভিড় করে আসে মনের মধ্যে। গভীর অন্ধকার থাকতে উঠে পড়ে কিছুক্ষণ বিছানার উপরে জবুথবু হয়ে বসে থাকি।

অন্ধকারে আমাদের হাত পা মস্তিষ্ক বোধহয় পুরোপুরি কাজ করে না, দিনচর জীব বলেই। নিজের ঘরে, নিজের খাটে, কম্বলের নিচের নিজের শরীরের ওম্-এর মধ্যে বসেও নিজেকে অচেনা বলে মনে হয়। তারপর এক সময়ে বাথরুমে যাই। মুখ চোখ ধুই। তারপর চিঠি লেখার টেবলে এসে বসি। সেই টেবলের উপরে আপনার একটি ফোটো আছে। "দ্যা জ্যাকারাণ্ডা"তে তোলা। রাতে শোবার সময়ে ফোটোটিকে বন্ধ দেরাজ থেকে বের করে সযতনে টেবলের উপরে রাখি। আবার সকালে বন্ধ ঘরের দরজা খোলার আগেই তাকে দেরাজে বন্ধ করি। আপনি সারা রাত শুয়ে-থাকা আমার দিকে চেয়ে থাকেন। আপনার চোখের পরশ পাই আমার সারা শরীরে। আপনি আমার কত গোপন-আপন তা কি আপনি কখনও বুঝতে পেরেছেন আজ অবধি ?

হঠাৎই একদিন সুখী, মানে, আমার কাজের মেয়েটি, দেখে ফেলেছিলো ফোটোটি। বলেছিল, ও কার ছবি, দিদি ?

একজন মানুষের।

আমি বলেছিলাম।

মানুষটি কে ?

একজন মানুষ।

তোমার কে হন তিনি ?

আমি জানি না। সত্যি বলছি, এখনও জানি না। কেউ না হলে তাঁর ছবি রাখা যায় না ?

তা যাবে না কেন ? গান্ধী মহারাজের রাখো, নেতাজী সুভাষ বোসের ছবি রাখো। ছবি রাখে মানুষে, দু' ধরনের মানুষের। হয়, যাঁরা সকলেরই চেনা তাঁদের ; নয় যে তার খুবই কাছের এবং অন্যের অচেনা, এমন মানুষের। তাই, আমি জানি যে, তুমি আমাকে সত্যি বলছো না দিদি।

ওকে বলেছিলাম, সত্যিই বলছি রে সুখী। আমি ওঁকে চিনি কিন্তু সত্যিই জানি না যে, উনি কে? মানে, আমার কে? ওঁর মনের হদিস আমার জানা নেই।

সুখী কী বুঝেছিলো, জানি না। তবে সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। নিজের মুখকে এক দুর্জ্ঞেয় হাসির প্রসাধনে প্রসাধিত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিলো।

আমার প্রতিটি সকালবেলা, প্রতিবার জেগে ওঠা কি এমন করে অন্ধকারেই শেষ হবে? অর্যমাদা?

আপনি ভারি অদ্ভুত মানুষ। অন্যকে কষ্ট দিয়ে আপনি ভীষণই আনন্দ পান। আপনার মনকে বোঝা আমার কর্ম নয়। মাঝে মাঝেই হালও ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে।

একটু পরেই ভোর হয়ে যাবে। আমাকে তৈরি হতে হবে ভীষণ ঠাণ্ডায় দফতরে যাওয়ার জন্যে। তারপর গাড়ি, অটো, স্কুটার আর মোটর সাইকেলের কানে-তালা লাগানো শব্দের মধ্যে দিল্লির শান্ত সকালের সেই ক্ষণকালের স্নিগ্ধ শান্তি উবে যাবে, উবে যাবে মন থেকে আপনার ভাবনাও। ফাইল, নোট, ব্যাঙ্কার্স মেমো, বাজেট, ভ্যারিয়েশান, ইত্যাদি, ইত্যাদি ; ইত্যাদিতে।

যেতে পারি, ধরে নিন যাবোই। জানুয়ারীর লাস্ট বাট ওয়ান সপ্তাহে। শনিবার নিয়ে আট দিন মতো ছুটি হবে। সাতাশে জানুয়ারীর একটি ফেরার টিকিট কেটে রাখবেন যাতে আঠাশে এখানে পৌঁছতো পারি। যে গাড়িতে গতবার দিল্লি ফিরে ছিলাম, সেই গাড়িতেই ফিরবো। ও গাড়িটিই সবচেয়ে কন্‌ভিনিয়েন্ট। কোডারমা হয়েই পৌঁছবো।

যেতে পারি, কিন্তু সত্যিই এখন ভাবছি ; কেন যাব?

ইতি—

যোজনগন্ধা

পুনশ্চ :

ঐ সময়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

সর্বভারতীয় আপনার অন্য কোনো বান্ধবী ঐ সময়ে থাকবেন না তো সেখানে? সুবিধে হবে কি না জানাবেন অকপটে। পত্রপাঠ।

কিছুই মনে করবো না।

ভাবতে যে কী ভাল লাগছে যে, আমি সত্যি সত্যিই যাচ্ছি আবার আপনার কাছে! এবারে কিন্তু হেস্তনেস্ত করে আসব।

ভালো থাকবেন অর্যমাদা।

ইতি—

যোজনগন্ধা

boiRboi.net

হাজারীবাগ ন্যাশনাল পার্ক
হারহাদ

যোজনগন্ধা,
কল্যাণীয়াসু,
চিঠি পেয়েছি।
এসো, চলে এসো। একটা হেস্তনেস্ত না কী যেন বলে, তা হয়েই যাক।
সঠিক তারিখ এবং কী ভাবে আসছো তা জানিও।
রাজডেরোয়ার এলাকার মধ্যেই হারহাদ-এ এসেছি। একা আছি এখন।
গপুবাবুও এসেছিলেন। দু' দিন থেকেই চলে গেছেন।

আমিও একটু একাই থাকতে চাইছি। আজকাল এমনই হচ্ছে। প্রিয় পুরুষ অথবা নারীকেও আর ভালো লাগে না। দোষটা তাঁদের নয়; পুরোপুরিই আমার। আমার মধ্যে এতগুলি পরস্পরবিরোধী মানুষের বাস যে, তাঁদের সকলকে এত বছরেও সম্পূর্ণভাবে চেনা হলো না আমার নিজেরই। অন্যে যে চিনবেন সে আশা করি কী করি!

তোমাকে প্রথম চিঠিতেই লিখেছিলাম যে, গড়পড়তা মেয়েদের তুলনাতে তোমার ঔৎসুক্য বড়ই কম! এই চিঠিতেও তাই লিখছি।

আমি মানুষটা তো স্বয়ম্ভু নই! আমারও তো একটি পারিবারিক, সামাজিক পটভূমি আছে, আছে শিকড়-বাকড়, শ্যাওলা, অ্যালগী; ফাঙ্গাই। থাকার কথা ছিলো অন্তত। সেই সব কিছুকেই উৎপাটন করে কলকাতা ছেড়ে কেন যে এতবছর হাজারীবাগে এসে রয়েছি সে কথা তুমি তেমন করে জানতে চাওনি একবারটিও। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে এমন সম্মান দিতে এবং ব্যক্তিজীবনের প্রচ্ছন্নতাকেও; তোমার মতো বেশি মানুষ জানেন না আমাদের দেশে। সে কারণে, তোমাকে আমি সম্মান করি।

আজকে বড় শীত। পৃথিবীর আবহাওয়া সব তো ওলোট-পালোট হয়ে গেছে! হাজারীবাগে শীতকালে শীত চিরদিনই ছিলো কিন্তু এমন ছিলো না কখনওই। মনে হচ্ছে, যেন টোরোন্টো বা ভ্যাঙ্কুভারেই বসে আছি।

গপুবাবুকে তাঁর জীপে তুলে দিয়ে হাঁটতে গেছিলাম একটু। এই শীতের বন্য-প্রকৃতি বড় বিষণ্ণ করে আমাকে। পথের পাটকিলে-রঙা ধুলোর আস্তরণের উপরে নানা পাখির পায়ের চিহ্ন পড়েছে। একটি চিতাবাঘ আমার আগে আগে হেঁটে গেছে। বেশিক্ষণ আগে নয়। তার পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিছুটা গিয়েই সে পথের বাঁদিকের ঝাঁটি জঙ্গলে ঢুকে গেছে।

বেলা শেষের গান গাইছে তিতিরেরা। এখন এখানে অন্য কোনো শব্দ নেই। ঘন বন যেখানে শুরু হয়েছে সেইখানে একদল নীলগাই আপনমনে চরে-বরে খাচ্ছে। এই জঙ্গলে

সবচেয়ে বেশি আছে শম্বর। কিন্তু নীলগাইয়েরা তাদের অপার্থিব গায়ের রঙ নিয়ে এই জঙ্গলে আর আলোয়ারের সারিসকাতে যেমন মানিয়ে যায়, তেমন আর কোথাও নয়।

তুমি তো বলেছিলে, যাবে সারিসকাতে ! গেছিলে কি ?

দেখে নাও, সব দেখে নাও।

একটু পরেই দেখা হয়ে গেল, বাংলোর প্রায় কাছাকাছিই ; একটি একলা নীলগাই-এর সঙ্গে। সে তার বুক-সমান উঁচু একটি কেলাউন্দা ঝোপের মাঝে দাঁড়িয়ে গ্রীবা তুলে অস্তগামী সূর্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলো। তার সেই স্বেচ্ছারোপিত একাকিত্বর সঙ্গে আমার একাকিত্বর ভীষণই মিল ছিলো। তার দাঁড়িয়ে থাকার সমর্পণের ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিলো যে, সে যেন আমারই মতো ভুলেই গেছে যে, সে কোথা থেকে এসেছিলো এই জঙ্গলে ? ছোটাপালু ঘাট না চম্পারণ না করণপুরাণ টাঁড় থেকে ? কোথায় যাবে ? কেন এসেছে, কেন যাবে ?

অ্যালগারনন ব্ল্যাকউড-এর বইয়ে-পড়া উত্তর আমেরিকার অলৌকিক moose-এর মতো সে স্থবির, অনড় নিস্তব্ধ হয়ে চিত্রার্পিতর মতো দাঁড়িয়েছিলো চমৎকার রৌদ্রলোকিত কিন্তু অসহনীয় শীতের এই স্তব্ধ বনের মধ্যে।

আমার জীবনেও ঠিক এমনই ! চারধারে ঝকঝকে রোদ্দুর। অথচ রোদে একটুও উষ্ণতা নেই। জুতোর ভেতরে পা দুটি ঠাণ্ডা ; টুপির ভেতরে মাথা। জার্কিনের পকেটে ঢোকানো হাতের পাতা দুটি ঠাণ্ডাতে কুঁকড়ে গেছে। যে উষ্ণ হৃদয়কে বাইরে থেকে দেখা যায় না, উৎপাটিত হলে যে রক্তকমলের মতো পরম ভীতিজনক লালিমা বিকীরণ করে ; সেই হৃদয়ও জীবন্ত ব্যাঙের পিঠের মতোই ঠাণ্ডা।

কেউই কাউকে বোঝে না। কেউই কারো সঙ্গে কথা বলে না, কারো সঙ্গেই কারো প্রকৃত কম্যুনিকেশান নেই।

কেউ কেউ নিজের গলার স্বরকে ভালোবাসে বলে চিৎকৃত স্বগতোক্তি করে। আর চারপাশে যত পুরুষ, যত নারী, তারা শুধুই অর্থহীন শব্দ করে ; ঠোঁট নাড়ায়। ওদের কারোই আমাকে কিছু বলার নেই। আমারও কিছুই নেই বলার ওদের কাউকেই। আমাদের প্রত্যেকের ওয়েভ-লেংথই আলাদা আলাদা।

ওদেরই মধ্যে কোনো পুরুষ ভাব দেখায় যে, আমাকে যেন ভীষণই পছন্দ করে। তাই বুকে নেয়। কোনো নারী অবশেষে জড়িয়ে ধরে, চুমু খায়, অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয় অথচ শরীরের বে-জায়গাতে লাগা পাউডারেরই মতো ফুঁ দিলেই সেই সব নৈকট্য, বন্ধুতা, প্রেম, শরীরী সম্পর্ক উড়ে যায় ; খসে পড়ে।

বড়ই বিচিত্র লাগে ভাবলে।

আমার জীবনের বেলা পড়ে আসছে যোজনগন্ধা। দিন আর রাতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে, সেই "নো-ম্যানস" ল্যাণ্ডে ; অর্যমাতে এসে দাঁড়িয়েছি। এখনই যেতে হবে কি আমাকে ? যেতে ইচ্ছেও করে খুবই।

নরয়েজিয়ান নোবেল-লরিয়েট ন্যুট হামসুন-এর "দ্যা গ্রোথ অব দ্যা সয়েল" পড়েছো তুমি ? আমিও পরিণত বয়সে এসেই পড়েছি। অথচ তার কত আগে "হাঙ্গার" পড়ে ফেলেছিলাম। ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার "স্নো-কান্ট্রি"র মতো, নোবেল প্রাইজ পাওয়া বইই যে লেখকের সর্বোৎকৃষ্ট লেখা হবেই এমন নয়।

"গ্রোথ অব দ্যা সয়েল"-এ গিস্‌স্‌লার বলছেন :

"আমি কুয়াশার মতো হয়ে গেছি ; কুয়াশার মতো। একবার এখানে, একবার

ওখানে। ভেসে বেড়াচ্ছি আমি। মাঝে মাঝে শুকনো মাটির উপরে বৃষ্টির মতোও এসে পড়ছি সশব্দে। আমি এরকমই। কিন্তু আমার চারধারে যারা আছে, তারা ? তারা বিদ্যুৎ-এর ঝলকানি। আমার ছেলে যেমন।

আহা! বেশ হত গো যোজনগন্ধা, আমারও ছেলে থাকলে একটি! তোমার আর আমার ছেলে।

কি ?

কল্পনাতে তো কতই কিছুই ইচ্ছে করে।

কিন্তু বিদ্যুৎই বা কি ? শূন্যতার হঠাৎ ঝলকানি ছাড়া বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎই!

আমি কুয়াশা, আমি শুধু ভেসেই বেড়াই। বিরাট কোনো ক্রিয়াকাণ্ড করি এমন ক্ষমতা আমার আর নেই। না, আর নেই। এবং নেই যে, তা স্বীকার করতে কোনো লজ্জাও নেই।

এখন ফেরার সময়।

অর্থর, মানের, প্রতিপত্তির, যশের শিখরের প্রত্যেক আরোহী মাত্রেরই বুকের মধ্যে একজন অবরোহীও অবশ্যই থাকেন অদৃশ্য হয়ে। বিশ্ব-জয়ের উন্মাদনা আর দামামার মধ্যে, শ্লাঘায়-স্ফীত আরোহীর আড়ালে লুকিয়ে চলে সেই অবরোহী। তাকে তখন দেখা যায় না। সে যে আছে, তা আদৌ জানা যায় না। কিন্তু শিখরমাত্রেই শুধু ক্ষণকালের জন্যে দাঁড়ানো আর পতাকা পুঁতে দেওয়ার জন্যেই আরোহীর। কোনো শিখরেই কেউই ঘর বাঁধে না, বা মৌরসী-পাট্টা গাড়ে না। জয় করেই নেমে আসার মধ্যেই শিখর এবং আরোহী, দু'জনেরই সম্মান নিহিত থাকে। সেটাই সম্মানের; সেটাই কাম্য। ব্যতিক্রমটাই লজ্জার, একঘেয়েমির। কুরুচিরও বটে।

এই সাদামাঠা কথাটা আমি বুঝেছি যোজনগন্ধা। তাই এত তাড়া আমার নেমে যাওয়ার। শিখরে পৌঁছবার আগেই।

সমসময়ে শিখরে বেস-ক্যাম্প বসানোতে আগ্রহী, ধাক্কাধাক্কি করে শিখরের দিকে ধাবমান আরোহীদের বড়ই ভিড় দেখছি জীবনের সব ক্ষেত্রেই। এই হীন প্রচেষ্টাতে আরোহীর অসম্মান তো বটেই, পর্বতেরও অসম্মান নিঃসন্দেহে। যাঁরা পৌঁছোন, (আমারতো পৌঁছনোই হয়নি) তাঁদের শিখরে দাঁড়িয়ে সাফল্যের একঘেয়ে হু হু হাওয়াকে বড়ই অসহ্য লাগার কথা। শিখরমাত্রেরই হাওয়াতে হিমকণা থাকেই!

খুবই হালকা লাগছে এখন কিন্তু নিজেকে। শিখরের দিকে যাওয়াও বড়ই টেনসান-এর। সাফল্যের, যশের ভার; বড় ভার। অর্থর ভারও কম নয়। তীব্র উত্তেজনারও।

অর্যমা রায় যতখানি উত্তেজনা সইতে পারে, বইতে পারে, তার চেয়ে বেশি সইতে বা বইতে আদৌ রাজি নয়।

ভেবে দেখো এখনও, সময় আছে। উপত্যকার গভীর বনে দাঁড়ানো অবরোহীর তো কোনো জৌলুস থাকবে না। চোখ-ধাঁধানো দীপ্তিও নয়; তার কাছে কি আসবেই তুমি ?

গপুবাবু আমাকে দুটি বাঘনখ দিয়েছিলেন। মাদ্রাসের ভ্যান ইনজেন অ্যান্ড ভ্যান ইনজেন থেকে ট্যান-করা চামড়া থেকে কেটে দিয়েছিলেন পায়ের চামড়া সুদ্ধু। নিজের মারা বাঘ।

বলেছিলেন, গুড লাক। সঙ্গে রাখবেন।

সে সব বহুদিনের কথা।

এতবছর ট্রাউজারের বা জার্কিনের পকেটে সবসময়ে নিয়ে বেরিয়েছি ; পাছে, গপুবাবু দুঃখ পান। বাঘের চামড়ার লোম সব উঠে গেছে, শুধু নখ দুটি রয়ে গেছে। সেগুলিও আমার হাতের তেলো ও আঙুলের চাপে চাপে মসৃণ হয়ে গেছে। অনেকদিনই রেখেছিলাম। গুড-লাক ! আর কী হবে !

সকলের অলক্ষে কাল রাতের অন্ধকারে বাংলোর বারান্দার সামনে থেকে নিচের খরস্রোতা কলরোলা হারহাদ্ নদীতে ফেলে দিলাম বাঘের নখ দুটিকে। সৌভাগ্যর আর আমার প্রয়োজন নেই। "অভাগা" হয়ে বাঁচতে কেমন লাগে, দশজনের একজন হয়ে, অতি সাধারণ হয়ে, তা দেখাই যাক না। শেষ বেলাতে যদি যোজনগন্ধা সাথী হয় তবে ভাগ্যকে না হয় আঙুল ছাড়িয়ে সরেই যেতে বলবো। এতরকম সৌভাগ্য একসঙ্গে বইবো এমন চওড়া কপাল করে তো আমি আসিনি !

বাংলোতে ঢুকতেই রহিম মিঞা তার গাড়ির চার চাকাতে ধুলো উড়িয়ে এলো পার্ক-এর ভেতর থেকে। খবর দিলো, পাঁচ নাম্বার টাওয়ারের নিচে আজ সকালেই কে বা কারা একটি মেয়ের লাশ ফেলে গেছে। উপর থেকে ফেলে দেওয়ার আগে তার উপর বলাৎকার করা হয়েছিলো। কোথা থেকে এসেছিলো তারা তা জানা যায়নি।

কটি অপরাধেরই কিনারা হয় এ দেশে ! এইরকমই চলছে ; চলবে।

শীতের সন্ধের মুখে এই খবর শুনে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেলো। কত্তরকমের জানোয়ার আছে এই পার্কে আর কতরকমের আছে আমাদের মতো মানুষদের মধ্যে !

রহিম মিঞাও বাবুর্চিখানাতে ঢুকলো আর অমনি অন্ধকারও নেমে এলো। সন্ধে তারাটা উঠলো পশ্চিমাকাশে সবুজাভায় দিগন্তর একটি টুকরো উজ্জ্বল করে। একটু পরেই চাঁদও উঠবে বিশ্বচরাচর উদ্ভাসিত করে। এখন ঘন ঘন কোট্‌রা ডাকছে নিচের হারহাদ নদীর পাশের ঘন জঙ্গল থেকে। কোনো কারণে ভয় পেয়ে থাকবে বেচারী। আমাকে দেখেও ভয় পেয়ে থাকতে পারে। আমিও ভয়াবহ তো বটেই !

একটু পরেই চাঁদের আলো ঝকঝক করবে অনাবিল নির্মল নীল আকাশে। রুপোলি হয়ে উঠবে রাজডেয়ারোয়ার হারহাদ নদীর ফেনিল নৃত্যরতা শরীর। পাহাড়তলিতে কুয়াশা আর চাঁদের আলো মিশে রাত যতই বাড়তে থাকবে ততই এক আশ্চর্য নীলাভ মায়াজাল ছড়াতে থাকবে, যা একমাত্র আমাদের এই সুন্দর ভারতবর্ষর জঙ্গলেই দেখা যায় শীতের রাতে।

আকাশময় তারা ফুটবে। বারান্দার ইজিচেয়ারে একা বসে আমি সেই চন্দ্রালোকিত শীতার্ত রাতের শিশির ভেজা প্রায়-নিঃশব্দ আর্তি শুনবো। শুনবো, না বলে বলা উচিত, অনুভব করবো। আকাশভরা তারাদের দিকে চেয়ে একা বসে থাকতে থাকতে হেমিংওয়ের কথা মনে পড়ে যাবে। "দ্যা ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্যা সী"।

"আই অ্যাম গ্লাড উই ডুনট অ্যাভ টু কিল দ্যা স্টারস। ইমাজিন ইফ ইচ ডে আ ম্যান মাস্ট ট্রাই টু কিল দ্যা মুন। দ্যা মুন রানস এ্যাওয়ে। বাট ইমাজিন ইফ আ ম্যান ইচ ডে শুড হ্যাভ টু ট্রাই টু কিল দ্যা সান ? উই আর বর্ন লাকি।"

বাঘনখ সঙ্গে থাকুক আর না থাকুক, শিখরে অধিষ্ঠিত থাকি আর নাই থাকি ; তবুও আমরা ভাগ্যবান।

তাই নই কি ? যোজনগন্ধা ?

—অর্ঘমা

হারহাদ
রাজডেরোয়া,
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা,
কল্যাণীয়াসু,

তোমাকে এর আগের চিঠিতে লিখেছিলাম অনেক কিছু হারহাদ থেকেই। এখনও হারহাদ-এই আছি।

ভাবছি, পুরোপুরি দিশি আমি, ধানিয়া আর পিটুলের কালো কুকুরের মতো একটি দিশি কুকুর পুষব।

যে-বন্ধু, টাকা চেয়ে, না পেলে শত্রু হয়ে যাবে না, যে-বন্ধু স্তাবকতা না করলে আড়াল থেকে মেঘনাদ-বধ বাণে জর্জরিত করবে না, যে-প্রেমিকা রোজ রোজ তার জন্যে তারা বা চাঁদকে আদিম, বীর আদিবাসীদের মতো নিজের বর্শাতে গেঁথে শিকার করে না নিয়ে এলে শাপ দেবে না, যে-কর্মচারী সারাজীবন খেয়ে-নিয়েও নীচ, জঘন্য ইতর মিথ্যা অনুযোগ অভিযোগ বানিয়ে নিয়ে দিনশেষে সামনে এসে দাঁড়াবে না ; তেমন মিথ্যে বন্ধু, মিত্র, সঙ্গী হবে না আমার সেই সারমেয়। সে অকৃতজ্ঞ হবে না, কৃতঘ্ন হবে না, ঈর্ষাকাতর হবে না। আমার পরিশ্রমের সে নীরব সাক্ষী হবে। ন্যায্যমূল্যে কেনা সাফল্যর অন্যায় সমালোচক হবে না।

না যোজনগন্ধা, তোমারই মতো আমিও এই সিদ্ধান্তেই এসেছি যে, মানুষের চেয়ে সারমেয়ই ভালো।

জোন্স ভেরীর মতো আমারও আজকাল বলতে ইচ্ছে করে, "আই হ্যাভ নো ব্রাদার—দে হু মীট মী নাউ, অফার আ হ্যান্ড উইথ্ দেয়ার ওওন উইল ডিফাইলড।"

এই ভাইয়েরা বৃহৎ বিশ্বের ভাই।

কিছু কিছু কাছের মানুষের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হওয়াতে শীতের সাপ যেমন নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে চলচ্ছক্তিহীন শুয়ে থাকে অন্ধকার গর্তে, আমি তেমনই আছি। আমার বিশ্বাস নেই আর কোনো সম্পর্কেই।

তবে যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। একজন লেখকের জীবনের কোনো অনুভূতিই বিফলে যায় না। ঘৃণা, বঞ্চনা, আঘাত, তঞ্চকতা, ঈর্ষা এবং শত্রুতার ব্যথা একদিন না একদিন তার কলমের মাধ্যমে ফুল অথবা কাঁটা হয়ে ফোটেই। কালশিরের দাগ থেকে, ব্যথা থেকে ; পন্‌সাটিয়া ফোটে ; পুলক-ভরা সবুজ-রঙা বেবিজ টিয়ারস্ ফার্ন-এর ঝাড় জন্মায়।

এমার্সন মনে করতেন, ফ্রেন্ডশিপ ইজ আ লাক্সারী হুইচ হি হ্যাড রিজাইনড হিমসেলফ দ্যাট হি উড নেভার পজেজ।

থোরোর বিখ্যাত একটি উক্তি আছে :

"লেট সাচ পিওর হেট স্টিল আন্ডারপ্রপ
আওয়ার লাভ, দ্যাট উই মে বী
ইচ আদারস কনসান্স,
অ্যান্ড হ্যাভ আওয়ার সীমপ্যাথি
মেইনলি ফ্রম দেন্স।"

প্রকৃত বন্ধুতার মধ্যেও একধরনের প্রতিযোগিতার টেনশান, টানাপোড়েন সুপ্ত থাকেই।

প্রকৃত বন্ধুতা বলে যে আদৌ কিছু আছে তেমন বিশ্বাসই অবশ্য ছিলো না হেনরী ডেভিড থোরোর। বলতেন, বন্ধুতা, অতি ক্বচিৎ-কদাচিৎই প্রকৃত বন্ধুতার দাবি করতে পারে।

তুমি কি আমার বন্ধু ? সত্যিই বন্ধু ?

এই জিজ্ঞাসা চিরদিনই জাগরূক ছিলো তাঁর মধ্যে।

আমার মধ্যে সে জিজ্ঞাসাও আর জেগে নেই। তাকে নিজে হাতেই গলা টিপে মেরে ফেলেছি আমি।

তুমি থোরোর "Walden" পড়ছো কিন্তু "A Week" নিশ্চয়ই পড়োনি। যে কোনো লেখককেই ভালো করে জানতে হলে তাঁর লেখার বৈচিত্র্য আর তাঁর ব্যক্তিত্বর স্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে শুধু তাঁর একটি বা দুটি বহুখ্যাত লেখাই নয়, তাঁর অন্যান্য লেখাও পড়া দরকার। এমনকি অর্যমা রায়ের মতো সামান্য লেখকের লেখার বেলাতেও এ কথা খাটে।

"A Week on the Concord and Merrimack Rivers" পড়ে ফেলো। এই বইটিতে প্রকৃতি যে থোরোর উপর কতখানি প্রভাব ফেলেছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতি ও নির্জনতার প্রভাব পৃথিবীর প্রত্যেক প্রণিধানযোগ্য কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিকের উপরেই পড়েছিলো। আজও পড়ে। মানে, যাঁরা থেকে গেছেন। আবার তোমাকে বলতে ইচ্ছে হয় : "নির্জনতা কখনওই আমাদের খালি হাতে ফিরায় না।"

থোরোর কথাতেই বলি যে, তোমার আমার বন্ধুতা সম্বন্ধে যেন এমনটি বলতে পারি : "Let our intercourse be wholly above ourselves and draw us up to it."

বারে বারেই আমি তোমাকে নির্জনতা আর ঈশ্বরবোধের কথা বলেছি। আমাকে তুমি যদি সত্যিই ভালোবেসে থাকো, আমার বহিরঙ্গের আমিকে নয়, আমার অন্তরঙ্গ আমিকে ; তবে তুমি Transcendentalists-দের লেখা পড়ো। এমার্সন, জোনস্ ভেরী, হেনরী ডেভিড থোরো, উইলিয়াম এইচ ফার্নেস, এলারী এবং ডারু এইচ চ্যানিং, মার্গারেট ফুলার, এলিজাবেথ পীবডি, সোফিয়া রিপ্লি ইত্যাদি ইত্যাদি কত নাম আর বলবো।

অর্যমা রায়েদের লেখা অপাঠ্য নাটক-নভেল তো অনেকেই পড়লে, এবারে এই সব Transcendentalist-দের Non-fictional লেখা কিছু পড়ো। দেখবে তখন যে, জোলো উপন্যাস আর পড়তেই ইচ্ছা করছে না।

প্রত্যেক লেখকের জীবনেই একটি বিশেষ সময় আসে। সঙ্গমে পৌঁছবার সময়। নদী যখন সাগরের কাছাকাছি আসে তখন নদী কিন্তু শাখা-উপশাখা ছাড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে বসে না। বসা উচিতও নয় অন্ততঃ। সাগরে লীন হবার মধ্যে তো কোনো লজ্জা বা দুঃখ নেই আদৌ ! সাগরে পৌঁছে বিরাটত্বকে উপলব্ধি করে প্রথমবার। সঙ্গম করে।

তার একক নিজস্বতাকে বিরাটের অংশে রূপান্তরিত হতে দেখে বুঝতে পারে যে, নিজেকে সে নবীকৃত করলো।

নদীর চলার চাল বা ভঙ্গির মধ্যে এক ধরনের উচ্ছ্বাস থাকে। সঙ্গমের কাছে এসে সেই উচ্ছ্বাস কমে যায়, শান্ত, সমাহিত হয় নদী। তখন সমর্পণ-তন্ময়তা আসে তার মধ্যে একধরনের।

সেই সময়ে পৌঁছে, সঙ্গমের কাছাকাছি এসে নদীরই মতো লেখকেরও নিজেকে নবীকৃত করতে ইচ্ছা যায়। উপন্যাস ছাড়াও অন্যধরনের লেখা লিখতে ইচ্ছে যায়। তার জীবনে প্রেম, বন্ধুতা, আকাঙ্ক্ষা, কাম, ঈর্ষা, ঘৃণা, লোভ ইত্যাদির স্বরূপ বদলে যায়।

চলো এসো, আরও অনেক কথা হবে।

—অর্যমাদা

নিউ দিল্লি

অর্যমাদা,

আপনার লেখা দুটি চিঠি পেলাম পর পর।

আপনি এমন এমন চিঠি আমাকে লিখবেন না। আত্মহত্যার ইচ্ছার কথা, মন খারাপের কথা, বঞ্চনার কথা। আমার মন বড় খারাপ হয়ে যায়।

আপনি তো আমার কাছে শুধুমাত্র কিশোর বয়সের মাস্টারমশাই-ই নন। আপনি যে আমার সর্বস্ব। আপনি নিজেকে গর্তের মধ্যে শীতের সাপের মতো গুটিয়ে রেখেছেন হাজারীবাগ নামক একটি ছোট শহরের নিভৃতে। কিন্তু তাই বলেই তো আপনি লুকোতে পারেন না নিজেকে।

মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই বলেছিলেন, "You can run but you cannot hide!"

দৌড়তে অবশ্যই পারেন কিন্তু লুকোতে তো পারবেন না।

একবারও মরবার কথা যদি আমাকে বলেন তাহলে খুউব খারাপ হয়ে যাবে। আপনাকে মরতে দিচ্ছেটা কে?

একদিন অবশ্য সকলকেই মরতে হবে। কিন্তু সেদিন আপনি আমার কোলে মাথা রেখে মরবেন, যদি আমি আগে না মরি। হিসেব করেছি, আপনি আমার চেয়ে মোটে আঠারো-কুড়ি বছরেরই বড়। গুণী মানুষেরা তো নিজের চেয়ে পঞ্চাশ-ষাট বছরের ছোট নারীকেও বিয়ে করেন। বিয়ে করতে হবে না আমাকে। শুধু আপনার সঙ্গে থাকতে দেবেন। দেখতে দেবেন কাছ থেকে, যখন আপনি লিখবেন, ছবি আঁকবেন, বা গান গাইবেন, তখন আপনার কাছে থাকতে দেবেন।

গুণী পুরুষে, ঋদ্ধ পুরুষে কতটুকু জানেন তাঁর মহিমার কথা! আমরাই তো যুগে যুগে তাঁদের ফুটিয়ে তুলি, তাঁদের মধ্যের আধ-ফোঁটা কুঁড়িগুলিকে পুরোপুরি পাপড়ি মেলতে

সাহায্য করি। আপনি কী জানেন, আপনার কতটুকু, কী আছে ?

আপনার কাছে আর কিছুদিনের মধ্যেই যে যাব এই কথাটা মনে করলেই গায়ে পুলক লাগে।

ভালো থাকবেন। আনন্দে থাকবেন।

ইতি—
আপনার যোজনগন্ধা

দ্যা জ্যাকারাণ্ডা
হাজারীবাগ

যোজনগন্ধা,

কল্যাণীয়াসু,

তোমার ছোট্ট চিঠি একটু আগেই পেলাম।

তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো, তাই না ? বদলে কিছুমাত্রই চাও না ? শাড়ি, গয়না, তারা, চাঁদ, কিছুই না ? আমাকে তুমি শুধু আমার জন্যেই চাও ? সত্যি ?

বিশ্বাস হয় না গো ! আমার সব বিশ্বাসই যে নষ্ট হয়ে গেছে।

তুমি যেমন সুন্দরী, তেমনই গুণবতী। তোমাকে লক্ষ জনে চায়, তা কি আমি জানি না ! তুমি আমার দূরের যোজনগন্ধাই থাকো। কাছে এসো না। চিরদিনের হয়ো না। তোমার মসৃণ, ঢলনামা চুলের হলুদ চন্দ্রমল্লিকারই মতো, তোমার আমার ভালোবাসা অমনি আলতো হয়ে, পোশাকী হয়ে, নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় দূর নক্ষত্রেরই মতো জ্বলজ্বলে হয়ে ভাস্বর হয়ে থাকুক।

আজ সকালে উঠে হাঁটতে যাইনি। লিখিনি একলাইনও। কী হবে আর !

লেখাটাও আজকাল বড় কষ্টকর হয়ে গেছে। লেখাকে আনন্দই করতে চেয়েছিলাম, কষ্ট করতে চাইনি কখনওই। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীত থেকে কষ্টই হয়ে উঠেছে। অবিরত দাবি মেটাতে, কেন লিখি ? কী লিখি ? লিখবোই বা কেন ? এসব প্রশ্ন নিজেকে জিগ্যেস করার সময়টুকু পর্যন্ত নেই।

আজ সকালে আমার পিস্তলটা ভালো করে পরিষ্কার করলাম। হলো-পয়েন্ট গুলি খুঁজলাম অনেক, বিভিন্ন ড্রয়ারে। নেই। হলো-পয়েন্ট গুলি গন্তব্যে পৌঁছলো মাত্র ফেটে গিয়ে বহু টুকরো হয়ে যায়। মৃত্যুকে তরান্বিত করে। তা নেই, আছে সফ্ট-নোজড। এই গুলিও লক্ষ্যর সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গেই টুকরো হয়ে যায়। ববি কেনেডিকে আমারই পিস্তলের মতো পয়েন্ট টুটু পিস্তল দিয়েই মেরেছিলো হোটেলে, আততায়ী।

মনে আছে ?

একজন মানুষের প্রাণ বড়ই নাজুক। একটি চড়াই পাখিও হয়তো বেঁচে যেতে পারে এই পিস্তলের গুলি খেয়ে কিন্তু মানুষের মাথাতে লাগলে তার পক্ষে বাঁচা ভারী মুশকিল।

অর্যমা রায়ও যেমন সহজে মরবে তেমনই মরবে মহম্মদ আলীও। পুরুষসিংহও বাঁচবে না। তাই মরার নিশ্চয়তা নিয়ে কোনোই সংশয় নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কখন ? কবে ? আবার তুমিও আসবে লিখেছ !

এ হতভাগার মরা কি হবে ?

পিস্তলটা পরিষ্কার করে উঠে চান করে খুব ভালো করে ব্রেকফাস্ট করলাম আজ। বহুদিন পরে। বারান্দার রোদে বসে, সবুজ আর হলুদ চেক-চেক টেবল-ক্লথ ব্রেকফাস্ট টেব্‌ল-এর উপরে বিছিয়ে। ফুলের মধ্যে, বড় বড় গাছের পাহারার মধ্যে মাঘের সকালের গায়ের গন্ধের মধ্যে বসে। আঃ।

ইজেলে আজ তোমার ছবি চড়ানো। শুরু করেছিলাম, তুমি চলে যাবার পরই। ফিকে বাসন্তি রঙে ভরে দিয়েছিলাম ক্যানভাস। পটভূমি হিসেবে। জলরঙেই এঁকে ছিলাম।

কিছুদিন হলো ছবিটিকে বড় বেশি স্পষ্ট, সত্যি, জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে। সেই নীল শাড়ি তোমার পরনে, যে-হাসিটি মুখে রোজ পরে থাকো ; সেই হাসি, তোমার মসৃণ মিহি চুলে, সেদিন নিশ্চয়ই শিকাকাই ঘষেছিলে ; হলুদ চন্দ্রমল্লিকা। প্রোফাইল তোমার।

আজ শেষ রাত থেকেই মনে হচ্ছিলো যে ছবিটি বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে গেছে। বড় বেশি তোমার মতো। শিল্পর প্রথম শর্তই হচ্ছে অস্পষ্টতা। ছবিতো আর ফোটোগ্রাফি নয়। এমনকি ভ্যান গর্ঘ-এর স্টিল-লাইফও পুরোপুরি জীবন-অনুসারী নয় ! জীবন্তকে দেখে, তা থেকে অন্য জীবন সৃষ্টি করার আরেক নামই শিল্প। তাই না ?

একোয়ার কাজ করবো তোমার উপরে। আমার যোজনগন্ধা বড় বেশি নিকটের হয়ে গেছে। তাকে সহস্রযোজন গন্ধা করে তুলবো। অস্পষ্ট, কিন্তু আজকের সকালের মতোই সত্যি। বাইরে ঝকঝকে রোদ কিন্তু বুকের ভিতরে ঠাণ্ডা। তোমার ছবির ব্যক্তিত্বর মধ্যে, তোমার মুখের চরিত্রের মধ্যে, এই দ্বৈত-সত্তা আনবো।

এবং আনার পরেই এলোমেলো, এলেবেলে করে দেবো। অন্যরকম।

এই হবে আজ সকালের কাজ আমার।

আমার শেষের কাজ।

ইতালিয় চিত্রপরিচালক আন্তোনিওনি বলতেন : "If life is a gift of God then the right to take it away is also a gift of God."

তোমার ছবিটি যখন আঁকা শেষ হবে, তখন আর কোনো কাজ নেই বাকি।

একটা গান শোনালাম নিজেকে আজ চান করতে করতে। চানঘরের গান। জানো ?

"আমি জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছি, তুমি যেন ঘৃণা কোরো না
আদর যতন করিতে যেমন সে বাঁধনে যেন ছিঁড়োনা।"

আঙুরবালার গাওয়া গান। শুনেছো কখনও ?

ভালো করে জলপাই-এর তেল মেখেছি সারা শরীরে। তারপর চান। ঠাণ্ডা জলে। ত্বকের উজ্জ্বলতা বেড়ে গেছে। চকচক করছে চোখদুটি।

যদি যাওয়া হয় সেই দেশে, তবে সব চাওয়া-পাওয়ার রাজ্য ছাড়িয়ে এবারে অন্য এক রাজ্যে পৌঁছে যেতে চাই। যেখানে প্রতিযোগিতা নেই, ঈর্ষা নেই, অন্যায় আঘাত নেই, চরিত্র-হনন নেই, মিথ্যা প্রচার নেই, পেছন থেকে ছুরি-মারা নেই। যেখানে আজকের সকালেরই মতো ঝকঝকে দিন। প্রতিদিন। রৌদ্রস্নাত দিন। বেকন-এর মতো Crisp, নোন্তা ; জীবনগন্ধী দিন। যেখানে সন্ধে নামে স্তনসন্ধির উজ্জ্বল উদ্বেল মসৃণ উদ্ভাসে। পাখি উড়ে যায়। অন্ধকার, আশ্লেষে আসে ; চিলিকা হ্রদের ছড়পরিয়ার বালিয়াড়ি ছেড়ে

আলতো করে জলে-নামা নিঃশব্দ হাঁসীরই মতো। জল নড়ে না ; পালক ভেজে না। যেখানে পশ্চিম দিগন্তে তোমার ছবি ফোটে প্রতি সন্ধ্যায়, হালকা বাসন্তী রঙের উপর ঘন ফলসা রঙে। একোয়ার কাজের মতো, ছোপ ছোপ, মেঘ, মেঘ ; অস্পষ্ট।

অথচ জীবনের থেকেও জীবন্ত।

অবরোহণের সময়ে শ্রুতি সাডোলিকার-এর মীড়-এর মতোই নেমে যাবো।

শুনেছো মহারাষ্ট্রের সেই নারীর গলায় প্রভাতী বিভাস ? না শুনলে, শুনো।

"গা" থেকে কড়ি মা ছুঁয়ে "সা"তে এসে দাঁড়াবো। একদিন সা থেকেই তো শুরু করেছিলাম। সকলেই তাই করে।

শুভায় ভবতু :

মঙ্গলায় ভবতু :

আনন্দায় ভবতু :

সমৃদ্ধায় ভবতু :

ইতি—তোমারই অর্যমা